বরানগর
ইতিহাস ও সমীক্ষা

(পঞ্চদশ থেকে বিংশ শতাব্দী)

সম্পাদকমণ্ডলী

রঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ মতিলাল
দেবকুমার শেঠ জয়দেব মুখোপাধ্যায়

সমীক্ষা পরিষদ

৬২/১০, মতিলাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা-৭০০০৩৫

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯১

প্রচ্ছদ শিল্পী : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

মানচিত্র-অঙ্কন : পাপিয়া লাহিড়ী, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক : সমীক্ষা পরিষদ
৩২/১০, মতিলাল-মল্লিক লেন,
কলিকাতা-৭০০০৮৫

মুদ্রক : রমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান : সুবর্ণরেখা, শৈব্যা পুস্তকালয় (কলেজ স্ট্রীট)
সরস্বতী পুস্তকালয়, শম্ভু এণ্টারপ্রাইজ (বরানগর)

উৎসর্গ

সমস্ত ইতিহাসপ্রেমী মানুষদের উদ্দেশ্যে

পরিষদের বিবৃতি

অবশেষে সংশয় ও অনিশ্চয়তার প্রকোপবন্দী একটি সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হলো। আজ থেকে মাত্র ন' মাস আগে বরানগরের বুকে 'সমীক্ষা পরিষদ' নামে যে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করে, তার সূচনালগ্নের প্রথম উদ্যোগটির সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই ছিলেন দ্বিধান্বিত। একদা চতুর্থ শ্রেণীর, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণীর ও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১ লক্ষের অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট ছাব্বিশটি অঞ্চলের অন্যতম বরানগর নামের এই জনপদের ইতিহাস রচনা ও সমীক্ষা প্রণয়ন এবং সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা, এ যে খুব সহজসাধ্য কাজ নয়, সে-ব্যাপারে আমরাও ছিলাম পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তবু, নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার সামিল হ'য়ে সমীক্ষা পরিষদ তার লক্ষ্যপূরণে সর্বদা চলিষ্ণু থেকেছে। আজ, 'বরানগর ইতিহাস ও সমীক্ষা' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিষদের সঙ্গে বরানগরের আত্মিক সম্পর্কের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হলো।

একথা স্বীকার্য যে স্থান-মাহাত্ম্যে মুর্শিদাবাদের বড়নগর বা পুরুলিয়ার বরাহভূঁই গ্রামের তুলনায় বরানগর বা বরাহনগর যথেষ্ট অগ্রগণ্য। আবার দেদীপ্যমান কলকাতার পাশে নিতান্ত নগণ্য। অগ্রগণ্য বা নগণ্য, পরিচয় যা-ই হোক্ না কেন, যে-কোন স্থানেরই একটি পরিবেশনযোগ্য ইতিহাস থাকতে পারে—মূলত এই ধরনের গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমীক্ষা পরিষদের উদ্ভব। স্বীকার করা ভালো যে, এই কাজেব প্রথম পর্বে স্থানটির অধিবাসী হিসাবে কিছু আবেগপ্রবণ ঝোঁক আমাদের অন্তর্গত বোধের ভিতরে কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য নথিপত্র, বিবরণী, প্রাচীন ও সমসাময়িক গ্রন্থাদি, বিদ্বৎজনেদের সঙ্গে আলোচনা ও আঞ্চলিক ইতিহাসের কাঠামো সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার আলোকে যথাসম্ভব আবেগবর্জিত হওয়ার প্রয়াস ঘটেছে।

আমরা দেখেছি, আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ধারাটি আমাদের দেশে এখনও ব্যাপকতা লাভ করেনি। যদিও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানকে ঘিরে এই ধরনের আঞ্চলিক ইতিহাস ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। পূর্বাপর বিবেচনা ক'রে, সমীক্ষা

পরিষদ বিশ্লেষণ, পূর্ব-অসঙ্গতি নিরূপণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারশীল থেকেছে। ইতিহাসের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে 'সমীক্ষা' অংশটি। কেন এই ইতিহাস, কেনই বা সমীক্ষা, তা গ্রন্থের যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে, এই 'সমীক্ষা' অংশটি সম্ভবত আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ধারায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করবে। একই সঙ্গে অতীত ও সমকালকে অনুধাবনের এই প্রয়াসটি যদি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় একটি 'মডেল' হিসাবে কাজ করে, তাহলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস রচনায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং তথাকথিত অ্যাকাডেমিশিয়ানদের টেবিল থেকে সমাজ-ইতিহাসের চেতনা ছড়িয়ে পড়বে সর্বসাধারণের গৃহকোণে। সমীক্ষা পরিষদের অশেষ পরিশ্রমের সার্থকতাও আসবে তখনই।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এই দেখে যে বর্তমান গ্রন্থ-পরিকল্পনার আভাস পাওয়ামাত্র বরানগরের মানুষজন আমাদের সঙ্গে অকৃপণ সহযোগিতা করেছেন। এই ধরনের স্থান সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান চালানোর পক্ষে তথ্যসংগ্রহ একটি বিরাট বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই, গ্রন্থাগার-কেন্দ্রিক গবেষণার পাশাপাশি ক্ষেত্র সমীক্ষার (Field work) প্রয়োজনও হয় অত্যন্ত বেশী। এই দ্বিতীয় কাজে স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু ক'রে সর্বসাধারণের একান্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব আবশ্যক হয়ে পড়ে। এদিক থেকে, কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা বাদ দিলে, মিত্রভাবাপন্ন মানুষেরই সাক্ষাৎ মিলেছে অধিকাংশক্ষেত্রে। বর্তমান গ্রন্থ-রচনায় আমাদের উৎসাহিত করেছেন প্রথিতযশা ঐতিহাসিকবৃন্দও। তাঁদের গুরু দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে এই কাজটি সম্পর্কে তাঁরা ধৈর্যসহকারে অবহিত হ'য়েছেন। এই গ্রন্থের সুলিখিত মুখবন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত গবেষক শ্রীগৌতম ভদ্র নিম্নবর্গের মানুষদের সম্পর্কে যা বলেছেন, তাও যথেষ্ট প্রনিধানযোগ্য। সেদিক থেকে এই গ্রন্থটিকে বরানগরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না-ভেবে, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের একটি খণ্ড হিসাবে ভেবে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে।

এই ধরনের গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য চিত্রের সন্নিবেশ পাঠকদের কাছে গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলে। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও, আমরা, গুটিকয়েক ছাড়া, বরানগর সংক্রান্ত কোন দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংগ্রহ করতে পারিনি। যাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই ধরনের চিত্র রয়েছে, তাঁরা অনেকে নিজেই বরানগরের ইতিহাস

রচনায় তৎপর। ফলে, আমরা আশা করি, বরানগর সম্পর্কিত পরবর্তী কোন যোগ্যতর ইতিহাস গ্রন্থে আমরা যথেষ্ট সংখ্যক চিত্রের সমাবেশ দেখতে পাবো। এ-প্রসঙ্গে একটি- কথাও বলা দরকার যে, এই ধরনের গ্রন্থে চিত্র-সংযোজনের নেশাটিও বড় মারাত্মক। তাতে গ্রন্থের লিখিত অংশের গুরুত্ব হ্রাস পেতে পারে।

সবশেষে, এই গ্রন্থটির প্রকাশলগ্নে স্মরণ করি সেই সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কথা যাঁরা তথ্য ও অর্থ দিয়ে এই গ্রন্থটিব প্রকাশনা কর্মটিকে তরান্বিত করেছেন। এখানে স্থানাভাবে তাঁদের সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। তাই স্মারক-পুস্তিকায় কৃতজ্ঞতাস্বীকারের তালিকাটি মুদ্রিত হলো। এ-সত্বেও, এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁবা প্রথম থেকে শেষাবধি গ্রন্থটির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের নামোল্লেখ সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এঁদের মধ্যে রয়েছেন কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও কবি অরুণ ভট্টাচার্য। পরিষদের শুভ-কামনায় এঁরা সদা তৎপর থেকেছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদটি এঁকে দিয়েছেন শিল্পী মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। তাঁকে এবং গ্রন্থে সন্নিবেশিত মানচিত্র অংকনে অক্লান্ত পরিশ্রমী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পাপিয়া লাহিড়ীর কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। বইয়ের প্রথম পর্বের প্রুফ সংশোধন কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন বন্ধুস্থানীয় সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া, বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বরানগর থানার ও. সি. জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও পুরসভার চেয়ারম্যান অজিত গাঙ্গুলি মহাশয়কে। প্রচারকার্যে সহায়তার জন্য 'সংযুক্তা' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিমল বসুর কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রিণ্টস্মিথ প্রেসের রমেন্দ্রচন্দ্র রায়, সুনীল দাশগুপ্ত, রবীন রায়, প্রেসের কর্মিবৃন্দ ও প্রসেস সিণ্ডিকেটের বিমল দাশগুপ্তকে। পরিষদের বাইরে থেকেও, এই কাজের সঙ্গে যাঁদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল সদাসর্বদা তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য শ্রীমতী ঋতুপর্ণা মতিলাল, শ্রীমতী শম্পা মুখোপাধ্যায়, কুমারী কবিতা ভট্টাচার্য ও অনুশ্রী মতিলাল। এঁদের এবং সমস্ত বরানগরবাসীর হাতে এই গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। অবশ্য সাধ্যমত যত্নবান হওয়া সত্বেও যে কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেল, সেজন্য অতৃপ্তিও রইল।

সূচীপত্র

(খ) বরানগরে পরিবহন (ক), কর্মচারী রাজ্যবীমা, সিনেমা হল, ক্লাব (আংশিক), মন্দির (আংশিক), হাসপাতাল, সমবায় সমিতি (আংশিক), আমদানিকৃত দ্রব্য, রপ্তানিকৃত দ্রব্য, সেলাইশিক্ষার কেন্দ্র

—দেবকুমার শেঠ ৩, ২৫, ৬৪—৭২

(গ) ক্লাব (আংশিক), মন্দির (আংশিক), পথের তালিকা, রেলওয়ে স্টেশন, সমবায় সমিতি (আংশিক)

—জয়দেব মুখোপাধ্যায় ৬, ৭৫—৮০

মুখবন্ধ

যে কোন দেশেই স্থানীয় ইতিহাস লেখার রীতি প্রচলিত। ভৌগোলিক অর্থে বৃহত্তর দেশ বা জাতীয় চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার আগে মানুষের পরিচয় তার আপাত পরিদৃশ্যমান স্থান বা এলাকার সঙ্গে। এই এলাকার রূপ অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন। কখনো তা গ্রাম বা শহর, কখনো তা আরো ছোট পাড়া বা মহল্লা। কিন্তু সম্পৃক্তির এই বোধ আকারে ক্ষুদ্র হলেও চেতনাতে এর ভূমিকা কিছু কম নয়। ইউরোপে বা আমাদের দেশের বিভিন্ন গবেষণার সূত্রে জানা গেছে যে প্রাক ধনতান্ত্রিক বা আধা ঔপনিবেশিক সমাজে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের নানা অনুষ্ঠানে এই এলাকাভিত্তিক বন্ধন ছিল জমায়েতের বা বিরোধের এক প্রধান সূত্র। উনবিংশ শতকের কলকাতার সমাজ সংস্কারের গোষ্ঠী কোন্দল বা বিংশ শতকের উত্তর প্রদেশের মুবারকপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বা এলাহাবাদের জাতীয় আন্দোলনের চেতনাতে এলাকার সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা একাত্মবোধ বার বার কাজ করেছে। এলাকার ইতিহাস এই চেতনার অঙ্গীভূত। ফলে ব্যক্তি মানুষ বা পারিবারিক মানুষের চেতনার প্রসারের প্রথম ক্ষেত্রই হচ্ছে তার এলাকা, যে এলাকার সঙ্গে সে তার নিজেকে এক করে। এই দিক থেকে বরানগরের ইতিহাস লেখার তাগিদ বা প্রয়োজনীয়তা বরানগরের কিছু তরুণ উৎসাহী যুবক অনুভব করবেন—এটা খুবই প্রত্যাশিত।

এলাকা বা স্থানের ইতিহাস লেখার আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই ধরনের ইতিহাস রচয়িতাদের অনেকেই আক্ষরিক অর্থে 'পেশাদার' ঐতিহাসিক নন। নাম বা ডিগ্রীর মোহে নয়, তারা ইতিহাস লেখেন নিজেদের ঝোঁকে, এলাকার প্রতি ভালোবাসার তাগিদে। পেশাদার ঐতিহাসিক নন বলে কিন্তু তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কিছু নেই। বরং এলাকার সঙ্গে যোগ থাকার দরুন এঁরা লৌকিক উপাদান বা সরেজমিন তদন্তের ফলে এমন কিছু তথ্য পান—যা দুর্লভ। এছাড়া এলাকার সামাজিক আবহাওয়া বা মেজাজের সঙ্গেও পরিচয় হয়। দলিল পড়া গ্রন্থকীট ঐতিহাসিক সময় সময় এই মেজাজের হদিশ নথিপত্রে খুঁজে পান না। তবে আবার শুধুমাত্র আবেগ বা ইচ্ছা দিয়েই ভালো ইতিহাস হয় না। যুক্তিবোধ বা তথ্যনিষ্ঠা থাকা দরকার কারণ এলাকার প্রতি ভালবাসা যেন বল্গাহীন না হয়।

এখন, আঞ্চলিক বা সামগ্রিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এলাকার ইতিহাস চর্চার স্থান কোথায়? প্রত্যেকটি এলাকা এক অর্থে অনন্য বিশিষ্ট। ইতিহাসের সামগ্রিকতা কখনো অনন্যতাকে বাদ দিয়ে নয়। আবার এলাকার ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড চিত্র, শহরের ঘর-বাড়ি, রাস্তার খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্য দিয়ে যে ছবির আভাস পাওয়া যায়—সেগুলো তথ্য হিসাবে বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসের আকর হ'তে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন হওয়াও সম্ভব। তথ্যের প্রাচুর্য এবং সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল ঐতিহাসিক মন থাকলে খুব ছোট এলাকার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেও বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ধরা সম্ভব। হিণ্টন মহাশয় তার Fanshen গ্রন্থে একটি গ্রামের ইতিহাসের মাধ্যমে চীনের বিপ্লবের সামাজিক পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকেছেন। ফরাসী ঐতিহাসিক লাদুরি 'মন্তাউ' গ্রামের মধ্য দিয়ে ষোড়শ শতকের ফ্রান্সের গ্রাম-সমাজের রূপকে ধরতে পেরেছেন।

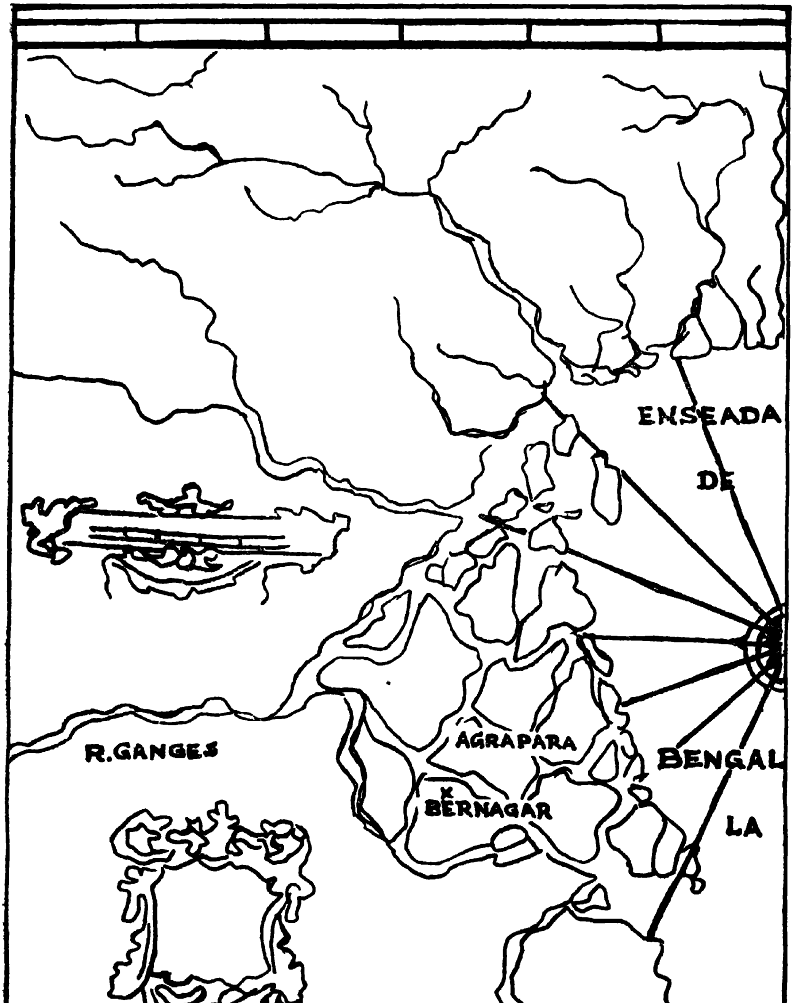
বর্তমান আলোচ্য বইয়ের বিষয়রূপ মূলত দুটি: সমীক্ষা ও ইতিহাস। সমীক্ষা অংশ শহরের কাঠামো বা বস্তুভিত্তি। এই অংশের উপর ভিত্তি করে যে কোন লোক শহরের বিন্যাস থেকে শুরু করে তার যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য পেয়ে যাবেন। লেখার কায়দা বা আঙ্গিক অবশ্য নেওয়া হয়েছে সরকারী জেলাবিবৃতি বা আদমসুমারির প্রতিবেদন থেকে। তত্ত্ব বা বিশ্লেষণের চাইতে তথ্যের দিকেই জোর বেশী। এতে লক্ষণীয় যে একটা এলাকাকে ঘিরে কত ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ গ'ড়ে উঠতে পারে, একটি ছোট শহরের প্রয়োজনই বা কি কি। মন্দির, পাঠাগার, বাজার ইত্যাদি সমাজের নানাস্তরের নানা ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কেই গ'ড়ে ওঠে সমাজের টানাপোড়েন। বরানগর মন্দির নগরী; কেন? শিব বিষ্ণু ও শেতলার মন্দির পাশাপাশি আছে। সামাজিক কৃষ্টিতে এদের আপাত সহাবস্থান বৃত্তি ও কৌলিন্য নির্ভর সমাজের বাঁধনকে স্পষ্ট করে।

ইতিহাস প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বরানগরের বৃদ্ধি প্রধানত বাণিজ্য-পুঁজির কল্যাণে। এদিক থেকে শ্রীরামপুর, চন্দননগর বা চুঁচড়োর সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য নেই। বরানগরের বাগানবাড়ির বর্ণনায় এই পুঁজির প্রসাদপুষ্ট ধনী ব্যক্তিদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ধরা পড়েছে। এদিক থেকে বরানগর কলকাতার বাবু সংস্কৃতিরই প্রসারক্ষেত্র মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম বা হিন্দু জাগরণের অভিঘাতও

সেই জোয়ারের ফলমাত্র। বরানগর কলকাতার অন্তেবাসী, সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রেও।

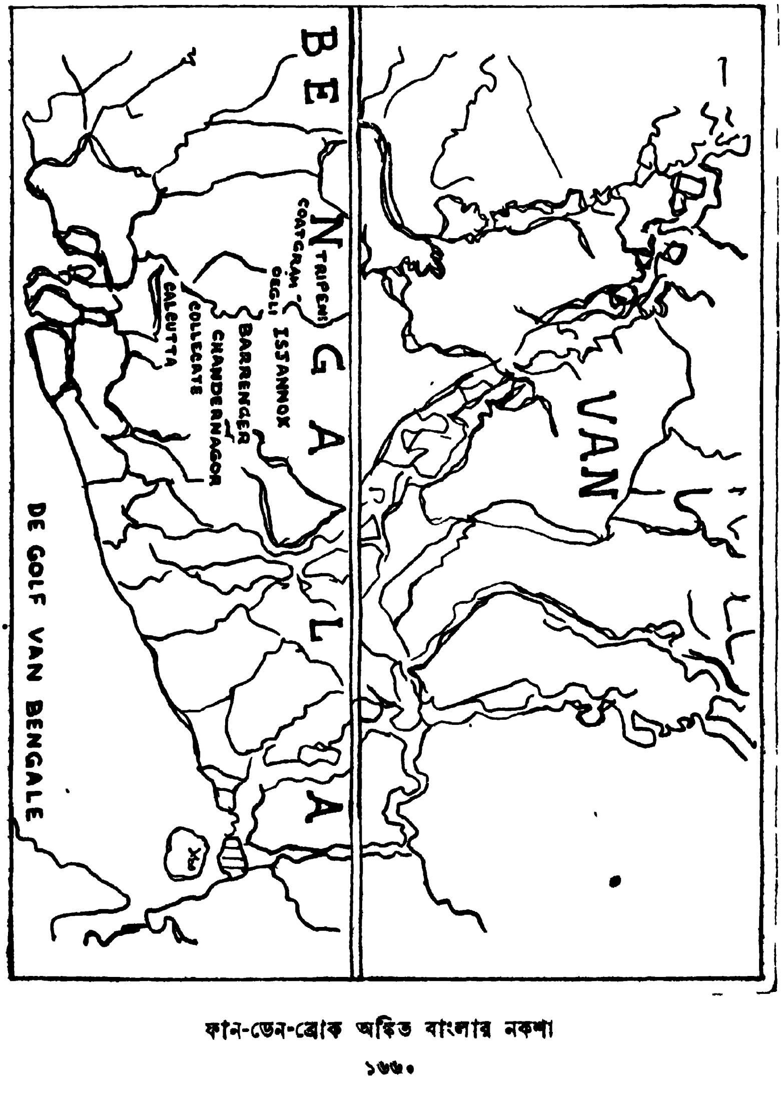
কিন্তু ইতিহাসে অনুচ্চারিত রয়ে গেছে বরানগরের নিম্নবর্গের কাহিনী ও রাজনীতি। এই আলোচ্য গ্রন্থে বরানগরের চটকল ও শ্রমিকশ্রেণীর কথা এসেছে কিন্তু শশিপদর সংস্কার প্রসঙ্গে। অথচ শশিপদ মূলত ব্যর্থ উচ্চবর্গের এক প্রতিনিধি, চেষ্টা করেছেন মাত্র শ্রমিকদের 'দেখভাল' করবার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানার স্বাস্থ্য, পুরসভা ও পুলিশ সংক্রান্ত দলিলে বরানগরের উচ্চবর্গের সীমার বাইরের বস্তি, শ্রমিক, চটকলের জীবনের রসদ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। কর্তাভজা সম্প্রদায় বা বারবাণিতা পল্লীর উল্লেখে যে অনাবিষ্কৃত জগতের ছবি আমরা পাই তার সূত্রানুসন্ধান পূর্ণভাবে এই বইতে করা যায়নি, খামতি থেকে গেছে। ফলে বোঝা যায় না কেন বিংশ শতকে এখানে বামপন্থী রাজনীতির এত প্রাধান্য, কেন সত্তর-এর দশকে এখানে এত রক্তপাত। নিম্নবর্গের সমাজ ও রাজনীতি এখানে অনুপস্থিত অথচ কোন শহরের ইতিহাসই তাদের বাদ দিয়ে গ'ড়ে উঠতে পারে না। আশা করি এই পুস্তিকা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। তরুণ গবেষকদের উৎসাহে ঘাটতি নেই। তাদের হাতে আমরা বরানগরকে কেন্দ্র ক'রে নিম্নবর্গের সমাজ ও রাজনীতির বিশদ আলেখ্য অচিরেই লাভ করব।

ইতিহাস



জ্যাও-ড্য-বারোজ অঙ্কিত বাংলার নকশা

১৫৫০



ফান-ডেন-ব্রোক অঙ্কিত বাংলার নকশা

১৬৬০

দেশ-কাল পরিচিতি ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে নদ-নদীগুলি বহুযুগ ধরে গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন করে এসেছে। কখনো পুরনো কোনো নদী মজে গেছে অথবা মরে গেছে নতুন কোনো জলপ্রবাহের জন্ম দিয়ে, কখনো ছোট বড় নির্বিশেষে নদী তার প্রবাহ পথ পাল্টে নিয়েছে। পাঁচশো বছর আগেও নদনদীর এই পরিবর্তনশীল আকৃতির সঠিক চিত্রায়ণ সম্ভব ছিল না। হিন্দু-সাম্রাজ্যের অবসান ও মুসলমান রাজত্বের পত্তন থেকে শুরু করে পূর্ব ভারত এবং বিশেষত এই বাংলাদেশ ছিল আগাগোড়া অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে যখন কিছু কিছু বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায় এদেশে আসতে শুরু করে, তখন থেকেই বাংলাদেশের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়, যদিও প্রায় পুরোটাই বাণিজ্যিক স্বার্থে, তবু। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে Jao de Barros (1558—দ্রঃ মানচিত্র), Gastaldi (1561), Hondivs (1614), Cantelli da Vignolla (1683), Van den Broucke (1560-দ্রঃ মানচিত্র), G. Delise (1720-40). Izzak Tirion (1730), F. de Witt (1726), de l' Auville (1752), Thornton Rennel (1746-1764) প্রভৃতি পর্তুগীজ ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিক, রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতেরা বাংলা ও ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রাকৃতিক নক্শা রচনা করেছিলেন। এই নক্শাগুলির ওপর নির্ভর করেই আমরা মধ্যযুগে বাঙলার নদ-নদী ও জনপদগুলির ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি, পুরনো নদীর মৃত্যু ও নতুন নদীর জন্ম সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারি। শুধু এই নক্শাগুলিতেই নয়, ইবন্ বতুতা (১৩২৮-১৩৬৪), বারনি (চতুর্দশ শতক), রালফ ফিচ (১৫৮৩-৯১), কার্ণাণ্ডেজ (১৫৯৮), কনসেকা (১৫৯৯) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী এবং বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দদাসের চণ্ডীমঙ্গল, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, জাতীয় সাহিত্যগ্রন্থ ও মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাস থেকেও উপরোক্ত পরিবর্তনের অবয়ব সুস্পষ্ট হয়।

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বহমানা এমনই একটি নদীর নাম গঙ্গা-ভাগীরথী। রাজমহলের সোজা উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার প্রায় তীর ঘেঁষে তেলিগড় ও সিক্রি-গলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম—এই গিরিবর্ত্ম দুটি ছাড়িয়ে রাজমহলকে স্পর্শ করে গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে। তারপর, ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় দেখা যাচ্ছে, রাজমহলের কিছুটা দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের মধ্যে গঙ্গার তিনটি দক্ষিণ-বাহিনী শাখার জল কাশিমবাজারের উত্তর দিক থেকে একত্রে বাহিত হয়ে চলে গেছে দক্ষিণমুখী, মিশেছে সমুদ্রে, বর্তমান গঙ্গা-সাগর সঙ্গমতীর্থে। এই দক্ষিণ-বাহিনী নদীই সমকালের হুগলী নদী। আমাদের আলোচ্য বরানগর নামক জনপদটির জন্ম, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি এই নদীপ্রবাহের উপকূলে বলেই পুণ্যসলিলা. প্রাচীনতরা নদীটি সম্পর্কে আমাদের আরও কিছু জানতে হবে। সেই সঙ্গে জানা যাবে, বরানগরের অস্তিত্বের প্রাচীনতা ও অবস্থানের ইতিবৃত্ত।

পঞ্চদশ শতকেও এই ভাগীরথী ছিল সংকীর্ণতোয়া, কিন্তু আজকের মত তার প্রবাহ নিশ্চয়ই ক্ষীণ ছিল না, সাগর মুখ থেকে আরম্ভ করে একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত সমানে বড় বড় বাণিজ্যতরীর যাতায়াত তখন অব্যাহত ছিল। ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শায় এই দীর্ঘ নদীপথের পার্শ্ববর্তী উপকূলগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় এবং সংকীর্ণতর হলেও ভাগীরথীই যে প্রধানতর প্রবাহ ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। বিদেশী বণিক সম্প্রদায় ও পণ্ডিতবর্গের নক্শাগুলি সাম্প্রতিককালে বহু আলোচিত হয়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর মনসামঙ্গলে গঙ্গার প্রবাহ পথের যে বিবরণ চিত্রিত করেছেন তা তুলনামূলকভাবে স্বল্পালোচিত। বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হয়ে সাগরমুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ; পথে পড়ছে অজয় নদী, উজানী, শিবানদী, (বর্তমান শিয়াল নালা), কাটোয়া, ইন্দ্রানী নদী, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম (সপ্তগ্রাম যে গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনাসঙ্গমে বিপ্রদাস তার সচেতন উল্লেখ করেছেন), কুমারহাট, ডাইনে হুগলী, বাঁয়ে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাঁকিনাড়া, তারপর মূলাজোড়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানী, বাঁয়ে ইছাপুর বাকিবাজার, ডাইনে নিমাইতীর্থ (এই নিমাইতীর্থই সম্ভবত বর্তমান বৈদ্যবাটি), চানক, মাহেশ, বাঁয়ে খড়দহ, শ্রীপাট, ডাইনে

রিষড়া, বাঁয়ে সুকচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাইনে কোতরং, বাঁয়ে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ (এড়েদহ—এখানে স্মর্তব্য যে পিপিলাই-এর বিবরণে, বরানগর স্থানটির উল্লেখ না থাকলেও, এই আড়িয়াদহের অব্যবহিত দক্ষিণেই বরানগরের অবস্থান), পশ্চিমে ঘুসুড়ি, তারপর পূর্বকূলে চিত্রপুর (চিৎপুর), কলিকাতা, পশ্চিমকূলে বেতড় (বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত), তারও পরে বাঁয়ে কালীঘাট, চূড়াঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাথিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী এবং সবশেষে সাগরসংগমতীর্থ। এই সাগর-সংগমের কাছাকাছি এসে গঙ্গা চতুর্মুখী, শতমুখী শুধু নয়, সংখ্যাহীন খাল নালা শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যে পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির পঞ্চশতমুখী গঙ্গার সাগরসংগমতীর্থে পুণ্যস্নান করেছিলেন। যাই হোক, বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসামঙ্গলের বর্ণনার সঙ্গে ফান্ ডেন ব্রোকের নক্সা অনেক ক্ষেত্রেই মিলে যাচ্ছে। ব্রোকও নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, (Tripeni), সপ্তগ্রাম (Coatgam), হুগলী (Oegli, পর্তুগীজ বণিকদের Ogulium), কলিকাতা (ব্রোক Collecate এবং Calcutta নামে প্রায় সংলগ্ন দুটি বন্দরের উল্লেখ করছেন। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় একটি বিপ্রদাসের কলিকাতা ও অপরটি কালীঘাট বলে অনুমান করেছেন) প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন তাঁর নক্শায়। এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, পঞ্চদশ শতকেই বিপ্রদাস হুগলী ও কলিকাতার উল্লেখ করেছেন এবং এই দুটি স্থান সম্পর্কে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ। তবে, সন্দেহ করতে দ্বিধা নেই যে বিপ্রদাসের মূল তালিকায় পরবর্তীকালের গায়েনরা হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি নাম সংযোজন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে যে ১৪৯৫-র (বিপ্রদাস) পরে এবং ১৬৬০-র (ফান্ ডেন ব্রোকের) আগে বরাহনগর, চন্দননগর প্রভৃতি বন্দর গঙ্গার উপকূলে গড়ে উঠেছে। শুধু ব্রোকই যে এই দুটি স্থানের উল্লেখ করেছেন তা নয়, জাও ডি বারোসের নক্শায়ও অগ্রপাড়া (Agrapara আগরপাড়া), বরাহনগরের (Bernagar) উল্লেখ সুস্পষ্ট।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য ফান্ ডেন ব্রোকের নক্শা সম্পর্কে সম্প্রতিকালে কলিকাতা-বিষয়ক খ্যাতপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক রাধারমণ মিত্র মহাশয় তাঁর সত্ত প্রকাশিত কলিকাতা-দর্পণ-গ্রন্থে কিছু রাগী অভিযোগ পেশ করেছেন। রাধারমণ-

বাবুর মতে, ব্রোকের ম্যাপ একেবারেই বাজে, মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তাঁর যুক্তি হ'ল, বাংলাদেশের স্থান-নাম বিদেশীদের কাছে অপরিচিত হওয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নামগুলির বিকৃত উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, এই ম্যাপে স্থান-নামগুলি ওলন্দাজী ভাষায় বানান করা হয়েছে, যা, আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য (উনি বলেছেন অপাঠ্য, আসলে ওগুলি দুর্বোধ্য) , আর শেষত, এই ম্যাপে কোনো স্কেল ব্যবহার করা হয়নি, স্থানগুলির অবস্থান আন্দাজমত দেখানো হয়েছে। আমাদের এই অভিযোগগুলি যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়নি। প্রথমত, ব্রোক-কৃত যে বস্তুটি আজ আমরা দেখি, সেটি কিছুতেই যথার্থ অর্থে ম্যাপ বা মানচিত্র নয়। স্বর্গত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের সঙ্গে একমত হয়ে আমরাও তাই 'নক্শা' হিসেবেই উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয়ত, বিদেশীরা বাংলাদেশের স্থান-নাম বিকৃত করে উচ্চারণ করবে বা লিখবে, এতো খুবই স্বাভাবিক। ইংরেজরা দুশো বছরের শাসনের পরও এদেশের বানানের সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচিত হয়নি। তাছাড়া, আলোচ্য নক্শাতে বানানগুলি যে ভাবে উচ্চারণ করে লেখা, তা, স্থান-নাম সম্পর্কে অবহিত কোনো শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য নয়। তৃতীয়ত, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি একজন ওলন্দাজের কাছে নক্শা প্রস্তুত করতে গিয়ে স্কেল-ব্যবহারের প্রত্যাশা অন্যায়। তাঁরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে ইতিহাসের প্রয়োজনে যে সামান্য দু-একটি নক্শা রেখে গেছেন, তাতেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিছু স্থান-নাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এক্ষেত্রে ক্ষমার্হ বলেই মনে করি। তবে, ভৌগোলিক অনুষঙ্গে যা আমাদের বিভ্রান্ত করে, তা অবশ্যই পরিত্যজ্য। যেমন, রাধারমণবাবু যথার্থই সমালোচনা করে লিখেছেন

> একজায়গায় নাম লেখা আছে Isjannok—এটা বোধ হয় চানক বা ব্যারাকপুর। তার দক্ষিণে দু'টো জায়গা ছেড়ে দিয়ে আছে Barrenger; এটা কি বরানগর? বরানগর ডাচেদের ছিল। সুতরাং ডাচ্ ম্যাপে বরানগর দেখানো হবে না, এটা হতেই পারে না। Barrenger যদি বরানগর হয়, তার দক্ষিণে দুটো জায়গা পরেই বড় বড় ক'রে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে Chandernagor। এটা যে চন্দননগর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বরানগরের দক্ষিণে চন্দননগর হয় কি ক'রে ?

ব্রোকের নক্‌শার এই বিকৃতি মেনে নিয়েই বলছি যে যেটুকু ভুল এবং পরিত্যাজ্য সেটুকু বাদ দিয়েও এই নক্‌শাটি মহা মূল্যবান। ইতিহাসের ছাত্র near-truth জাতীয় কোনো উপাদান বা তথ্যকেও সমাদরে গ্রহণ করে কেননা তার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে অনুসন্ধেয় সত্য, যা ব্রোকের নক্‌শাতেও রয়েছে।

বরানগর নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে

এবার আলোচনাকে কিছুটা সংকীর্ণ ক'রে 'বরানগর'-এ মনোনিবেশ করা বিধেয়। আমরা জেনেছি যে ১৪৯৫ (বিপ্রদাস পিপিলাই) এবং ১৬৬০-র (ফান ডেন্‌ ব্রোক) মাঝামাঝি কোন সময়ে বরানগর নামক বন্দরটি গড়ে ওঠে। কিন্তু, আরও নির্দিষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যখন দেখি যে জাও ডি বারোসের নক্‌শাতেও বরানগরের উল্লেখ রয়েছে। বারোসের সময়কাল ১৫৫০ খ্রী। অতএব, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই সুনিশ্চিত হওয়া গেল যে ১৫৫০ খ্রী বরানগর নামক জনপদটির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। বরানগরের প্রাচীনতা ও নামকরণ বিষয়ে আরও অন্যান্য সুপ্রচুর তথ্য রয়েছে যা অনেকেরই অজানা। ১৫৫০ খ্রী এর বহু পূর্বে বরানগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আশ্চর্য উপাদান আছে মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে, কিম্বদন্তীতে।

বরানগর জনপদটির নামকরণ বা এই স্থান-নামটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য এবং কিম্বদন্তী আছে। আমরা জানি যে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ওলন্দাজরা বরানগরে ফ্যাক্টরি গ'ড়ে তুলে এই স্থানটিকে বাণিজ্য-বন্দর হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এই ওলন্দাজ বা ডচ্‌দের বরানগরে শূকরের কারখানা ছিল এবং অনেকের মতে বরাহ-জারণের কারখানা ছিল বলেই সম্ভবত এই স্থানের নাম 'বরাহনগর' বা পরে অপভ্রংশে 'বরানগর' হয়েছে। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' গ্রন্থে এ-সম্পর্কে সুন্দর একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন

> মীরজুমলার মৃত্যুর পর, নবাব শায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের গবর্ণর বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ন। ১৬৭২ খ্রী অব্দে নবাব শায়েস্তা খাঁ

ইংরাজদের স্বত্বাদির সমর্থন করিয়া, এক নতুন পত্র-আদেশ প্রচার করেন। (ঐ সময়ে) বাঙ্গলার নানা স্থানের ফ্যাক্টরিগুলির কাজকর্ম উত্তমরূপে চলিতে ছিল না। ইহা দেখিয়া বিলাতের কর্ত্তারা মনে মনে ভাবিলেন বিলাত হইতে একজন শক্ত লোক না পাঠাইলে ভারতীয় বাণিজ্যাগার সমূহের উন্নতি ও সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা অতি সুদূর-পরাহত। এই জন্য তাঁহারা বিলাত হইতে স্ট্রেনশাম মাস্টার বলিয়া এক সুদক্ষ ইংরাজকে মাদ্রাজের কুঠিসমূহের সর্বময় কর্ত্তা করিয়া পাঠান।··· এইরূপভাবে উপদেশ পাইয়া, মাষ্টার সাহেব ১৬৭৬ খ্রী ৮ই জানুয়ারি বিলাত ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার বঙ্গে আগমনের একখানি ডায়ারী বা রোজনামচা রাখিয়া গিয়াছেন। এখানি আজও বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত। এই রোজনামচা হইতে বঙ্গদেশের সম্বন্ধে প্রায় আড়াইশত বৎসরের পূর্বের কথা জানিতে পারা যায়।·· মাস্টার তাঁহার গন্তব্যপথের অনেক স্থলেই "হল্যাণ্ডার্স" বা ডচদিগের সৌভাগ্য চিহ্নের পরিচয় পান। বরাহনগরে-উপস্থিত হইয়া, তিনি ডচদিগের শূকরের কারখানা দেখিতে পান। এইস্থানে বড বড শূকর বধ করা হইত এবং লবণজারিত করিয়া তাহা ইউরোপে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত করা হইত। অনেকে বলেন—বরাহনগরের চারিদিকে শূকরের বা বরাহের উৎপাৎ ছিল বলিয়া, ইহা 'বরাহনগর' আখ্যালাভ করিয়াছে। শূকরঘটিত এ কিম্বদন্তী যে একেবারেই অমূলক নহে, তাহা মাষ্টারের লিখিত কাহিনী হইতেই প্রকাশ। আমাদের বোধ হয়, বরাহনগরে ডচ্‌দিগের এই বরাহ-মাংস জারণের কারখানা ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহা বরাহনগর বা তদপভ্রংশে বরানগর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ট্রেনশাম মাস্টার ১৬৭৬-৭৭ খ্রী অব্দে বরাহনগর দর্শন করেন।

এল. এস. এস. ওম্যালি তাঁর সুখ্যাত জেলা গেজেটিয়ারেও উপরোক্ত তথ্যের সমর্থনে লিখেছেন

The Dutch had established a factory for salting pork at Baranagore before the end of the seventeenth century.

and later, maintained a station at Falta for sea-going vessels. Streynsham Master, the president of Madras, who visited Bengal in 1676, states that the Dutch had a hog factory at Baranagore, where they killed about 3,000 hogs a year and salted them for their shipping. (District Gazetteer 24-Parganas by L. S. S. O'Malley —1914.)

ওলন্দাজদের আমলে বরাহের চাষ হোত বলেই এই জনপদটির নাম বরাহনগর বা বরানগর হয়েছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ইতিহাসের খাতিরে মুশকিল। কেননা, ওলন্দাজদের আগমনের দুশো বছর আগেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বরাহনগরের উল্লেখ আছে। বরানগরের শ্রীশ্রীপাঠ বাড়িতে সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে জানা যাচ্ছে যে শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১২ খ্রী এপ্রিল মাসে বরানগরে এসেছিলেন নৌকাযোগে। শ্রীচৈতন্য সমকালীন বাংলাসাহিত্যে তাই অন্ততঃ দুজন পদকারের লেখায় বরানগরের সুনিশ্চিত উল্লেখ আছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে'-এর শেষ খণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে বলছেন

হেন মতে পাণিহাটী গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কথোদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥…
এতেক তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বিনে আর কোন না করিহ কার্য॥

শ্রীবৃন্দাবন দাসের জন্মসন ১৫০৭ খ্রী আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪৮৫ খ্রী। এটা তাই সহজেই অনুমেয় যে শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। এখন প্রশ্ন, যে ভাগবতে-সুশিক্ষিত মহাভাগ্যবন্ত বিপ্রের

গৃহ মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল তিনি কে? বাংলা সাহিত্য-ইতিহাস প্রণেতা শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় লিখছেন

> রঘুপণ্ডিতের বাস ছিল বরাহনগরে।...শ্রীচৈতন্য ইঁহার গৃহে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ভাগবতাচার্য নাম তাঁহারই প্রদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অর্থাৎ ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে বরানগর জনপদটির অস্তিত্ব ছিল এবং নিঃসন্দেহে এই স্থানটির নাম ছিল 'বরাহনগর'। উল্লেখযোগ্য যে, এটিই বরানগর সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে দ্বিজ মাধবাচার্য-বিরচিত 'মঙ্গল চণ্ডীর গীত'-এও বরানগরের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ধনপতি সদাগরের সিংহল অভিমুখে যাত্রাপথের বর্ণনায় জানিয়েছেন যে বরানগরে ধনপতির নৌকা উপনীত হয়েছিল

> সেই বাঁক বাহে সাধু দাঁড়ে দিয়া ভর।
> স্বর্ণকোণা বাহে তবে সপ্ত মধুকর॥
> সেই কোনাকুনি সাধু বাহে অবহেলে।
> পাণ্যাটী বাহিয়া যায় আগরপুর জলে॥
> খিরাইতলা বাহিল বুঝিয়া ধনপতি।
> বরাহনগরে ডিঙ্গা হৈল উপনীতি॥
> চিত্রপুর বাহি সাধু যায় সাবধানে। ইত্যাদি।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে পাণ্যাটী (পাণিহাটী), আগরপুর (আগরপাড়া) এবং চিত্রপুর (চিৎপুর) এই তিনটি স্থান-নাম বিকৃত হলেও বরাহনগর নামটি অবিকৃত। পদকার দ্বিজ মাধবাচার্য ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬ খ্রী থেকে ১৬০৫ খ্রী।

বরানগর নামের প্রাচীনতা যাই হোক, এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে আরও দুটি অনৈতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শ্রীহরিদাস ঘোষাল মহাশয় তাঁর 'শ্রীভাগবত আচার্য লীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন

> প্রবাদ আছে যে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নভুক্ত পণ্ডিত শ্রীবরাহমিহির এই স্থানের রাজা ছিলেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্য যখন আরাকান বিজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন তখন তিনি এই স্থানে সৈন্যগণ সহ কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।…কথিত আছে সেই বরাহ রাজার নাম হইতেই এই বরাহনগর নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীঘোষাল-লিখিত এই প্রবাদ যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে মেনে নিতে হয় যে খ্রীস্টীয় চার শতকেও বরাহনগর নামের প্রচলন অসম্ভব নয় কেননা ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য ও বরাহমিহিরের সময়কাল ২৮০ খ্রী থেকে ৪১৩ খ্রী। তাহলে তো আরো আরো পশ্চাদ্‌পসরণ করে আমরা ভেবে নিতে পারি যে আদিশূরের বংশের ষষ্ঠ পুরুষ, যাঁর নাম ছিল 'বরাহ', তিনিও বরাহনগর স্থান-নামটির উৎপত্তির ব্যাপারে সম্পৃক্ত ছিলেন। ভবিষ্যৎ পুরাণেও 'বরাহভূমি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। বরানগর নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'বাংলার স্থান-নাম'-এ যা বলেছেন, তা উল্লেখযোগ্য

> প্রাচীনকালে 'নগর' বলতে পাথরের বা ইটের তৈরি গৃহসংবলিত ধনী অথবা রাজা বা দেবতা অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রামকেই বোঝাত। পরে এই অর্থ ক্ষয় পেয়ে ইটে গাঁথা শিবালয় অথবা দেবালয় বিশিষ্ট গ্রামকে বোঝাতে থাকে। নগরে দেবালয়—ইষ্টক নির্মিত থাকবেই। তুলনা করুন ভারতচন্দ্রের উক্তি, "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" মুকুন্দ কবিকঙ্কণ নিজের গ্রামকে বলেছেন "শিবের নগরী"। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম উৎকীর্ণ শিলালেখে যে একটি স্থান-নাম পাওয়া গেছে তাতে 'নগর' শব্দটি আছে। …আমাদের দেশে স্থান নামে 'নগর' শব্দের চলন একেবারেই ছিল না। এদেশ ইট-পাথরের দেশ নয়, মাটির, কাঠের, বাঁশের দেশ। তাই স্থান নামে 'নগর' ঠাঁই পায়নি। পেলে কোন না কোন নামে তার রেশ রেখে যেত। তা রাখেনি। অন্তত আমি পাইনি। এদেশে লেখাপড়া বেশি রকম

চালু হলে তবেই, অর্থাৎ ১৫-১৬ শতাব্দী থেকে 'নগর' ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন, বরানগর, কোন্নগর ; (বাংলার স্থান নাম—সুকুমার সেন। পৃঃ ২১-২৩)

আমরা আগেই জেনেছি যে শ্রীচৈতন্যের বরানগর-আগমনকে কেন্দ্র ক'রে শ্রীবৃন্দাবন দাস যে পদ লিখেছিলেন, সেটিই বরানগর নামের আদিতম উল্লেখ। সেটা ষোড়শ শতকের গোড়ার কথা। শ্রীসুকুমার সেনের উদ্ধৃতিতে পাচ্ছি যে ১৫-১৬ শতাব্দী থেকে 'নগর' ব্যবহৃত হতে থাকে। অতএব, সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে বরানগরের অস্তিত্ব সূচিত হয়। কেননা, বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসামঙ্গল-এ চাঁদ সদাগরের যাত্রাপথের বর্ণনায়ও বরানগরের উল্লেখ পাই না। পিপিলাই-এর সময়কাল ১৪৯৫ খ্রী। কিম্বদন্তীতে বা নিছক অনুমানে পঞ্চদশ শতকেরও অতীতে বরানগর নামের অনুসন্ধান করা ইতিহাসাশ্রয়ী গবেষণার পর্যায়ে পড়বে না। ভাষাতত্ত্বের অনুষঙ্গে 'বরাহনগর' নামটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় আমাদের আলোচনার এলাকা বহির্ভূত। তবু, সন্ধিৎসার প্রেরণায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' খুঁজে দেখেছি 'বরাহ' শব্দটি খুবই প্রাচীন। 'বরাহ'-এর পরিচিত শব্দার্থ শূকর ছাড়াও 'বরাহবতার বিষ্ণু', 'বরাহমিহির', 'বরাহপুরাণ'—প্রভৃতির সঙ্গে 'বরাহ' শব্দটি সম্পৃক্ত। শ্রীসুকুমার সেন-এর উদ্ধৃতি থেকেও জেনেছি যে প্রাচীনকালে 'নগর' বলতে পাথরের বা ইটের তৈরী দেবতা-অধিষ্ঠিত প্রাচীর ঘেরা গ্রামকেই বোঝাত। এমন অনুমান করতে বাধা নেই যে 'বরাহ'-এর যে অর্থ দেবতা বিষ্ণু-র প্রতিনিধিত্ব করে, সেই অর্থেই বহু প্রাচীনকালে আমাদের আলোচ্য জনপদটিতে একটি প্রাচীর ঘেরা গ্রাম গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু অনুমান অথবা কল্পনা ইতিহাস পদবাচ্য হতে পারে না, তাই আমরা, দূরপ্রসারী কল্পনার প্রলোভন সামলে নিয়ে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সনিষ্ঠ হয়ে, শুধুমাত্র ইতিহাসেই নিবদ্ধ থাকি এবং সিদ্ধান্তে আসি যে পনেরো শতকের শেষার্ধে অথবা ষোলো শতকের গোড়ার দিকে কোনো এক সময়ে, এই জনপদটির জন্ম হয়।

বরানগর ও প্রাসঙ্গিক ইতিহাস

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে বা ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বরানগর নামক জনপদটির জন্ম হলেও দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই স্থান-নামটি জন্মকাল থেকেই উল্লেখিত নয়। তুঘলক বংশের পতনের পর থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল অভূতপূর্ব অরাজকতা আর পূর্ব ভারত এবং বিশেষত বাংলাদেশ হয়েছিল তার সবচেয়ে জঘন্য শিকার। চতুর্দশ শতকের শেষপাদে তৈমুরলঙের ভারত-আক্রমণ এই দুরবস্থার ওপর বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই প্রায় পুরো পঞ্চদশ শতক ধরেই বাংলাদেশে মুহুর্মুহু শাসক বদল হয়েছে, জনগণ শক্তের ভক্ত হয়ে সন্ত্রস্ত অস্তিত্ব যাপন করেছে এক ভয়ঙ্কর অরাজক প্রতিবেশে। বাংলাদেশের এমনই এক দুর্দিনে এসেছিলেন আরব-বংশোদ্ভূত এক কৃষ্টিবান্ মুসলমান, তাঁর নাম সৈয়দ হুসেন শাহ বা আলাউদ্দীন হুশেন শাহ। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বঙ্গদেশ যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত, পারস্পরিক হানাহানিতে ক্লান্ত, তখনই, আমীর ওমরাহ-রা তাঁদের অত্যাচারী শাসক শামসুদ্দিন আবু নাসার মুজাফ্ফর শাহকে অপসারণ করে সৈয়দ হুসেনকে সিংহাসন গ্রহণ করতে বলেন। এই হুসেন শাহ র আমলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কী পরিমাণ পুষ্টিলাভ করেছিল তা' অন্যত্র আলোচিত হবার যোগ্য। আমাদের আলোচনার অনুষঙ্গে ফিরে এসে বলা যায় যে হুসেন শাহ-র আমলে বরানগরের কোনো সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। শুধু এটুকু বলা যায় যে শ্রীচৈতন্যদেব এই হুসেন শাহ-র সমকালেই তাঁর লীলাক্ষেত্র বিস্তৃত করে বরানগরে পদার্পণ করেন। তাছাড়া, তখন সমগ্র ভারতজুড়ে যে ধর্মীয় রেনেশাঁস শুরু হয়েছিল, উদারপন্থী হুসেন শাহ ছিলেন তার অন্যতম শরিক। এই হুসেন শাহী বংশের শেষ রাজা গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ শাহকে শের শাহ, ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি, বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেন ও স্বভাবতই এই দেশ চলে যায় পাঠানদের হাতে।

পাঠানরা বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেনি পূর্ব ভারতে। মোঘল সম্রাট আকবর তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রকল্পনায় সার্থক হয়ে শেষ পাঠান-প্রধান দায়ূদ খাঁর ছিন্নমুণ্ডের ওপর মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তাঁর আদেশে হিন্দু সেনাপতি তোডরমল বাংলা সুবাতে প্রথম রাজস্ব জরিপ করলেন ১৫৮২

শ্রী। এই জরিপের নাম হ'ল 'আসলি-জমা-তুমার'। আকবরের মন্ত্রী ও সুহৃদ আবুল ফজল-এর 'আইন-ই-আকবরী'-তে এই জরিপের অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনানুসারে দেখা যায় তোড়রমল বাংলা সুবার সমগ্র খালসা জমিকে (এখানে খালসা অর্থে rent-paying land, Jaigir বা rent-free land নয়) উনিশটি সরকারে এবং দু'শো বিরাশিটি পরগনায় ভাগ করেছিলেন। আকবরশাহী মুদ্রায় বাংলার খাজনা ধার্য হয়েছিল এক কোটি ছ'লক্ষ তিরানব্বই হাজার উনসত্তর টাকা। আইন-ই-আকবরী তৎকালীন বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছে, তা আজ সঠিকভাবে আন্দাজ করা কঠিন। যে জেলার অন্তর্গত আজ বরানগর সেই চব্বিশপরগনাব কোনো অস্তিত্ব ছিল না তখন। তবে, আঠার নম্বর সাতগাঁও সরকারের (Satgaon Sirkar) যে বর্ণনা রয়েছে, তার সঙ্গে বর্তমান চব্বিশ-পরগনা ও কলিকাতার হুবহু মিল আছে। এই সরকারের খাজনা ছিল তখন একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার একশত আঠার আকবরশাহী মুদ্রা। এই আলোচনা থেকে এটা অনুমেয় যে চব্বিশ-পরগনার বর্তমান অস্তিত্ব না-থাকলেও আকবরের আমলে ওই আঠার নম্বর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল আমাদের আলোচ্য বরানগর। কিন্তু সে-সময়ে নিছকই জঙ্গল-অধ্যুষিত একটি বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় পীঠস্থান ছাড়া বরানগরের অন্য কোন পবিচয় ছিল না।

বস্তুত, দেশীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে বরানগর কোনদিনই একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল না। বিদেশীরা যখন বাণিজ্যিক স্বার্থে এ-দেশে আসতে শুরু করে তখনই এ-দেশের সমুদ্র ও নদী উপকূলের কিছু কিছু স্থান তারা বেছে নেয় বাণিজ্যিক উদ্যোগে, বন্দর গডে তোলার তাগিদে। ওম্যালি সাহেবের চব্বিশ পরগনা জেলা গেজেটিয়ারে দেখতে পাচ্ছি যে বরানগর ছিল মূলত একটি পর্তুগীজ বন্দর। সেটাই স্বাভাবিক কেননা মধ্যযুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে পর্তুগীজরাই প্রথম এ-দেশে বাণিজ্য করতে আসে। ১৪৮৭ খ্রী বার্থোলোমিউ দিয়াজ্‌ উত্তমাশা অন্তরীপ-কে জলযানবাহনযোগ্য করে তোলেন আর তার এগারো বছরের মধ্যেই ভাস্কো-দা-গামা সেই পথ দিয়ে চলে আসেন কালিকট বন্দরে (১৭ই মে ১৪৯৮)। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, এ-দেশে পর্তুগীজ আধিপত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আলফান্সো দ আলবুকারেক। এই আলবুকারেকের

উত্তরসূরিরাই সমুদ্র ও নদী-উপকূলে তাদের বন্দর প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন ক্রমান্বয়ে দিউ, দমন, সলসেট, বেসিন, চাউল এবং বোম্বাই, মাদ্রাজের কাছে সান দোম এবং বাংলাদেশে হুগলীতে। বরানগরে পর্তুগীজদের সঠিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না, তবে, হুগলীর চুঁচড়ায় যারা এসেছিল, তারা বরানগরেও এসেছিল এটা নিঃসন্দেহে অনুমেয়। তাছাড়া, অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে বিদ্যাধরী নদী যেখানে টালীর নালার সঙ্গে মিশেছে, সেই সংযোগস্থলে তারদাহা নামক একটি স্থান পুর্তুগীজরা দখল করেছিল কলিকাতা প্রতিষ্ঠার একশো বছর আগে। এই স্থানটিতে তাদের বরানগর অতিক্রম করেই আসতে হয়েছিল। পর্তুগীজরা কিন্তু এদেশে তাদের বাণিজ্যিক আধিপত্য আঠারো শতকেই হারিয়েছিল। তাদের ধর্মীয় অসহনশীলতা ভারতীয় শক্তিগুলিকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন করে তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়েছিল। আর, পরোক্ষভাবে, ব্রাজিল আবিষ্কৃত হওয়ার পর পর্তুগীজরা ঔপনিবেশিক কার্যকলাপের গতিমুখ পশ্চিম-দিশারী করে নেয়। তাছাড়া, ইতিমধ্যে বেশ কিছু ইওরোপীয় কোম্পানি লোভাতুর হয়ে এদেশে ছুটে এসেছিল। পরস্পর বিবদমান সেই সব কোম্পানি-গুলির স্বার্থদ্বন্দ্বে পর্তুগীজরা পরাজিত হয়। আমরা জানি যে শাজাহানের রাজত্বকালে কাসিম খাঁ হুগলী দখল করে নেন; বরানগরও সে-সময়ে পর্তুগীজদের হাতছাড়া হয়ে যায়, ধরে নিতে পারি।

বরানগরে পর্তুগীজদের ঘাঁটি ছিল সত্য কিন্তু বস্তুত সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি যখন ডচ্ বা ওলন্দাজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এল তখনই এই জনপদটি এক বিশিষ্ট গুরুত্বে সংযুক্ত হ'ল ইতিহাসের পাতায়। পর্তুগীজদের মতই ওলন্দাজরাও এদেশে এসেছিল বাণিজ্যিক স্বার্থে। কিন্তু তারা খুব দ্রুত নিজেদের বিস্তার করল সমগ্র দেশ জুড়ে, সুদূর দক্ষিণ থেকে নীচু গঙ্গার উপত্যকা পর্যন্ত। সর্বত্রই তারা ফ্যাক্টরি গড়ে তুলল। কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, বালাসোর, নেগাপতম-এ ওলন্দাজরা ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৬৫৮ খ্রী। প্রায় সমস্তটা সপ্তদশ শতক ধ'রে প্রাচ্য দেশে 'স্পাইস ট্রেড' বা 'মশলা বাণিজ্য'তে ওলন্দাজরা একচেটিয়া ব্যবসায়ী হিসেবে পরিগণিত হয়। মধ্যভারত ও যমুনা উপত্যকায় প্রস্তুত নীল প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হোত সুরাটে আর বাংলা, বিহার,

গুজরাট থেকে তারা রপ্তানি করল সিল্ক, সুতীবস্ত্র, চাল আর গাঙ্গেয় আফিম। বরানগরে ওলন্দাজরা বরাহ-জারণের ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছিল সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে। জানা যায়, এই বিচিত্র ফ্যাক্টরিতে বছরে তিন হাজার বরাহ জারিত হোত জাহাজযোগে বিদেশযাত্রার জন্য।

ওলন্দাজরা সমকালীন রাজনৈতিক কলহে খুব একটা মাথা গলায়নি কিন্তু যখনই তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, তারা তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে আওরঙজেবের শাসনকালে মুঘল অফিসাররা প্রায়ই তাদের মালবাহী জাহাজগুলিকে নদীপথে আটক করত। ১৬৮৪ খ্রী এহেন ঘটনার প্রতিবাদে বাটাভিয়া থেকে চারটি ওলন্দাজ জাহাজ এসে বরানগরে নোঙর করেছিল বাংলা সুবার মুঘল শাসককে বিক্ষোভ জানাতে। এই 'জাহাজ বিক্ষোভ' এর পর আবার তারা মুঘল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং সাময়িকভাবে বরানগরের ঘাঁটি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। পরে, অন্য একটি অন্তর্কলহের সুযোগ নিয়ে আবার তারা অবশ্য বরানগরের ফ্যাক্টরি দখল করে নেয়।

মুঘল রাজত্বে যে কয়েকজন বিদেশী পরিব্রাজক এদেশে এসেছিলেন বার্নিয়ার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই বার্নিয়ার তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন ওলন্দাজরা ১৬৫৩ খ্রী চুঁচুড়ায় তাদের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করে। এই প্রসঙ্গে বার্নিয়ার সমকালীন বাংলাদেশকে স্থতী ও সিল্কের 'কমন ষ্টোর হাউস' বলে বর্ণনা করেছেন। এই পরিব্রাজকও ওলন্দাজদের বাংলাদেশের সম্পত্তি হিসেবে চুঁচুড়া ছাড়াও বরানগরের উল্লেখ করেছেন।

ইংরেজ ওলন্দাজ কলহ

সর্বগ্রাসী ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কৃপায় ওলন্দাজরাও এদেশে বেশী দিন তাদের বাণিজ্য-প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি; বস্তুত, সপ্তদশ শতকে এদেশে বাণিজ্য করার জন্য বিদেশী কোম্পানিগুলির যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যেই তা সবচেয়ে তীব্রতর রূপ ধারণ করেছিল। প্রাচ্যদেশে ওলন্দাজদের নীতিগুলি দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য-র দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এক, তাদের

স্বাধীনতার শত্রু ক্যাথলিক স্পেন ও স্পেনের মিত্রশক্তি পর্তুগালের প্রতিশোধ নেওয়া ও দুই, বাণিজ্য বিস্তার করে সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলা। এদেশে পর্তুগীজ প্রভাব ক্রমে অধোমুখী হওয়ায় ওলন্দাজদের প্রথম উদ্দেশ্যটি সফল হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ করিতে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হল শক্তিশালী ইংরেজের। ইংলণ্ডেও স্টুয়ার্ট ও ক্রমওয়েলের আমলে সে-সময়ে হল্যাণ্ডবিরোধিতা, এই বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা নিয়েই। ইংরেজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের এই কলহের সূচনা সপ্তদশ শতকের গোড়ায় ১৬০৯ খ্রী, যখন ইওরোপে স্পেন ও হল্যাণ্ডের একুশ বছরের সন্ধি স্থাপিত হয় ও ওলন্দাজদের নৌ-প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ওলন্দাজরা ঈষ্ট ইণ্ডিস্-এ ইংরেজদের বিরোধিতা করার প্রেরণা পায়। এ সময় তাদের কার্যকলাপ আবদ্ধ ছিল জাভা ও আর্চিপেলাগোতে। তারপর তারা ক্রমে বিস্তৃত হয়ে চলে আসে দক্ষিণ ভরতের পুলিকটে ১৬১০ এ। এই সময়ে যথাক্রমে ১৬১১ খ্রী ও ১৬১৩-১৫ খ্রী লণ্ডন ও হেগ কনফারেন্স-এ ইংরেজ ও ওলন্দাজরা পারস্পরিক বোঝা-পড়ার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু ১৬২৩ খ্রী আম-ব নাতে ইংরেজ হত্যার ফ নশ্রুতি হিসেবে ওলন্দাজরা পুনরায় ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়। ইতিমধ্যে তারা ভারতে ইংরেজদের প্রতিপত্তি উপেক্ষা করে। এরপরে ১৬৩০-৫৮ খ্রী সময়কালে তারা যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুর্যোগ উপেক্ষা ক'রে নিজেদের বাণিজ্য শাখা প্রসারিত করে। ১৬৭২-৭৪ খ্রী ওলন্দাজরা সুরাট এবং বোম্বাই এর মধ্যে ইংরেজ-যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত ক'রে ইংরেজদের উত্যক্ত করে এবং বঙ্গোপসাগরে তিনটি ইংরেজ জাহাজ দখল ক'রে নেয়। ১৬৯৬ খ্রী চুঁচুড়ার ওলন্দাজ-প্রধান প্রিন্স আজিম উস্ শান-এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে যেখানে তাঁর কোম্পানি শতকরা সাড়ে তিন ভাগ বাণিজ্য-কর দেয়, ইংরেজরা দেয় মাত্র তিন হাজার টাকা এবং এ-বিষয়ে ন্যায় বিচারের দাবী করেন। এই ভাবে সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরেই ইংরেজ-ওলন্দাজ কলহ অব্যাহত থাকে এবং স্থায়ী হয় ১৭৫৯ খ্রী পর্যন্ত। ঐ সালেই বেদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে ওলন্দাজরা পরাজিত হয়। বরানগর কিন্তু এই পরাজয়ের পরও ওলন্দাজদের দখলে ছিল ছিল। সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করব। এখন বরানগরকে কেন্দ্র করে ইংরেজ ওলন্দাজ কলহের কিছু নিদর্শন দিচ্ছি।

১৭৪৬ খ্রী ওলন্দাজরা ভারতে একচেটিয়া আফিম বাণিজ্যের অধিকার দাবী করে। ইংরেজদের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ-ব্যাপারে একেবারেই সম্মত হলেন না। ইওরোপে যখন দীর্ঘস্থায়ী অষ্টিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলছে তখন ইংলণ্ড থেকে কোম্পানির কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্ এদেশের অফিসারদের কাছে কড়া নির্দেশ পাঠালেন যে ওলন্দাজদের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে কোন উপায়ে দমন করতে হবে। এই সময় থেকে দুটি বাণিজ্য কোম্পানির সম্পর্ক পুনরায় তিক্ত হয়ে ওঠে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৫২ খ্রী তে কোর্ট অব ডিরেক্টরস কে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে ১৭৫২ খ্রী একজন ইংরেজ বন্দী কলিকাতার বন্দীশালা থেকে পালিয়ে বরানগরে ওলন্দাজদের পতাকার তলায় শরণার্থী হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৭৫৫ খ্রী ৩১শে জানুয়ারি বাংলা প্রশাসনকে লেখা কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস-এর একটি চিঠিতে বলা হচ্ছে যে ইংরেজ কোম্পানির সেবকেরা ওলন্দাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের নানারকম ভাবে সাহায্য করছে। কোর্ট অব ডিরেক্টরস এতে ক্ষুব্ধ। অন্য একটি ঘটনায়, ইংরেজরা হুগলী যাওয়ার পথে বরানগরের একজন ওলন্দাজ অফিসারকে জোর করে কলিকাতা ও বরানগরের মাঝ-পথে পড়ে থাকা একটি জাহাজ চালাতে বাধ্য করে। ভারতে তৎকালীন ওলন্দাজ-প্রধান এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ ক'রে ইংরেজদের চিঠি লেখেন ৮ই জানুয়ারি ১৭৫৭ খ্রী এবং ঐ বন্দী নাবিকের মুক্তি দাবী করেন। ওলন্দাজ-প্রধান শঙ্কিত হয়েছিলেন আরও বেশী এই কারণে যে ঐ জাহাজ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নবাবের ওলন্দাজদের ভুল বোঝার অবকাশ ছিল।

১৭৫৭ খ্রী জুন মাসে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের এক সন্ধি স্থাপিত হয় ঐ বছরেই জুলাই মাসে। সন্ধির নয়ধারা অনুযায়ী কলিকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জঙ্গলময় ভূভাগ ইংরেজ কোম্পানির জমিদারি বলে গণ্য হ'ল, আর, ডিসেম্বর মাসে মীরজাফরের তিন নম্বর পরোয়ানা বেরোলো সন্ধিকে সমর্থন ক'রে, তাতে লেখা ছিল ইংরেজদের চব্বিশটি মহল দান করা হ'ল। ১৭৫৯ খ্রী জুন মাসের একটি নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রকৃতপক্ষে এই চব্বিশ মহল থেকেই চব্বিশ পরগনা নামের উৎপত্তি। ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি-খ্যাত জে জেড হলওয়েল

সাহেব স্বাক্ষরিত এই নথি প্রামাণ্য বলে পরিগণিত। এই চব্বিশটি পরগনার মধ্যে একটি ছিল কাশীপুর আর বরানগর ছিল তার অন্তর্গত। ১৭৫৯ খ্রী অবশ্য দিল্লীর মোঘলরা এই চব্বিশটি পরগনার কুইট রেণ্ট বা সরকারী খাজনার অংশ লর্ড ক্লাইভকে অর্পণ করেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আলমের বিদ্রোহকে দমন করতে ক্লাইভ সাহায্য করেছিলেন। তখন চব্বিশ পরগনার বার্ষিক খাজনা ছিল দুলক্ষ বাইশ হাজার টাকা যা ক্লাইভ আমৃত্যু ১৭৭৪ খ্রী পর্যন্ত পেয়েছেন। এই সময়ে বরানগর ওলন্দাজদের হাত-ছাড়া হয়ে যায় কারণ দেখা যাচ্ছে যে ১৭৫৯ খ্রী ওলন্দাজরা ববানগর দখল করার একটি ব্যর্থ প্রয়াস করছে

> Hostilities with the Dutch (broke out) in 1759 when they landed at Fultah, tore down our colours, burnt the houses and effects of the Company's tenants, and seized several of our ships, retaliated by our possessing ourselves of the Dutch factory at Baranagar and followed up by the complete defeat of the Dutch on the plain of Bedurrah on the opposite bank of the River Hooghly. (Statistical and Geographical Report of the 24 Pergunnahs District by Major Ralph Smith—Page : 1-2).

এর থেকে বোঝা যায় যে এই বরানগরকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ-ওলন্দাজ কলহ চরমে উঠেছিল ও ওলন্দাজেরা পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু, বিস্ময়কর এই যে এ-হেন ঘটনার পরও বরানগর যে ওলন্দাজদেরই ছিল তার সুপ্রচুর তথ্য রয়েছে ইতিহাসের সংগ্রহ-শালায়। ১৭৭৫ খ্রী ক্লাইভের মৃত্যুর পর চব্বিশ পরগনা আবার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। অনুমেয় যে এই সময়েই আবার ওলন্দাজরা বরানগর পুনর্দখল করে নেয় কেননা ওয়ারেন হেস্টিংস এর সমকালে ওলন্দাজরা অন্যান্য নানা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার সঙ্গে, হুগলীর কাছাকাছি কোনো একটি স্থানের বিনিময়ে বরানগর ইংরেজদের কাছে বিক্রী

করে দিতে চায়। এই বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমল পর্যন্ত চলে এবং অবশেষে ১৭৯৫ খ্রী এ-বিষয়ে একটি রফা হয় ও বরানগর থেকে ওলন্দাজরা চলে যায়। বরানগর ইংরেজকে দিয়ে দেওয়ার বিস্তারিত কাহিনী আমরা জানতে পেরেছি। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

হুগলীর চুঁচড়ার কাছাকাছি কোনো স্থানের বিনিময়ে বরানগর ইংরেজকে দিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের ওলন্দাজ-কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন হেস্টিংস ও তৎকালীন কলিকাতা কাউন্সিল কে একটি অনুরোধপত্র দেয়। ১০ই এপ্রিল, ১৭৭৫ খ্রী তারিখের সেই চিঠির শেষ পরিচ্ছেদটি এইরকম

> The village of Bernagore lying in the neighbourhood of Calcutta and thus very advantageous for your settlement, we tender to you in exchange by way of Barter for as much ground in the Circle or Environs of Chinsurah as Beranagar contain its full extent. On account of its great distance from us, and have by no particular person to govern them, the possession of it is of the less consequence to us but of the greater importance to your Honours, on account of its aforesaid vicinity. You will therefore be pleased to take this proposal into consideration, and if it can with consistence, suffer it to take place.

ইংরেজ এবং ওলন্দাজ উভয়পক্ষই এই প্রস্তাবে উপকৃত হতে পারে এই ভেবে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রশাসন এই বিনিময়ের ব্যাপারে সম্মত হলেন। তারপর, ১৭৭৭ খ্রী ডিসেম্বরে ক্যালকাটা কমিটি অব্ রেভিনিউ কোনো এক মিঃ পেরিং-এর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন বরানগর ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং হুগলীর যে-জায়গাটি ওলন্দাজরা পেতে চায় সেই এলাকার সীমানা ও মূল্য নির্ধারণ করার। মিঃ পেরিং এ-বিষয়ে তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন ৩০শে এপ্রিল ১৭৭৮ খ্রী। ৭ই জানুয়ারি ১৭৭৯ খ্রী তারিখে গবর্নর-জেনারেল ও কলিকাতা

কাউন্সিলের বৈঠক-বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে হাট ও বাজারের ওপর নির্ধারিত খাজনা বাদ দিয়ে (এগুলি মিঃ পেরিং সংগ্রহ করতে পারেননি) বরানগরের বার্ষিক খাজনা ছিল সিক্কা টাকা ১,৯৬১-১৩-০ এবং হুগলীর কাছাকাছি ওলন্দাজদের প্রত্যাশিত জমির খাজনা সায়ের খাজনা সিক্কা টাকা ১,২০০-১৫-১০ বাদ দিয়ে মোট সিক্কা টাকা ২,১৩৭,৯-১৭-৩। অর্থাৎ দেখা গেল, বরানগরের খাজনার চেয়ে হুগলীর জমির খাজনা ছিল সিক্কা টাকা ১১৫-১২-১৭-৩ বেশী। সমমূল্য ও সমপরিমাণ না হলে বিনিময় বা বার্টার সম্ভব হয় না। তাই, হুগলীর উদ্বৃত্ত জমি ও খাজনা নিয়ে সমস্যা হ'ল। ইংরেজদেব কলিকাতা-প্রশাসন চুঁচড়ায় ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, হয় তাঁরা বরানগরের সমপরিমাণ জমি নিন, নয়তো, হুগলীর উদ্বৃত্ত জমি-বাবদ ইংরেজকে দেয় একটা বার্ষিক খাজনা ঠিক করুন। আলোচনা যখন এই স্তরে উঠে এসেছে ঠিক তখনই ওলন্দাজরা এ-বিষয়ে নিস্তব্ধ হযে গেলেন হঠাৎ। জানা গেল, বাটাভিয়া থেকে তাঁদের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে চরম অনুমতিপত্র পাঠান'ন।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন গবর্নর-জেনারেল হয়ে এলেন তখন আবার এই বিনিময়ের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। সমকালীন ওলন্দাজ-প্রধান মিঃ আইজ্যাক টিটসিং কর্ণওয়ালিশের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ওলন্দাজদের এই ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন। কর্ণওয়ালিশ সাগ্রহে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ১২ই জানুয়ারি ১৭৯০ খ্রী তিনি কলিকাতা কাউন্সিল-কে জানান

> ...the proposed exchange is not only advantageous for the Dutch but in every respect desirable for this (English) Government. Being contiguous to the Town of Calcutta and under a foreign jurisdiction it affords a shelter to disorderly people, and should the Dutch think proper to assume the exercise of the same national privileges at Bernagore as they possess at Chinsurah many political inconveniences would result therefrom to this Government.

এই বিনিময় দ্রুত সংঘটিত করতে কর্ণওয়ালিশ বোর্ড অব্ রেভিনিউ-কে কলিকাতা কাউন্সিলের কাছে এ-বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করতে বললেন। অর্থাৎ তিনি এবং কলিকাতা কাউন্সিল জানতে চাইলেন যে হেস্টিংস-এর আমলে মিঃ পেরিং উভয় স্থানের যে সীমানা ও খাজনা নির্ধারণ করেছিলেন, ইতিমধ্যে তার কিছু রদবদল হয়েছে কিনা। এ-বিষয় নিয়ে ইংরেজরা আর অবশ্য টালবাহানা করেনি কারণ দেখা যাচ্ছে যে প্রায় একই সময়ে কলিকাতা কাউন্সিল উভয় দেশের পক্ষেই সুবিধেজনক বিবেচনা করে ওলন্দাজদের কাছে এই বিনিময় যথাশীঘ্র সম্ভব সংঘটিত করতে প্রস্তাব করেছেন। বরানগর পাকাপাকিভাবে ইংরেজদের হাতে চলে গেল ১৭৯৫ খ্রী। ১৮১৪ খ্রী ১৩ই আগষ্ট ইংলণ্ডের রাজা ও নেদারল্যাণ্ড সরকারের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তার প্রথম ধারাতে বলা হয়েছিল যে 'all the Colonies, Factories and Establishments, which were in the seas and on the continents of America, Africa and Asia with certain exceptions specified, be restored to the Dutch Power.' ভারতবর্ষে এই ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কোচিন এবং বরানগর।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে বরানগরে ওলন্দাজদের উপস্থিতি ও কর্মকীর্তি সম্পর্কিত আরও দু-একটি ঘটনার নিদর্শন দেবার প্রলোভন সংযত করতে পারছি না। ১৭৬৯ খ্রী বাটাভিয়া থেকে এদেশে এসেছিলেন ওলন্দাজ অ্যাডমিরাল স্টাভোরিনাস। তিনি বরানগরে এসেছিলেন সরেজমিনে এই ওলন্দাজ-ঘাঁটিটি পরিদর্শন করতে। সে-সময়ে তিনি দেখেন যে বরানগরের ওলন্দাজ-কুঠিতে একজন মাত্র খাজনা-সংক্রান্ত ওলন্দাজ আণ্ডার-অফিসার বসবাস করেন। সেই কুঠিতে তখনও ওলন্দাজদের পতাকা উড্ডীন ছিল (আমরা আগেই জেনেছি যে ১৭৫৯ খ্রী বেদারার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ওলন্দাজদের প্রভাব হ্রাস পায় ও বরানগর সহ চব্বিশ-পরগনা লর্ড ক্লাইভের জমিদারি হয়ে যায়)। অন্য একটি ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি যে ১৭৮১ খ্রী চ্যাটফিল্ড নামধারী জনৈক ইংরেজ ক্যাপটেন ওলন্দাজ গবর্নর জন রস-এর কাছে এদেশে ওলন্দাজদের টাকা, সোনা ও মালপত্রের হিসেব চেয়ে চিঠি দিলেন। রস সাহেবও তার উত্তর দিলেন। সেই উত্তর ছিল এক দীর্ঘ তালিকার মত।

সেই তালিকায় একটি নাম ছিল, শিবরাম নিয়োগী। বাঙালী এই ভদ্রলোক চুঁচড়া ও বরানগরে ওলন্দাজদের পাটোয়ারী হিসেবে কাজ করতেন।

১৭৯৫ খ্রী বরানগর ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার পর এই জনপদটির ইতিহাসের ধারাবাহিকতাও স্বভাবতই ব্যাহত হয়। কেননা, এতদিন যে-সমস্ত বিদেশী শক্তি ভাগীরথী উপকূলের এই স্থানটির মাহাত্ম্য উপলব্ধ হয়ে এখানে স্থিতিশীল ছিলেন প্রায় দুই শতাব্দী ধ'রে, তাঁরা এসেছিলেন ভারতে শুধুমাত্র বাণিজ্য করতে। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড পলাশী-যুদ্ধের পরেই রাজদণ্ডরূপে ভীষণাকারে দেখা দিল। ক্ষুদ্র এবং নগণ্য এই জনপদটি তাই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর সেই প্রাক্তন গৌরবে অধিষ্ঠিত রইল না। কিন্তু, ইংরেজরা এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ক্রমান্বয়ে ঢেলে সাজাতে শুরু করে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের বিপুল প্রভাব এ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও শিল্প-নীতির ওপর এসে আছড়ে পড়ে। ১৮৫৭ খ্রী সিপাহী বিদ্রোহের পর এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে এবং বরানগরের রূপ ও চেহারা বদলে যায়। জর্জ হেণ্ডারসন সাহেব এখানে ভারতের সর্বপ্রথম যন্ত্রচালিত তাঁত বসিয়ে বিশালাকার জুট মিল গ'ড়ে তোলেন গঙ্গার ধারে ১৮৫৯ খ্রী। বরানগর আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে, বাংলার অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই জুট মিল শ্রমিকদের কেন্দ্র ক'রে সমকালীন সুখ্যাত সমাজ-সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগরে গ'ড়ে তোলেন শ্রমজীবী সংঘ, শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে যা ভারতে সর্বপ্রথম উদ্যোগ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এক অভিনব ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা করেন যাকে কেন্দ্র ক'রে বরানগর উনিশশতকের শালপ্রাংশু -ব্যক্তিত্বদের পাদস্পর্শে তীর্থভূমিতে উত্তীর্ণ হয়।

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধির অনুসন্ধান করে। সেখানে আপন ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রা-নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম। আবার অন্য একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে বর্তমান কালের জন্য বস্তু আহরণ করার চেয়ে অনাগত কালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য অনেক বেশি; জ্ঞান সেখানে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে, কর্ম সেখানে স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে প্রাণিত করে, তা ফললাভ করে জীবপ্রকৃতিতে, আর যা ত্যাগ বা তপস্যার দিকে উদ্বুদ্ধ করে, তাই মনুষ্যত্ব, তাই ধর্ম। আমাদের অন্তরে এমন একজন আছেন যিনি মানুষ অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানুষকে অতিক্রম ক'রে, 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানুষ। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে সর্বজনীনতার প্রচ্ছায়া। মহাত্মারা সেই বিশ্ববীক্ষাকে সহজেই অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁরই প্রেমে মহাত্মাদের জীবন উৎসর্গিত হয়। সেই উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবন-সীমা অতিক্রম ক'রে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই দুর্লভ উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও আজও অনেকক্ষেত্রেই বিকৃত ব'লে, এত বিবাদ, স্বার্থ, দ্বেষ, বিষাদ। কিন্তু সেই আকর্ষণ প্রতিনিয়তই মানুষের অন্তর-অভ্যন্তরে নিঃশব্দে ক্রিয়াশীল বলেই আত্মপ্রকাশের প্রয়াসে ও উদ্যোগে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করে না। সেই মানুষকেই মানুষ নানা নামে পূজো করছে, এক উত্তীর্ণ ঐক্যের মধ্যে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে তাঁকে পাবার প্রত্যাশায়। এমনই এক ধর্মচেতনায় ভারতীয় ধর্মের ঐতিহ্য যুগ-যুগান্তে লালিত হয়ে এসেছে। ভারতের অপর নাম হিন্দ। তাই এ-দেশের সর্ব-সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে ধর্মটি যুগের পর যুগের সাধনায় গড়ে উঠেছে তাকে হিন্দের অর্থাৎ ভারতের, হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম বলাই বিধেয়। ধর্ম সাধনায় এই সমন্বয়কেই মহাত্মা কবীর ভারতের তপস্যা বলেছেন। এই সাধনার মধ্যেই নিহিত আছে বিভিন্নতার মধ্যে একতার মহামন্ত্র। জগতে অন্য কোথাও এই

ধর্মতত্ত্ব বিরল ; সেখানে এক ধর্ম বা সংস্কৃতি অন্যসব দুর্বলতর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে হিংসাপথে গ্রাস করে নেয়। ভারতের ইতিহাসে এই সর্বধর্মসমন্বয়ের মন্ত্রই মর্মকথা।

সুপ্রাচীন কাল থেকে এই ভারতীয় ধর্ম নানা প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব অটুট রেখেছে। বড় আঘাত এল যখন খ্রীস্টীয় দশম শতকে মুসলমান শাসন এদেশে তাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করল। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদী তত্ত্ব ও তার সামান্যীকৃত চেতনা ভারতীয় ধর্মের সূক্ষ্ম চেতনা থেকে হঠাৎ খুব পৃথক মনে হ'ল। প্রায় তিনটি দীর্ঘ শতক ধরে নানা তর্ক-বিতর্ক বাদ-বিসম্বাদ চলল। অবশেষে সর্বধর্মসমন্বয়ী ভারতীয় ধর্মের জয় হ'ল। পঞ্চদশ শতক ও ষোড়শ শতকে এদেশে সূচিত হোল এক ধর্মীয় রেনেসাঁসের মহাযজ্ঞ। বারাণসীতে বল্লভাচার্য্য, মহারাষ্ট্রে নামদেব, উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, নানক এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব এই অভিনব ধর্মীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন যা 'ভক্তি আন্দোলন' নামে ইতিহাসে পরিচিত। অর্থাৎ, সকল ধর্মেরই মূলার্থ ভক্তি এবং সেই অনুষঙ্গে সকল ধর্মই সমানাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

ওপরের প্রস্তাবনা এই জন্য যে, ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শ্রীচৈতন্যদেব বাংলাদেশের নদীয়া জেলার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করলেও আমাদের আলোচ্য বরানগর তাঁর পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল ১৫১২ খ্রী এবং এই জনপদটিকেও তিনি তাঁর যুগান্তকারী ধর্মমত প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। উল্লেখ বাহুল্য যে পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্য-পদচিহ্ন-ধন্য বরানগর একটি প্রধান ধর্মীয় পীঠস্থানে পরিণত হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বরানগর নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে যে শ্রীচৈতন্যদেব বরানগরে রঘুপণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ ক'রে-ছিলেন। এ বিষয়ে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চৈতন্য-সমকালীন পদকারদের উদ্ধৃতির সাহায্যও নিয়েছি। এখন পাঠকদের কৌতূহল নিবারণার্থে আমরা একটি কাহিনী বিবৃত করব যা থেকে জানা যাবে রঘুপণ্ডিত ও তস্য গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের ভক্তি-বিহ্বল ইতিবৃত্ত।

শ্রীরঘুনাথ উপাধ্যায় নামে এক নিষ্ঠাবান্ শাক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন বর্ধমান জেলার চান্দুল ডাকঘরের অন্তর্গত ঘোড়ানাসী গ্রামে। শ্রীচৈতন্যের সমকালে সামাজিক অবস্থা, ধর্ম ও শাস্ত্রানুশীলন কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তা

মোটামুটি অনুমেয়। কুসংস্কারে সমাজ ছিল অন্ধকার, ধর্মান্ধতায় মানুষ উন্মাদপ্রায় হয়েছিল, শাস্ত্রানুশীলনের কাঠিন্যে ভক্তি ও মানবতা বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। এমনই এক সামাজিক কাঠামোয় রঘুনাথের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু ছিল স্বতন্ত্র। যদিও শাক্ত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি অধ্যয়নে রঘুনাথ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং বেশ ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেন। শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু ক্রমে এ ধারণা তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রতিবেশের অভাবে শাস্ত্রালোচনায় সুখ পাচ্ছিলেন না। তাই অন্বেষণ করছিলেন এমন একটি স্থান যেখানে নিভৃতে শাস্ত্রানুশীলনে জীবনটা অতিবাহিত করতে পারেন। দীর্ঘদিন অন্বেষণের পর বেরিয়ে পড়লেন রঘুনাথ দেশত্যাগী হয়ে। নানা স্থান ঘুরে এসে হাজির হলেন বরানগরের নির্জন গঙ্গাতীর মালীপাড়ায়।

মনের মত পরিবেশ পেয়ে রঘুনাথের মনে আনন্দ আর ধরে না। পশ্চিমে কলনাদিনী গঙ্গা। চতুর্দিকে মধুর নিস্তব্ধতা। একটি পুকুরের ধারে দুটি বিশালাকায় নিমগাছের মাঝামাঝি জায়গায় রঘুনাথ একটি কুটীর নির্মাণ ক'রে বাস করতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন আর গৃহ থেকে আনা শ্রীদামোদর গোপালের সেবা করেন। বাকি সময় কাটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নে। রঘুনাথের মনে তবু সেই কাঙ্খিত শান্তি আসে না। একদিন বিকেলে রঘুনাথ গঙ্গাতীরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিন্তায় ধ্যানমগ্ন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য গোধূলির আগে পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে রঙীন ছটা বিছিয়ে দিয়েছে। এমন সময় এক ভদ্রলোক রঘুনাথের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—মশাই! শুনেছেন কি? নবদ্বীপে গঙ্গার তীরবর্তী ভূমিতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে শ্রীভগবান নাকি আবির্ভূত হয়েছেন। রঘুনাথ এই কথা শুনে ব্যস্তভাবে ভদ্রলোকটিকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'এ সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন?' ভদ্রলোক বললেন—'কাল সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে বসে আছি। এমন সময় চোখে পড়ল এক ভদ্রলোক গঙ্গায় দ্রুত পদে স্নান করতে নামছেন। দেখে মনে হ'ল কোনো পথশ্রান্ত বিদেশী হবেন। কিছু কথাবার্তার পর পরিচয় নিয়ে জানলাম, তিনি আসছেন যশোর জেলার তালখড়ি গ্রাম থেকে। যাবেন নবদ্বীপ তাঁর জ্ঞাতি-ভাই লোকনাথের অনুসন্ধানে। লোকনাথ লাউড়াধিপতি রাজা দিব্যসিংহের

মন্ত্রিপুত্র শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের টোলে নিমাইয়েব সহপাঠি। অধ্যয়ন শেষ ক'রে লোকনাথ গৃহে প্রত্যাবর্তন কবলেন। কিন্তু, মা-বাবা তাঁর বিযের ব্যবস্থা করছেন জানতে পেবে তাঁদের নিবস্ত করার চেষ্টায ব্যর্থ হ'য়ে একদিন গভীর বাতে সকলেব অলক্ষ্যে লোকনাথ তালখড়ি ত্যাগ কবে নবদ্বীপ চলে আসেন। পরে নিমাইয়েরই আদেশে নাকি শ্রীধাম বৃন্দাবন গেছেন এরকম শোনা যাচ্ছে। তাই তাঁব বাবা-মা শোকার্ত হয়ে এঁকে নবদ্বীপ পাঠিয়েছেন সঠিক খবর জানতে।'

এ বৃত্তান্ত শুনে রঘুনাথ স্তম্ভিত হলেন, নবদ্বীপ যাত্রার সংকল্প নিযে বাড়ি ফিরে এলেন। কালবিলম্ব না করে সঙ্গে একটিমাত্র জলপাত্র ও শ্রীগোপাল বিগ্রহটি বুকে নিয়ে রওনা হলেন। পরের দিন বেলা তৃতীয় প্রহবে নবদ্বীপ এসে পৌছোলেন। নবদ্বীপ তখন শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ কবেছে। বহু পণ্ডিতের সমাগম। বঘুনাথ দেখলেন নবদ্বীপেব আকাশ-বাতাস, জনপদ-বাজার, গৃহ গৃহস্থালী সব কিছুর মধ্যেই প্রেমেব ঐশী সুষমা। এ-ভাবে রঘুনাথ এসে পডলেন পোড়ামাতলায়। বিহ্বল হয়ে সেই প্রার্থিত পুরুষকে খুঁজছেন, দেখতে পাচ্ছেন না। এক সদাচারী, সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণকে সব কথা জানালেন, তিনি সাগ্রহে রঘুনাথকে নিয়ে গেলেন শ্রীবাস অঙ্গনে। পণ্ডিত রঘুনাথের পরিচয় পেয়ে সকলেই তাঁকে যথাযোগ্য আতিথ্যে আপ্যায়ন কবলেন। চাঁদের হাট বসেছে। শ্রীঅদ্বৈত, হবিদাস, মুরারী, মুকুন্দ প্রমুখ পারিষদবর্গ উপস্থিত। সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের আগমন-প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছেন। সন্ধ্যা সমাগমে গৌরসুন্দর বাঁয়ে গদাধর আব দক্ষিণে নিত্যানন্দ দুজনের কাঁধে হাত রেখে শ্রীবাসঅঙ্গনে এলেন। প্রভুর গলায় ফুলের মালা, সর্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দন-চর্চিত। পরিধানে ধবলপাটের জোড়, আজানুলম্বিত বাহুযুগলে পুষ্পবলয়। রঘুনাথ সেই রূপসাগরের অতলে তলিয়ে গেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসঅঙ্গনে সমবেত ভক্তবৃন্দের প্রতি কৃপাসঞ্চার করলেন তাঁর সর্বমনোহারী দৃষ্টি দিয়ে। তারপর নবাগত রঘুনাথের প্রতি ইঙ্গিত করে শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। শ্রীবাস জানালেন—ইনি বরানগরে থাকেন, নাম রঘুনাথ উপাধ্যায়। আপনার দর্শনার্থী। রঘুনাথ আনন্দ-বিহ্বল হয়ে প্রভুর শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হলেন সাষ্টাঙ্গ। প্রভু তখন গদাধরকে রঘুনাথের সব ভার নিতে বললেন।

তারপর শুরু হয়ে গেল কীর্তন মহারঙ্গ। সমস্ত রাত ধরে কীর্ত্তনের পর যখন প্রভাত হ'ল এবং সকলে গঙ্গাস্নানের জন্য গমনোদ্যত তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রঘুনাথকে ডেকে বললেন—আপনি আজই বরানগরে যেখানে ভজন করেন, সেখানে ফিরে যান, দুঃখ করবেন না, আবার শীঘ্রই দেখা হবে।

রঘুনাথ বুঝলেন যে প্রভুর ইচ্ছে নয় তিনি এখানে থাকেন। তিনি তখন প্রভু গৌরাঙ্গের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রীবাস পণ্ডিতকে জানালেন, প্রভু যেন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথের এই ইচ্ছের কথা জেনে সহচর গদাধর গোস্বামীকে রঘুনাথের ইচ্ছে পূরণের দায়িত্ব দিলেন। গঙ্গাস্নান সেরে সেই দিনই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাদান সম্পন্ন হ'ল। রঘুনাথের ভাগবতে বিশেষ অধিকার আছে জানতে পেরে গদাধর তাঁকে ভাগবতের একটি বঙ্গানুবাদ করার জন্য আদেশ করলেন। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে রঘুনাথ যাত্রা শুরু করলেন বরানগরের উদ্দেশ্যে।

বরানগরে প্রত্যাগমন করে রঘুনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের মধুর সংকীর্তন বিলাসরঙ্গ স্মরণ করেন দিনের পর দিন। স্মৃতি পথে জেগে ওঠে গৌররূপের লাবণ্যচ্ছটা। তৃষিত নয়নে, বিরহাতুর হৃদয়ে দিনের পর দিন যায়, বিরহের অন্তরালে নয়ন জলে রঘুনাথ ভক্তিরসে সেতু বাঁধে। দেহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই রঘুনাথের। শীর্ণ মুখে মাঝে মধ্যে ফুটে ওঠে অনুরাগের রক্তিম আভা। বিরহ দাহ কিছুটা উপশম হ'লে বসে পড়েন গদাধর গোস্বামী আদিষ্ট কার্য-সম্পাদনে। এসময়েই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিণী' লেখা সমাপ্ত করেন বলে শোনা যায়।

এদিকে, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আর মনে নেই বরানগরের রঘুনাথের কথা। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করছেন, ধন্য করছেন বহু জনপদ, পাদস্পর্শে গড়ে তুলছেন তীর্থস্থান। এইভাবে ভ্রমণের মধ্যখানে হঠাৎ একদিন প্রভু তাঁর বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রেখে যাত্রা করলেন কালনা আর কুমারহট্টের দিকে। এই দুটি স্থান ধন্য ক'রে ইংরেজীর ১৫১২ খ্রী এপ্রিল মাসে কৃষ্ণা দশমীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে হাজির হলেন পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাসগৃহে। একাদশীর দিন এখানে অবস্থান ক'রে দ্বাদশীর মধ্যাহ্নে নৌকাযোগে উপস্থিত হলেন বরানগর গ্রামে। নৌকা থেকে অবতরণ

ক'রে প্রভু পদব্রজে চললেন গ্রামের পথে। হঠাৎ কানে ভেসে এল কে যেন সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করছেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য মহাপ্রভু উন্মত্তের মত ছুটে চললেন সেই দিকে। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্য রঘুনাথের বাসস্থানে এসে আশ্রয় নিলেন। রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করে চলেছেন আর প্রভু গোপীগীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী আস্বাদনে তৃপ্ত হয়ে বারবার 'বোল বোল' শব্দ উচ্চারণ করছেন। এভাবে রঘুনাথ পাঠ করেন আর প্রভু কথনো প্রেম-নৃত্যে, কখনো বা আনন্দ আবেশে দিশেহারা হয়ে যান। এমনি ক'রে রাত্রির তিন প্রহর পর্যন্ত নৃত্যের পর প্রভু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করেন, বলেন "আচার্য্য! তুমি আজ আমায় বড় আনন্দ দিলে, ইতিপূর্বে বহুবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনেছি কিন্তু এমন সুখ কখনো পাইনি। আজ থেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য। ভাগবত পাঠরূপ সেবাদ্বারা তোমার জীবন অতিবাহিত কর!" কিম্বদন্তী আছে যে মহাপ্রভু আচার্যের ভাগবতপাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে বরানগরে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। তারপর, প্রভু বিদায় গমনোদ্যত হ'লে রঘুনাথের অন্তঃকরণ বিরহানলে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর পাদুকাদ্বয় খুলে আচার্যকে দিয়ে বলেন, এই নিয়ে তুমি ফিরে যাও, এতেই তোমার বিরহ-জ্বালা প্রশমিত হবে।

এই ভাগবতাচার্য রঘুপণ্ডিতের জীবনাবসান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না তবে, কথিত আছে, যে আচার্যের তিরোধানের পর তাঁর দেহ মহাপ্রভুর সেই নৃত্যভূমিতে সমাধিস্থ করা হয় এবং তাঁর পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত, তাঁর সেবিত শালগ্রাম শিলা, একটি গোপাল মূর্তি এবং মহাপ্রভুর পাদুকাও ঐস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। পরে এই চৈতন্য-ধন্য স্থানটি জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে যায়। মাত্র একটি পুষ্করিণী এবং তার তীরে দুটি নিমবৃক্ষ ভাগবতাচার্যের স্মৃতি বহন ক'রে থাকে। বহুকাল পরে কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রোথিত স্মৃতির পুনরুদ্ধার করেন এবং একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লিখিত নিমবৃক্ষ দিয়ে নিতাই-গৌর যুগল বিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে ঐ মন্দিরে বিগ্রহ-যুগল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ স্থানের নাম রাখেন 'শ্রীল ভাগবতাচার্যের পাঠবাড়ি'। কালক্রমে বহুজনের হাতে এই পাঠবাড়ির সেবার দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং অবশেষে বাংলার ১৩৩৪ সালে এই পাঠবাড়ির ভার শ্রীবিজয়

গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক নামাচার্য রামদাস বাবাজীর হাতে অর্পণ করা হয়। আজও এই পাঠবাড়িতে গৌর-নিতাই বিগ্রহযুগল, ভাগবতাচার্যের শালগ্রাম শিলা ও মহাপ্রভুর পাদুকাদ্বয় নিয়মিত পূজিত হয়। রামদাস বাবাজী ১৩৬০ সালে দেহরক্ষা করলে এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। (দ্রঃ বরানগরের ধর্মীয় সংস্থা)

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন

ষোড়শ শতকে যে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ সমগ্র দেশ জুড়ে এনেছিল এক ধর্মীয় রেনেশাঁস এবং মোঘল সম্রাট আকবরের দীন-ই-ইলাহি ধর্মতত্ত্বের উদ্ভাবনে যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল, তা ছিল নিছক ধর্মীয় কাঠামো অনুষঙ্গে এক সর্ব-ভারতীয় নবজাগরণ। এই নবজাগরণের রেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, রাজনৈতিক ডামাডোলে সমাজের প্রতিটি আনাচে কানাচে এই ধর্মীয় চেতনা প্রবিষ্ট হয়নি। ধর্মপ্রসঙ্গে একটা উদারনৈতিক মতবাদের অবতরণিকা হয়েছিল মাত্র, মানুষ-জনের হৃদয়াভ্যন্তরে সে উদারনীতির ছায়াপাত ঘটেছিল, একটা স্থিতিশীল প্রভাব বা দীর্ঘস্থায়ী মতবাদ গড়ে ওঠেনি। প্রায় দুশো বছর পরে, বিভিন্ন যুযুধান বণিক সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপের অবসানে ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশে তাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠ করল, তখন সূচিত হ'ল একটি ভিন্নতর যুগ। শাসন এবং শোষণকে চিরস্থায়ী করতে তারা সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে দৃঢ়গ্রন্থিতে শক্তিমান করে তুলল, পশ্চিম থেকে বণিকের পণ্যসম্ভারের সঙ্গে বহু অভিশাপ এদেশের মাটিকে বিষাক্ত করল। কিন্তু, সেই বহু অবাঞ্ছিত দুঃখবেদনার সঙ্গে এল পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রখর আলো, পশ্চিমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিগড়ের পাশাপাশি এল রুশো, ভলতেয়ারের অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহা, ফরাসী-বিপ্লবের দুরন্ত মতবাদ, মিল-বেন্থামের হিতবাদ, নীৎসের নৈরাজ্যবাদ, ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডির জলন্ত দেশপ্রেমের কাহিনী, ওয়াশিংটনের সংগঠন ক্ষমতার ইতিবৃত্ত। উনিশ শতকে পশ্চিমের আলোকোজ্জল সভ্যতার স্পর্শে ভারতের নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই স্রোতস্বিনী প্রভাবে দুটি নবসংস্কৃতির ধারা এদেশে প্রবাহিত হ'ল, একটি শিক্ষার, অপরটি ধর্মের।

ধর্মীয় নবজাগরণের যে ধারা প্রবাহিত হ'ল তা, তদানীন্তন হিন্দুধর্ম ও আচারের ওপর নবাগত খ্রীস্টধর্মের সংঘাতের ফলশ্রুতি। রাজা রামমোহন রায় বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরলেন হিন্দুধর্মের বিচারসিদ্ধ একেশ্বরবাদ—ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সুখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি সভ্যতার পত্তন ও পতন বিষয়ক ইতিহাসতাত্ত্বিক আলোচনায় চ্যালেঞ্জ অ্যাণ্ড রেসপন্স তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে যখনই রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গে দেশীয় ভাবধারাগুলি অ্যালায়েন বা বহিঃ আদর্শের মুখোমুখি হয় জয়-পরাজয়ের প্রশ্নে, তখনই আর্কাইক ভাবধারাগুলি ফিরে আসে। ভারতে ইংরেজী ভাবধারা অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন সেই প্রতিক্রিয়ার প্রথম অভিপ্রকাশ। এই ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে হিন্দু রিভাইভালইজম্ শুরু হয়েছিল তা পরে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত ও দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদের নবব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা পায়। হিন্দুধর্মের প্রাচীন গৌরবের পুনর্নবীকরণে রামমোহনই ছিলেন পুরোধা। বিদেশীরা অপপ্রচার করেছিল যে হিন্দুধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অসভ্যদের ভূতপুজার নামান্তর। রামমোহন প্রমাণ করলেন যে হিন্দুধর্মের লৌকিক আচার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যাই হোক্ না কেন, এই ধর্মের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে প্রাচীন হিন্দুধর্মে উন্নত একেশ্বরবাদের কথাই বলা হয়েছে। ১৮২৮ খ্রী রামমোহন ব্রাহ্মসভা গঠন করেন। ১৮৩০ খ্রী ৮ই জানুয়ারি ব্রাহ্মরা প্রথম একটি উপাসনাগৃহ গড়ে তোলে। এই উপলক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট ডিড-এ রামমোহনের স্থাপিত সভায় কি ভাবে কার উপাসনা হবে, তা তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে যান। তিনি নির্দেশ করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্তা, আদিঅন্তরহিত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁর উপাসনা হবে না। যে-কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনা করতে আসবেন, তাঁরই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ-নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি এই মন্দিরে ব্যবহৃত হবে না। প্রানিহিংসা হবে না, পান ভোজন হবে না, জীবই হোক বা জড়ই হোক্, কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সঙ্গে উল্লেখ করা হবে না। যাতে পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায়

প্রসার হয়, প্রেম-নীতি-ভক্তি-দয়া-সাধুতা উন্নতি হয়, এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হবে। অন্য কোনরূপ হতে পারবে না।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও ক্রমে আদি, নববিধান ও সাধারণ এই তিনভাগে বিভাজনের কথা উপসংহারে আলোচিত হবে। এখন, উল্লেখ প্রাসঙ্গিক যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বরানগর ও তৎ সন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে আলোড়িত করে। বরানগরের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ধর্ম গ্রহণ ক'রে বরানগরে সমাজ সংস্কারের এক বিশাল মহাযজ্ঞের সূচনা করেন; ১৮৬১ খ্রী তিনি কুলগুরুর কাছে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নেন কিন্তু মনে শান্তি না পেয়ে পুনরায় ঐ কুলগুরুর কাছেই 'আনন্দ ব্রহ্মেতি' মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং আরও পরে ১৮৬৫ খ্রী তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। শশিপদ ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনকে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনেরই ভিন্নরূপ বলে জেনেছিলেন। তাই তাঁর সমগ্র জীবন ছিল মানুষ-জনের সেবায় নিয়োজিত। তাঁর পুত্র স্যার আলবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জি পিতৃকৃত্য করেছেন পিতার একটি অসাধারণ জীবনপঞ্জী রচনা ক'রে। অ্যান ইণ্ডিয়ান পাথফাইণ্ডার নামে সেই গ্রন্থটি থেকে জানতে পারি যে একদা শশিপদ তাঁর নিজস্ব ধর্ম-চেতনা সম্পর্কে বলেছিলেন

> Prayer within and service without—this is religion, work is nothing else. The deeper in prayer, the greater in service. Life-long prayer and life-long service. Prayer has kept alive the spirit of service and service has enlivened prayer.

শশিপদ বরানগরে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে যে কর্মকাণ্ডের পুরোহিত হয়েছিলেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচ্য। বরানগর-সন্নিহিত বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেন মহাশয়ের বাড়িতে কেশব সেন মহাশয় সশিষ্য সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকতেন। উল্লেখযোগ্য যে এই বাগানবাড়িতেই হৃদয়ের সঙ্গে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কেশব সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সিঁথিতে

বেণীমাধব পালের উদ্যানবাটিতেও ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হোত, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হতেন। উল্লেখ্য যে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বরানগরেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।

রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মচেতনার সমীকরণে উনিশ শতকে শেষ যে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের নবজাগরণে আর একটি সুনির্দিষ্ট ধারা প্রবর্তিত হয়, তার প্রধান পুরুষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রামমোহনের ছিল শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য, প্রতিষ্ঠা আর রামকৃষ্ণের ছিল দারিদ্র এবং সাধারণ শিক্ষায় অপটুতা। অথচ তাঁর লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে বসে এই গ্রাম্য, দরিদ্র অতিমানুষটি অবলীলায় অতি দুরূহ দার্শনিক জটিলতা সর্বসাধারণের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। (এখানে স্মর্তব্য যে ১৯৪৯ খ্রী পর্যন্ত বরানগর পৌর সভার সীমানা ছিল উত্তরে ম্যাগাজিন রোড পর্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি বরানগর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত ছিল) আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত মিশনারি কলেজের পাশ করা ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শাস্ত্র পারঙ্গম নৈয়ায়িক বৈষ্ণবচরণ, মহাযাজ্ঞিক তার্কিক গৌরীকান্ত, বেদান্তবাদী তোতাপুরী, তান্ত্রিক সাধনাসিদ্ধ যোগেশ্বরী ভৈরবী সকলেই বিস্মিত, অভিভূত, আপাত অশিক্ষিত এই পূজারী ব্রাহ্মণ কেমন নির্দ্বিধায় সকলের ঈশ্বর জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছেন, সন্দেহ নিরসন ক'রছেন, বিদগ্ধ বিচারমল্লদের পরাভূত করছেন আবার অবোধ শিশুর মত মা মা বলে কাঁদছেন, দক্ষিণেশ্বরীর সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রছেন। তাঁর মতবাদে জটিলতা নেই, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা নেই, যত মত তত পথ। ফলত, রামকৃষ্ণ কোন নতুন ধর্ম বা নতুন মতবাদ প্রচার করলেন না, যার যা ধর্ম তা-ই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে বললেন। যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর লীলাক্ষেত্র গড়ে তুলেছিলেন, সেই তীর্থ-মন্দির নির্মাণের প্রেক্ষাপটে যে কাহিনী নিহিত রয়েছে তা বিবৃত হওয়া প্রয়োজন মনে করি পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য।

কলিকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী রাণী রাসমণি কাশী যাবেন। কৈবর্তের মেয়ে, কিন্তু আসলে অষ্ট সখীর এক সখী। রাণীর মন প'ড়ে

রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে। চারটি কন্যার মা। তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাস, যিনি দক্ষিণেশ্বরের ইতিহাসে সেজবাবু নামে পরিচিত। বিয়ের স্বল্পকাল পরেই মারা যায় করুণাময়ী। রাসমণি চতুর্থ কন্যা জগদম্বার সঙ্গে বিয়ে দেন মথুরাবাবুর।

রাজেন্দ্রানী রাসমনি। রাজেন্দ্রানী হয়েও অন্তরে তিনি ভিখারিণী। তেজস্বিনী হয়েও মমতার গঙ্গা-মৃত্তিকা। সংসারে কিছুই চান না, শুধু সেই মহাযোগেশ্বরী, মহাডামরী সাট্টহাসা মহাকালীর রাঙা পা দুখানি কামনা করেন। সেরেস্তায় যে শিলমোহর চলতি, তাতে তাঁর নাম লেখা 'কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী'। ঐশ্বর্য্যের শয়নে শুয়েছেন, কিন্তু উপাধান হয়েছে বিশ্বেশ্বরীর উৎসঙ্গ। বাংলার বারোশো পঞ্চান্ন সাল। রাণী কাশী যাবেন মনস্থ করেছেন। দর্শন করবেন অন্নপূর্ণাকে, মহাভিক্ষুক বিশ্বনাথকে। অঢেল টাকা এজন্যে আলাদা করা আছে। অজস্র হাতেই তা ব্যয় করবেন। ঘাটে বাঁধা হয়েছে নৌকো, সারি সারি প্রায় একশোখানি। থরে থরে সম্ভার সাজানো হয়েছে। কত দাস-দাসী আত্মীয় পরিজন। সবাই বিশ্রাম করছে নৌকোতে। শুধু একজন জেগে আছে। রাণীর কোষাগারের দ্বারপাল।

নৌকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রাণী ঘুমিয়ে পড়েছেন। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এসেছেন, স্বপ্ন দেখলেন রাণী রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'কাশী যাবার দরকার নেই। এই ভাগীরথীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর্। আমাকে অন্নভোগ দে।' ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন রাসমণি। ওরে, নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চল্! আর কাশী যেতে হবে না। স্বয়ং কাশীশ্বরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। প্রথমে রাসমণি ভেবেছিলেন গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে বালি-উত্তর পাড়ায় জমি নেবেন। কথায় বলে, গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। কিন্তু ও-অঞ্চলের জমিদারদের বুদ্ধিসুদ্ধি আজগুবি। টাকার বিনিময়ে জমি দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জমিতে পরের টাকায় যে ঘাট তৈরী হবে সে ঘাট দিয়ে তাঁরা গঙ্গাস্নান করতে যাবেন না। এই বেয়াদপ বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করতে না পেরে রাসমণি পূর্বকূলে উপস্থিত হলেন। পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বর। এক লপ্তে ষাট বিঘে জমি কিনলেন রাসমণি। জমির কতক অংশের মালিক ছিল হেষ্টি নামে এক সাহেব, আর

বাকি অংশে মুসলমানদের কবরখানা আর গাজী পীরের থান। জমির গড়ন খানিকটা কচ্ছপের পিঠের মত। তন্ত্রমতে অমন জমিই শক্তিসাধনার অনুকূল।

ন' লাখ টাকায় মন্দির আর মূর্তি তৈরী হয়ে গেল। নবরত্নবিশিষ্ট কালীমন্দির, উত্তরে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির আর দক্ষিণে নাটমণ্ডপ। মধ্যস্থলে প্রশস্ত চত্বর। উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে আরো তিন সার দালান—সব মিলে অতিকায় দেবায়তন। ১৮৫৫ খ্রী ৩১শে মে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় আর প্রায় সমসময় থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ পূজারী নিযুক্ত হ'ন এবং তাঁর লীলাক্ষেত্রে পরিণত করেন এই দেবালয়কে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগ দেখা দেয় ১৮৮৫ খ্রী, চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলিকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। রোগের উপশম না হওয়ায় ১৮৮৫ খ্রী ২১শে ডিসেম্বর তাঁকে কাশীপুরে গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটিতে আনা হয়। এখানেই ১৮৮৬ খ্রী ১৬ই আগষ্ট তিনি তিরোধান করেন। বরানগর সন্নিহিত এই উদ্যানবাটিই আজ কাশীপুর উদ্যানবাটি নামে পরিচিত। ১৯৪৫ খ্রী সিউড়ির রামকৃষ্ণ আশ্রম পাঁচথুপির সুবোধ কুমার ঘোষ মৌলিকের কাছ থেকে এই উদ্যানবাটি কিনে নেয় এবং ১৯৪৬ খ্রী বেলুড় মঠকে হস্তান্তর করে। কাশীপুর উদ্যানবাটি এখন রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পত্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান হলে তাঁর অগণিত গৃহত্যাগী যুবক ভক্তেরা বিপদে পড়ে যান। কাশীপুর উদ্যানবাটির লিজ ফুরিয়ে এসেছিল। গৃহী ভক্তগণ যুবকদের ঘরে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন কিন্তু কৃতসংকল্প যুবকরা কর্ণপাত না করে একটি নতুন বাড়ির অনুসন্ধান শুরু করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস জীবদ্দশায় নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বারোজন গৃহত্যাগী শিষ্যকে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করেন। এই নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ-এর সঙ্গে বরানগর নানা ঘটনায় স্মৃতিবিজড়িত হয়ে আছে। নরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বরানগর প্রামাণিক ঘাট রোডে মুন্সীবাবুদের জীর্ণ বাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। বাড়িটি তখন আর মুন্সী-বাবুদের ছিল না। ভুবন দত্ত নামে এক ব্যবসায়ী কিনেছিলেন। ১০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঐ বাড়িটি নেওয়া হয়। এখানেই বরানগর মঠের সূত্রপাত। উল্লেখযোগ্য যে এই বরানগর মঠেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিরজা হোম করে

নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বরানগরে স্বামীজীর বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু বাস করতেন। বরানগর-সন্নিহিত কাশীপুর রতনবাবু রোডে ২০ নং বাড়ির হরিদাস মণ্ডল, ১৯১ নং প্রামানিক ঘাট রোডের দাশরথি সান্যাল স্বামীজীর বিশিষ্ট সুহৃদ ছিলেন। তাছাড়া, কলুপাড়ায় (বর্তমান অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন) বসবাসকারী শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। এই ভবনাথ প্রায় নিয়মিত স্বামীজীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। তাঁর নারীসুলভ কোমল প্রকৃতি এবং নরেন্দ্রর সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে একবার রসিকতা ক'রে বলেছিলেন 'জন্মান্তরে তুই নরেনের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।' দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে জয়মিত্র কালীবাড়ির উত্তরে ৫৮ নং প্রানকৃষ্ণ সাহা লেনে সাহাদের বাড়িতেও স্বামীজীর যাতায়াত ছিল। বাঁড়ুজ্যে পাড়ায় (বর্তমানে মহারাজ নন্দকুমার রোড—উত্তর) কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল রামকৃষ্ণ পরমহংসের কৃপালাভ করেছিলেন। তার গৃহেও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) যাতায়াত করতেন। এই গৃহই পরবর্তীকালের 'পাদুকা-ভবন'।

কাশীপুর চন্দ্রকুমার রায় লেনে প্রাচীন দশমহাবিদ্যা মন্দির, কাশীপুর শ্মশান-ঘাট (বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান), প্রামানিক ঘাট রোডে প্রামানিকদের কালীবাড়ি এবং জয়মিত্রের কালীবাড়িতে স্বামীজী প্রায়ই প্রণাম করতে যেতেন। বরানগরের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম গোলকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশধরদের কাছে আমরা জেনেছি যে বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠার পর স্বামীজী প্রায়ই ওঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে ভিক্ষাগ্রহণ করতে যেতেন। ১বি শ্রীকান্ত চৌধুরী লেনে যে প্রাচীন শিবমন্দির এখনও রয়েছে, শোনা যায়, সেখানেও স্বামীজী মাঝে মাঝে শিবপূজা করতে যেতেন। এই শিব মন্দিরের এলাকাকে লোকে 'বুড়ো শিবের তলা' বলে।

১৮৯০-৯১ খ্রী স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বহু শিক্ষিত যুবক দেশের নানাস্থান থেকে বরানগর মঠে আসতে শুরু করেন ও অনেকেই মঠে যোগদান করেন। ফলে, মুন্সীদের ওই পুরনো, জীর্ণ বাড়িতে আর স্থান সঙ্কুলান হল না। ১৮৯১ খ্রী নভেম্বর মাসে আলমবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মঠ স্থানান্তরিত হ'ল। এই বাড়ির বর্তমান ঠিকানা ৩০/১ রামচন্দ্র বাগচী লেন।

বরানগর মঠ থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ফিরে আসেন আলমবাজার মঠে। ১৮৯৭ খ্রী ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজী প্রতীচ্য দেশে ধর্মবিজয় করে দেশে প্রত্যাগমন করেন। যেদিন কলিকাতায় আসেন সেই দিনই বিকেলবেলা অতি সমাদরে তাঁকে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের উদ্যানবাটিতে নিয়ে আসা হয়। এই উদ্যানবাটিতে তিনি কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্য ও বন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন বসবাস করেন। এই বাড়িতেই স্বামী-শিষ্য-সংবাদ প্রণেতা শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে স্বামীজীর নানা বিষয়ে আলাপ হয়। মিস্ মুলার ও স্বামীজী শিষ্য মিঃ গুডউইল এই উদ্যানবাটিতেই তাঁর সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এ-সময়ে দিনের বেলায় শীলেদের বাগানবাড়িতে স্বামীজী আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করতেন ও রাতে আলমবাজার মঠে গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হতেন।

১৮৯৭ খ্রী কলিকাতার প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে আলমবাজার মঠ-বাড়িটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৯৮ খ্রী ১৩ই ফেব্রুয়ারি গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়িতে মঠ উঠে যায়। ওই বছরই মার্চ মাসে বর্তমান বেলুড় মঠের জমি কেনা হয় ও মন্দির নির্মিত হয়। এইসব নানা টুকরো কাহিনী থেকে বোঝা যায়, যে রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছে, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল বরানগরে। বরানগরকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ-শিষ্যবৃন্দের সংগঠন।

বরানগর কর্তাভজা সম্প্রদায়

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে এদেশে যে-কয়েকটি লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তাদের ভেতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কর্তাভজা সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্য যাই হোক্ না কেন, এই ধর্মমণ্ডলীর বহিরঙ্গ আচার অনুষ্ঠানে এমন কতকগুলি মানবিক আবেদন আছে, যা আধুনিক কালের সমাজ-ভাবনার সহযোগী। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের কিছু পরে। তখন রাজনৈতিক পটভূমিতে, মুসলমান আমলের অবক্ষয়-স্তরে ইংরেজ কোম্পানির অভ্যুদয় হচ্ছে। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটেও

তখন তন্ত্রাচারের নামে ব্যভিচার, বৈষ্ণবীয় রসচর্চার নামে তরল প্রেম সাধনা ও ফকিরী অলৌকিক সিদ্ধির ছলে বুজরকি ও অনাচার। সমাজের নিম্নস্তরে তখন যোগের নামে ভোগ, বৈষ্ণবতার নামে 'বৈষ্ণবীকাড়' ও অসমর্থ বাউল-ফকিরের চারিচন্দ্রভেদের দ্বার অবারিত। এরই ভেতর এলেন পূর্ণচন্দ্র আউলচাঁদ। তিনিই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, তিনিই আদিকর্তা। সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেন, তিনি ছিলেন কন্থাধারী মুসলমান ফকিব, দীক্ষা তাঁব বৈষ্ণবের ঘরে। তিনি অদ্ভুত 'ভাবের মানুষ': 'তাঁর নাইকো রোষ সদাই তোষ মুখে বলে সত্য বল'। আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অলৌকিক সিদ্ধি: 'এ-হারা দেওয়ায় মরা জীয়ায় এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো'। জনসাধারণ এঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল, এঁর ভাবের মূর্তি ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে। এঁর যে বাইশজন অনুবর্তী ছিলেন সুরুতে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ঘোষপাড়ার রামশবণ পাল। তিনিই আদি কর্তাভজা। পবে, ইনিই কর্তাবাবা হ'ন এবং বলা চলে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তাঁর সময় থেকেই। এই রামশরণ পালেরই সহধর্মিনী ছিলেন সরস্বতী দেবী (সতী মা বা কর্তা মা)। ইনি এই সম্প্রদায়ের আদ্যাশক্তির প্রতীক। ফকিরবাবার কৃপাধন্যা সরস্বতী দেবী অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। জনশ্রুতি যে স্বয়ং ফকিরবাবাই দুলালচাঁদ বা লালশশীরূপে সতীমা-র গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষিত সমাজে তার পরিচিতি ও প্রতিপত্তি এই দুলালচাঁদের আমল থেকেই। যে 'শ্রীযুতের পদ' বা 'ভাবের গীতি' গান করে কর্তাভজারা আবিষ্ট প্রেমে মাতোয়ারা হ'ন, সেগুলি দুলালচাঁদেরই রচনা। এই গানগুলি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শুধু ভজন সঙ্গীত নয়, প্রমাণ গ্রন্থও বটে। এই গানগুলি ছাড়া সম্প্রদায়েব আচার-আচরণ ও বিধি নিষেধ বিষয়ক কতকগুলি বোল বা নির্দেশ প্রচলিত আছে যার অপব নাম 'ট্যাকশালী বোল'। বোলগুলি গ্রাম্য ভাষায় রচিত হলেও এগুলির গভীর 'রহস্যময়তা' আকৃষ্ট করে। এই বোলগুলিকে বলা যায় কর্তাভজদের কর্মবিবেক। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, কর্তাভজা প্রধানত ক্রিয়াপ্রধান সম্প্রদায়, তত্ত্বগত দার্শনিকতা এই সম্প্রদায়ের ধর্মচেতনাভুক্ত নয়। মতান্তরে জানা যাচ্ছে যে কর্তাভজারা তাঁদের প্রবর্তক আউলচাঁদকে মনে করেন শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার। শ্রীচৈতন্যদেব যবনপ্রীতি

ও হরিজন সেবায় মনোমত পথ পাননি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাই নতুন পথ প্রবর্তনের জন্য তিনি ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হ'ন। এঁদের মতে, কর্তা বা ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সাধনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে জাতি বা সম্প্রদায় বিচার নেই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই।

বরানগরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই কর্তাভজা সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করেছিল বলে জানা যাচ্ছে। এই সময়ে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 'সত্যধর্ম' এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যে নবপ্রসূত ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরাও তাতে বিচলিত হয়ে ওঠেন। বরানগরের অন্যতম ব্রাহ্মনেতা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদার-পন্থার কথা আগেই জেনেছি। তাঁরই সমসময়ে বরানগরে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনেকগুলি উপাসনাস্থল ছিল। বনহুগলীতে নিমচাঁদ মৈত্রের বাগান এই সংঘের মধ্যে অন্যতম। এই স্থানে সপ্তাহে একদিন ক'রে (এই দিনটি ছিল শুক্রবার, কেননা কর্তাভজা ধর্মমতে ওই দিনটিই উপাসনার পক্ষে প্রকৃষ্ট) কর্তাভজারা সম্মিলিত হোত এবং তাদের সাম্প্রদায়িক বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে স্তোত্রপাঠ ও আরাধনা করত। শশিপদবাবু প্রায়শই সন্ধ্যেবেলা কর্তাভজাদের নিমচাঁদ মৈত্রের বাগানবাড়ির উপাসনা স্থলে যেতেন এবং বলতেন যে তাদের উপাসনার ঐকান্তিকতার দ্বারা তিনি সেই দলে মিশে বিশেষরূপে উপকৃত হতেন। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক তাঁর 'নবযুগের সাধনা' গ্রন্থে (এটি বাংলা ভাষায় লেখা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে প্রামাণ্য বায়োগ্রাফি বা জীবনী) লিখেছেন যে এই সম্প্রদায়ের ঐকান্তিকতা ও নিজ অপরাধ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা শশিপদবাবুর ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল

> বিশ্বাস ও প্রার্থনা দ্বারা সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়। জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়, ইহাই শশিপদবাবুর দৃঢ়তম বিশ্বাস… তিনি বলেন, প্রার্থনা ও বিশ্বাস ব্যাধিনাশের অদ্বিতীয় উপায়। শশিপদবাবু আরও বিশ্বাস করতেন, ভগবানের নিকট অপরাধ স্বীকার করলে ইন্দ্রজাল অপেক্ষা অদ্ভুত ফল ফলে। এগুলি তাঁর জীবনের পরীক্ষিত সত্য। উপাসনার শক্তিবলে তিনি কন্যার দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেছেন, অপরাধ স্বীকার ও মার্জনা ভিক্ষার ফলে

তাঁর স্ত্রী রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছেন। শশিপদবাবু এ দুটিই শিখেছিলেন কর্তাভজাদের সংস্পর্শে এসে। (নবযুগের সাধনা-কুলদাপ্রসাদ মল্লিক)

উল্লিখিত মুখ্য কয়েকটি ধর্মীয় আন্দোলন ছাড়াও ধর্মাসক্ত এই জনপদটিতে একাধিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মীয় সংস্থা গ'ড়ে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে, যার প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো ধর্মপুরুষের আত্মদর্শনের বিশিষ্টতায় পরিপুষ্ট হয়েছে। দেশব্যাপী ধর্মীয় আন্দোলনে এই সব সংস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও আলোচ্য জনপদটির ধর্মীয় চেতনার প্রবাহে তাদের সগুরুত্ব উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। এঁদের মধ্যে স্বর্গীয় শশিভূষণ সান্যাল মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এঁর মূল সাধনক্ষেত্র নিজগ্রাম বালী হলেও জীবনের দীর্ঘতম সময় তিনি বরানগরে অতিবাহিত করেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ এই ধর্মমহাপুরুষের কাছে নিয়মিত আসতেন ও বহু ধর্ম-বিষয়ক আলোচনায় সময় কাটাতেন। এই মহাত্মা সাধনমার্গে যে কতদূব অগ্রসর হয়েছিলেন তা তাঁকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী থেকে জানা যায় (দ্রষ্টব্য—শ্রী সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সাধক শশীভূষণ')। শশিভূষণ-পুত্র স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ সান্যাল মহাশয় পিতার লীলাক্ষেত্র এই বরানগরেই পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে এক দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দুবাবুর পুত্রেরা সেই মন্দিরে নিত্য বিগ্রহের পূজা অর্চনা করে থাকেন আজও।

সাধন সমর আশ্রম শক্তি সাধনার পীঠস্থান। এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আদিনিবাস অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলা। ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব নামে তিনি তাঁর এই সাধন-সমর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা ও অন্যান্য শক্তি বিষয়ক গ্রন্থ তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞানের ফলশ্রুতি। এঁর পুত্র ও বহু শিষ্য বরানগরেই বর্তমান। নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এই মহাত্মার শিষ্যত্ব লাভ ক'রে দেওঘরে গুরুধাম স্থাপনার দ্বারা গুরুদেবের যথোপযুক্ত স্মৃতি-তর্পণের ব্যবস্থা করেছেন। কুঠিঘাটের বিজয়বাসুদেব আশ্রম স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বসুর (কোয়াবাবু) স্মৃতি বিজড়িত। ইনি রাসবিহারী অ্যাভিন্যু-এর মহানির্বাণ মঠের স্বামী রুদ্রানন্দের শিষ্য। অবধূত সম্প্রদায়ের এই সাধুর জীবিকা ছিল

আকাশ বৃত্তি। বিস্ময়কর যে এই অবধূত সন্ন্যাসী নিজগৃহে বৈষ্ণব-সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা ক'রে পুজো করতেন। অদ্বৈত সাধনা ও বৈষ্ণব সাধনার এ এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তারাপীঠে বামদেব সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধক সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মকীর্তিও ছিল বরানগরকে কেন্দ্র ক'রে। ইনি ধর্ম-বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা ও এই জনপদে শক্তিসাধনার অন্যতম পথপ্রদর্শক। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথজীও তাঁর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন বরানগরকে, পি. ডব্লু. ডি. রোডে তাঁর ধর্মীয় সৌধ মহামিলন মঠ তার সাক্ষ্য বহন করছে।

বরানগরে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল ষোড়শ শতকের গোড়ায় ব্যাপক অর্থে ভক্তি আন্দোলন ও সংকীর্ণ অর্থে বৈষ্ণব আন্দোলনের বৈভবের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ধর্ম যে অর্থে ধারণ করে এবং সরাসরি সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিবেশের ওপর ছায়াপাত করে, সে-অর্থে ষোড়শ শতকীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের কোনো সামাজিক ভূমিকা ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সমসময়ে হিন্দু-ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রথা-কাঠিন্যের ওপর আঘাত হেনে যে প্রগতিবাদের পথ প্রদর্শন করেছিলেন তা তাঁর অন্যান্য ধর্মদর্শনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। প্রেম, আত্মত্যাগ ও ধর্মসংগীতের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরপ্রাপ্তির পরমানন্দে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই ছিল তাঁর প্রচার ও দর্শন। তিনি সকল সামাজিক শ্রেণীর কাছে এই বাণী পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন একদিকে, অন্যদিকে বর্ণবৈষম্যকে কখনই সামাজিক পাপ ব'লে মনে করেন নি। ভক্তি আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে একমাত্র মহাত্মা কবীরই এই সামাজিক অপরাধ উপলব্ধ হয়েছিলেন। ধর্ম যেখানে শুধুমাত্র ঈশ্বর-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে সেখানে তা সমাজ ও অর্থনীতি নিরপেক্ষ হয়েই থেকে যায়। যে সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ধর্মবাণী সুশ্রাব্য হয় না, সেই সব মানুষজন সমাজের অন্ধকারেই থেকে যায়। এ-প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস-এর একটি সুচিন্তিত দর্শন স্মরণীয় মনে হয় 'Not the man who denies the gods worshipped by the multitude, but he who affirms of the gods what the multitude believes about them, is truly impious.' (আমাদের মনে হয়েছে শ্রীচৈতন্যের ধর্মদর্শন এই অবশ্যম্ভাবী দোষে দুষ্ট ছিল)। পরবর্তীকালে অবশ্য এই দোষ

প্রকট হওয়াতে বৈষ্ণবধর্ম তার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন করে এবং সমাজের নীচু বর্ণের মানুষজন এই ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কর্তাভজা সম্প্রদায় এমনই একটি ধর্মগোষ্ঠী যারা বৈষ্ণবদর্শন গ্রহণ ক'রে একটি সরল সামাজিক সম্প্রদায় হওয়ার উদ্যোগ নেয়। মতুয়া নামক আরো একটি সম্প্রদায়ের কথা আমরা জানতে পারি যারা বৈষ্ণব দর্শনের সাহায্যে নিজস্ব সম্প্রদায় গ'ড়ে তোলে (এই মতুয়াদের একটি গোষ্ঠী চব্বিশ পরগনার নিউ ব্যারাকপুর অঞ্চলে এখনও বর্তমান)।

ইতিহাসের প্রয়োজনে যে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল রামমোহন রায়ের পৌরোহিত্যে, সে-আন্দোলনও তার উচ্চ দার্শনিকতা এবং অন্তর্কলহে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারেনি। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং উনিশ শতকীয় 'ভদ্রলোক' সমাজের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়েছিল। 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শীর্ষক ভাষণে ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন

> যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পাবে, সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনও দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তুবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনোই শুষ্ক হয়নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি—কিন্তু, তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালীর সামগ্রী করে না জানি, যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্ক তুষারশ্রুত সেই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিক্-প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা

করে জলদমন্ত্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যানের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্য-পর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মধ্যে যে চিরকালীন ভারতবর্ষের ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন গগনচুম্বী প্রত্যাশায়, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সে আকাঙ্খা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা এই আন্দোলনকে অবচেতনেই 'সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালীর সামগ্রী' করেই জেনেছিলেন এবং উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজের ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়েছিল তাকে সঞ্জীবিত করে তুলতে কখনই সার্থক হন নি। ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে কতখানি হিঁদুয়ানি প্রবিষ্ট হয়ে গেল, এই বিতর্কেই ব্রাহ্মসমাজের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বরানগরের ব্রাহ্মনেতা শশিপদ তাঁর সামাজিক অস্তিত্বের নিরিখে তাই কখনই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে পারেননি (দ্রঃ নবযুগের সাধনা-কুলদা প্রসাদ মল্লিক)। যে-সমস্ত সমাজ-সেবা মূলক কাজে কিছু কিছু ব্রাহ্মনেতা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেগুলির সমাজতাত্ত্বিক চরিত্র সম্পর্কে সামাজিক ইতিহাসের গবেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন। তাছাড়া, আদি, নববিধান ও সাধারণ এই তিন ভাগে সমাজের বিভাজনের ঘটনার মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত স্বার্থান্বেষ ও অনৈক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বরানগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একক উদ্যোগে যে কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন করেছিলেন, তাকে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সার্বিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একত্রে দেখা যাবে না। শশিপদ, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে ছিলেন।

যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভূমিকার জন্য ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল ক্রমশ, সেই একই দোষে দুষ্ট হ'ল রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন—যেআন্দোলনের মূল বীজটি উপ্ত হয়েছিল বরানগরে। যে সহজ সরল দর্শনে

রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে আত্মসমীক্ষার অভাবে ও প্রচারের বৈভবে এক বিচিত্র রূপ গ্রহণ করল। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণদানের পর রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক রূপ পেয়ে গেল দ্রুত।

সেবাকর্মের পাশাপাশি কোনো ধর্মীয় মতামত বা গোষ্ঠী যখন একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণী গ'ড়ে তোলে তখনই তা অবচেতনে সমাজহনন করে। সাম্প্রতিককালে এঁদের মধ্যে অন্তর্কলহও প্রকট হয়ে উঠছে। আন্দোলনের মূল পুরোহিতদের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় অনেকেই বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় সংস্থা গ'ড়ে তুলছেন, বরানগরেই এমন সংস্থা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে ধর্মের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা রয়েছে। বরানগরে ধর্মীয় চেতনার প্রবাহে এই ধরনের কোনো সমাজমঙ্গলমূলক ভূমিকা কোনো ধর্মীয় আন্দোলনই নিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সকলেই তাঁদের ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে, জনমানসের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁরা কেউই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাচীনতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

ভারতশ্রমজীবী।

সচিত্র মাসিক পত্র।



ভারত শ্রমজীবী

১২৮৭, আষাঢ়, ৭ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

(অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারত শ্রমজীবী

পশ্চিমী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজ যুগসঞ্চিত অন্ধকারকে অপসৃত করতে উদ্যোগী হয়েছিল এক ভিন্নতর নবজাগরণের প্লাবনে। একদিকে, ইংরেজী শিক্ষার প্রখর আলো, অন্যদিকে সর্বগ্রাসী পশ্চিমী সংস্কৃতির সর্বস্তরে অনুপ্রবেশের অন্ধকার, দু-য়ের মাঝখানে পিষ্ট হয়ে এক নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল যার পুরোধা হলেন রাজা রামমোহন রায়। কলিকাতা শহরকে কেন্দ্র ক'রে এই শ্রেণীর কর্মকাণ্ড সুরু হ'ল। শহরজীবনেই পশ্চিমী ভাবধারার বড় অংশটি সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। উনিশ শতকে ইংরেজরা এদেশে নির্ভীক এবং স্থিতিশীল শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ফলে, এই শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে এ-দেশের শিক্ষার্থী মানুষকে ইংরেজী শেখানো প্রয়োজন হ'ল। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় মধ্যবিত্তরাই সর্বাগ্রে কোনো নতুন ভাবধারার দিকে সহজে ধাবিত হয়। মধ্যবিত্ত বাঙালী যারা কলিকাতার আশেপাশে দীর্ঘদিন বসবাস করছিল, তারা এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গ'ড়ে তুলল মধ্যবিত্ত বা অভিজাত সমাজ। আমরা জানি যে এই ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা 'ভদ্রলোক' চেতনা গ'ড়ে উঠেছিল যা সমগ্র উনিশ শতক ও বিশ শতকেও একটি বিচ্ছিন্ন শ্রেণীসমাজ হিসেবে কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইংরেজী শিক্ষিত সমাজই উনিশ শতকে সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করে, যা পরে উনিশ শতকীয় নবজাগরণ বলে ইতিহাসে পরিচিত হয়। এঁদের মধ্যে একটা সীমিত ক্ষুদ্র অংশ বৃহত্তর অর্থে সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক আন্দোলনের সঙ্কীর্ণতা পেরিয়ে, তাঁদের সমসময়ে যথেষ্ট প্রগতিবাদী হয়ে, মেহনতী মানুষের কথা চিন্তা করেছিলেন। রামমোহন রায়, যিনি এ-দেশের প্রায় সর্বস্তরের সংস্কারের পথ প্রদর্শক, তিনিও এই সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক অনুষঙ্গে রামমোহনের শ্রেণীচরিত্র যাই হোক না কেন, সমাজের নীচুস্তরের মানুষের প্রতি তিনি যে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। মলঙ্গা শ্রমিকদের আন্দোলনে তিনি শ্রমিক-স্বার্থ-সংরক্ষণের চেষ্টা

করেছিলেন। বিলেতে রবার্ট ওয়েনের শ্রমজীবীদের উন্নতিমূলক কাজকে তিনি সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন। রামমোহনের এই ধারাকে অব্যাহত রেখে সমকালীন বঙ্গদেশে মেহনতী মানুষের সপক্ষে বহু মতামত প্রকাশিত হতে থাকে সাময়িকপত্রে, সংবাদপত্রে। রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলেছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'পল্লীগ্রামের প্রজাদের দুরবস্থা' শীর্ষক রচনায় প্রজাদের উৎপীড়নের কথা সবল কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। ১৮২৭ খ্রী পাল্কীবাহকদের ধর্মঘটকে সমর্থন করে বাঙালী অভিজাত সমাজের তরফেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মতামত প্রকাশ করেন। জরীপ বিভাগের কুলিদের ওপর ইংরেজ অফিসারদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন সুখ্যাত রাধানাথ শিকদার মহাশয়। কিন্তু, বস্তুত এদেশের দরিদ্র, মজুর, কৃষক ও শ্রমজীবীর স্বার্থ যে দেশের মানুষের স্বার্থের অন্তর্গত সেটা প্রথম প্রকট হয়ে ওঠে ১৮৫৭ খ্রী র পর যখন নীলচাষীদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র দেশ আলোড়িত হয়। যথাক্রমে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা দুটি নীলকর শ্রমিক, চা-বাগান শ্রমিক এবং ইংরেজ কুঠির শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্য' প্রবন্ধ দুটির মাধ্যমে মেহনতী মানুষের প্রতি তাঁর সহৃদয়তার কথা জানালেন। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন 'হে ভারতের শ্রমজীবী, তোমায় প্রণাম'।

এমনই একটি সমাজনৈতিক ভাবধারায় (Social milieu) জন্ম হয়েছিল শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৪১ খ্রী ২ ফেব্রুয়ারী বরানগরে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা পঞ্চদশ শতকের কোনো এক সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে হুগলী নদীর উপকূলে এই জনপদটিকে বসবাসের জন্য পছন্দ করেন। জনশ্রুতি যে, শ্রীচৈতন্য যখন বরানগরে এসেছিলেন তাঁর যাত্রাপথে তখন শশিপদর বংশের কোনো এক আদিপুরুষকে তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ আশীর্বাদসূচক উপাধি দান করেন। ফলত তারপর থেকে এই পরিবারটি উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশ হিসেবে বরানগরে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। যাজক হিসেবে এই পরিবারের প্রসিদ্ধি ছিল এবং ইংরেজরা যখন ওলন্দাজদের কাছ থেকে বরানগর নিয়ে নেয়, তখন

এই পরিবার ইংরেজদের বরানগর-প্রশাসনে সহায়তা করেছিল। শশিপদর পিতা ছিলেন উল্লিখিত শ্রীচৈতন্য-আশীর্বাদ ধন্য আদি পুরুষের ভাগ্নে রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র। (এই বংশের একটি বংশ লতিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। ইংরেজী শিক্ষার সূচনাকাল থেকেই এই পরিবার ওই শিক্ষায় আলোকিত হতে শুরু করেন। ১৮১৪ খ্রী ইংরেজরা চুঁচুড়ার কাছে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং বরানগর থেকে হুগলীর কিঞ্চিৎ দূরত্ব থাকলেও শশিপদর পিতা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিবার ঐ বিদ্যালয়েই শিক্ষা গ্রহণ করে।

মাত্র চার বছর বয়সে শশিপদ পিতৃহারা হ'ন। তৎকালীন হিন্দু যৌথ পরিবারে তাই শশিপদর বাল্যকাল যথেষ্ট স্নেহ ও যত্নে লালিত হয়নি। কাকা ও কাকীমার প্রযত্নে শশিপদর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁর মায়ের প্রভাব শশিপদর অন্যান্য অভাব পূরণে সহায়তা করে। তাঁর মা বলতেন, 'আমার সন্তানরাই আমার ধর্ম। যথা নিয়মে তাদের লালন করাই আমার কাছে ঈশ্বর সেবার তুল্য।' তিনি নিজে অশিক্ষিত হলেও সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এবং সমকালীন প্রথা অনুযায়ী শশিপদর বাল্য শিক্ষার সূচনা হয় কুলগুরুর কাছে। ন'বছর বয়সে উপনয়নের পর শশিপদকে ইংরেজী স্কুলে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়ার পর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য আর বেশী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে অসমর্থ হ'ন। পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত শিক্ষার্জনই শশিপদর নিজস্ব শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফসল। হিন্দু যৌথ পরিবারের তৃতীয় সন্তান হিসেবে পরিবার ব্যবস্থায় শশিপদর কোনো ভূমিকাই ছিল না। এই অবদমিত অস্তিত্ব সত্ত্বেও, এই যৌথপরিবারের প্রতিবেশেই শশিপদ যৌবনকালে এক আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্ববান পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন, চারিত্রিক দার্ঢ্য ও অধ্যবসায়ের সুবাদে। কুড়ি বছর বয়সে তিনি তেরবছর বয়স্কা একটি কুলীন ব্রাহ্মণ বালিকাকে বিবাহ করেন। এখানে স্মরণীয় যে তৎকালে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল কিন্তু শশিপদ বাল্য বিবাহে সম্মত হন নি। হিন্দু সমাজে বিবাহ-প্রথা সংস্কারের মধ্য দিয়েই তাঁর সমাজ সংস্কারক জীবনের সূচনা হয়েছিল, বলা যায়। উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন বিবাহে উপঢৌকন গ্রহণ করার প্রথাও বর্তমান ছিল। শশিপদর পরিবারও ব্যতিক্রম ছিল না এক্ষেত্রে, কিন্তু, এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের সর্বপ্রকার সুবিধা থাকা

সত্ত্বেও শশিপদ তাঁর পত্নীর পরিবারের কাছ থেকে উপঢৌকন নিতে অস্বীকার করেন। ১৮৬১ খ্রী, তাঁর বিয়ের এক বছরের মধ্যেই শশিপদ তাঁর পত্নীকে শিক্ষাদান করতে শুরু করেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রনয়ণে তাঁর এই উদ্যোগ যৌথ-পরিবারে যথেষ্ট বিক্ষোভের কারণ হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে পরিবারের অন্যান্য সকল মহিলাদেরই এই উদ্যোগ উৎসাহিত করে এবং গৃহে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে শশিপদ এই বাধা অতিক্রম করেন। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ এই দশ বছর শশিপদর জীবনে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। তাঁর বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান, স্ত্রী-শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রভৃতি স্থানীয় প্রথানুরাগী, রক্ষণশীল ব্যক্তিত্বের কাছে উৎকট বিপ্লব বলে মনে হয় এবং একটা সময়ে তিনি সমাজ-বহিষ্কৃতও হন। সমগ্র জীবনব্যাপী যে মানুষটি সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও শ্রমজীবী স্বার্থ সংরক্ষণে নিবেদিত ছিলেন, সেই শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হয়নি। বরং বলা ভাল ব্যক্তি জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তিনি হেলায় ত্যাগ করেছিলেন। সরকারী চাকরির উচ্চপদে আসীন হওয়ার সুযোগ তাঁর এসেছিল। কাশীপুরে একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে তিনি জীবন শুরু করেন। পরে, অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল-এর অফিসে ট্রেজারি বিভাগে চাকরি নেন। চব্বিশ পরগনার জেলা-শাসকের অফিসে বড়বাবুর চাকরি নেন ম্যাজিষ্ট্রেট এ. স্মিথের অনুরোধে এবং ১৮৭৪ খ্রী তিনি বরানগরের সাব রেজিষ্ট্রার হয়েছিলেন। তদানীন্তন বাংলার গবর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেবাকর্ম ব্যাহত হতে পারে এই ভেবে শশিপদ ঐ সম্মানীয় পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে থেকেই তিনি একদা সুপারইনটেনডেণ্ট অব্ পোস্ট অফিসেস্-এর পদে কিছুদিন চাকরি করেন। এই কাজের জন্য তিনি ভারতীয় ডাকঘর কর্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন কর্মচারীদের বিশেষ প্রশংসা লাভও করেছিলেন। সরকারী কাজে আসলে তাঁর মন ছিল না, ১৮৮১ খ্রী তাই তিনি এই পদেও ইস্তফা দেন। ১৯২৫ খ্রী পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি সর্বসময়ের জন্য সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

শশিপদ ও বরানগরের সমকালীন প্রতিবেশ

আমরা জেনেছি যে ১৮৫৯ খ্রী বোর্নিও জুট কোম্পানি বরানগরে বাংলাদেশের প্রথম জুটমিলগুলির অন্যতম বরানগর জুট ফ্যাক্টরি গ'ড়ে তোলে। বরানগরে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল। জুট মিল স্থাপনার পরেই এই তৃপ্ত সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটা স্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দিল। প্রায় চারহাজার শ্রমিক নিয়োগ করে এই জুট মিলের সূচনা হয়। শশিপদ যখন যুবক হলেন তখন বরানগরের সামাজিক প্রতিবেশ দুটি বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। ভদ্রলোক ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একদল 'প্রোগ্রেসিভ' বা প্রগতিবাদী ও অন্যদল 'অর্থোডক্স' বা প্রথাবাদী হিসেবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। শশিপদদের ব্রাহ্মণ পরিবার ইংরেজী শিক্ষার প্রবণতার দিকে ঝুঁকেছিল। তাছাড়া, এই পরিবারটি ইংরেজদের প্রশাসনের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছিল। শশিপদর পিতা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শশিপদ তাই তেমনই একটি বংশোদ্ভূত ছিলেন, যে-বংশ সমকালীন প্রগতিবাদের শরিক ছিলো। এবং তাঁর যখন বয়স আঠারো, তিনি আবিষ্কার করেন যে সমাজের প্রাগ্রসর অংশের শরিক হিসেবে তাঁর পরিবারের সকলেই মদ্যপান করেন।

সে-সময়ে স্থানীয় ভদ্রলোক সমাজের মূল প্রতিপাদ্য ছিল বরানগরে জুট মিল গঠন। পুরনোপন্থীরা এই জুট মিল প্রতিষ্ঠার ঘোরতর বিরোধিতা করলেন কেননা শ্রমিকদের বিশৃঙ্খলা ও কোলোবাবুদের (জুট মিলে যে সব বাবুরা কাজ করতেন তাঁদের কোলোবাবু বলা হ'ত) উৎপাত সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর বিকৃত প্রভাব ফেলতে পারে। শশিপদর মত কিছু প্রগতিবাদী ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ অবশ্য জুট মিল প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কেননা তাঁরা মুখ্যত এই মিল-এ স্থানীয় বেকার তাঁতীদের পুনর্বাসনের কথাই ভেবেছিলেন (বঙ্গাব্দ ১২৮৬ জৈষ্ঠ্য সংখ্যার 'ভারত শ্রমজীবী'-তে বলা হয়েছে যে ইংরেজরা এদেশের তাঁতের ব্যবসা বিধ্বংস করেছে। বরানগরের জুট মিল-এ পাঁচ-ছ' হাজার কর্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই তাঁতী ও যুগী সম্প্রদায়ভুক্ত)। কিন্তু সকলেই যে শশিপদর দৃষ্টিভঙ্গীতে মিল প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তা

নয়। কিশোরী মোহন গাঙ্গুলী বা রাজকুমার মুখার্জীর মত স্থানীয় জমিদাররা তাঁদের স্বার্থের উর্দ্ধে যেতে পারেননি। মিল কর্মচারীরা তাঁদের জমিতে বসবাস করবে এবং আরো বেশী খাজনা পাওয়া যাবে, এই স্বার্থান্বেষ তাঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। আবাব অন্য একজন, প্রানকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মিল কর্তৃপক্ষের চরম শত্রু হয়ে উঠলেন কেননা তাঁর জমিতে মিল-মালিকরা বাড়ি তুলবেন। এমনই অদ্ভুত সব স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বরানগরেব সামাজিক প্রতিবেশ দ্বিধাম্বিত হয়েছিল এবং শশিপদও সেই ব্যবস্থার অন্যতম ফসল হয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিবেক এবং শশিপদ

উনিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলাদেশের বৃহত্তব ক্ষেত্রে এবং বিশেষত ব্রাহ্ম যুবাদের মধ্যে 'সামাজিক বিবেক'-এর উপলব্ধি ঘটেছিল। কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ চরমপন্থী ব্রাহ্মবা এই সময়ে তাঁদের ব্যক্তিগত পাপবোধকে সমাজের বৃহত্তর ভূমিতে এনে স্থাপন ক'রে আন্তরিকভাবে 'সামাজিক অপরাধ' নির্মূল করতে চেয়েছিলেন এবং 'ব্যক্তিগত পাপে পতিত আত্মাদের' মুক্তিদান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে-সময়ে অধিকাংশ সংস্কারক ব্রাহ্মবৃন্দ এই ধবনের পাপবোধের দ্বারা তাড়িত হয়েই ব্রাহ্ম আন্দোলনে এবং সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮'০ খ্রী কেশব সেনকে যখন অভদ্র আচরণের জন্য পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার কবা হয়, তখনই তিনি ব্রহ্মসাধনার প্রতি আসক্ত হন। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াব সময় কোনো একটি সার্ভে জাতীয় কাজে অসদুপায় অবলম্বন ক'রে কৃষ্ণকুমার মিত্র মানসিক সংঘাতে সাংঘাতিক কষ্ট পেলেন। তাঁর জীবনে ছিল এটাই সন্ধিক্ষণ এবং অনুতাপে তিনি সার্ভে ম্যাপ ছিঁড়ে ফেলে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছেড়ে দিলেন। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এমনই এক মানসিক সংঘাতেব মুখোমুখি হলেন যখন উনিশ বছর বয়সে তিনি মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনটি ঘটনা তাঁর জীবনের গতিপথ পাল্টে দিল। ১৮৫৯ খ্রী শশিপদ ভীষন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অব্যবহিত পরেই তাঁর মা ও ভাইয়ের মৃত্যু হ'ল। সত্তরের দশকে অন্য এক

শশিপদ সমর্থক ব্রাহ্মকেও দেখা যায় ব্যক্তিগত যন্ত্রনায়, পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছেন ও উদ্ধারের জন্য আকুল প্রার্থনা করছেন—তিনি সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয় যে এঁদের প্রত্যেকের পাপবোধ সমপ্রকৃতির ছিল। কেননা তাঁরা তো ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমির সন্তান। অথবা এমন কথা ভাববারও অবকাশ নেই যে এঁরা সকলেই, তাঁদের শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে সমস্যার স্বাভাবিক উদ্ভব হয়, তারই সমাধান খুঁজেছিলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যে। আসলে, এখানে একটি বিশেষ ব্যক্তিক ও সামাজিক সমস্যার মূল অনুসন্ধান করাই সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের ঐতিহাসিকের কর্তব্য। এটা ঠিক, যে, কেশব সেনের আমলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত পাপবোধ সকলকে আবিষ্ট করেছিল এবং ১৮৬০-১৮৭০ সময়কালের সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেও এই ব্যক্তিগত পাপ মোচনের পথ খোঁজারও একটা প্রচেষ্টা ছিল। বৃহত্তর অর্থে যাকে সামাজিক সচেতনতা বলা হয়, সমকালীন ব্রাহ্মদের মধ্যে তা কখনও জাগরুক হয়নি যেমনটি হয়েছিল সমসময়ের বোম্বাইতে যেখানে বর্ণ বা নাগরিক সংস্কারের মত নৈর্ব্যক্তিক সমস্যাগুলিই সমাজ সংস্কারকদের কর্মসূচীতে প্রাধান্য পেয়েছিল। এই ব্যক্তিগত পাপবোধ এবং সমাজ সংস্কারের মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় যখন দেখি 'অনুতাপ' এই দুইয়ের মধ্যস্থতা করে। কিন্তু যে সামাজিক অবস্থা এই পাপবোধকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, তার বিশদ পরিচয় আবশ্যক।

যে বহুবিধ সংস্কারমূলক কর্মসূচী এইসময়ে নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল ব্যাপক এবং বিস্তৃত। টেম্পারেন্স, স্ত্রী-শিক্ষা, শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি ছিল কর্মসূচীর অগ্রাধিকার। এই সংস্কার-স্পৃহা পনেরো বছর (১৮৬০-৭৫) স্থায়ী হয়েছিল। শুরু হয়েছিল যখন কেশব সেনের নেতৃত্বে সঙ্গৎ সভার সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁদের সকল প্রত্যয়কে কার্যে পরিণত করতে হবে এবং শেষ হ'ল যখন কেশব সেন প্রচার করলেন কঠোর তপশ্চর্যা। ১৮৭৫-এই কেশব সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন এবং এসময় থেকেই শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নবীনতর ব্রাহ্মদের সঙ্গে কেশব সেনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মধ্যবর্তীকালীন সময়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে রয়েছে, অন্তঃবর্ণ বিবাহ (১৮৬০-৬৪), প্রতিনিধি সভাকে কেন্দ্র ক'রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেন

গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত (১৮৬৪), ১৮৬৩ থেকে টেম্পারেন্স আন্দোলন এবং দাল, পার্কার, নিউম্যান এবং কোব-এই কয়েকজন খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের প্রভাবে নবীনতর ব্রাহ্মগোষ্ঠীর খ্রীস্টধর্মের প্রতি অনুরক্তি। ১৮৬৬ খ্রী ১১ই নভেম্বর ব্রাহ্মসমাজের বিভাজন হয়। বিলেতের সমাজসেবিকা শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টার এদেশে আসেন ১৮৬৬ খ্রী এবং কলিকাতায় প্রথম ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপিত স্থাপিত হয় ১৮ ৯ খ্রী। সংস্কার আন্দোলন সার্থকতাব শিখরে ওঠে ১৮৭০ খ্রী, যখন কেশব সেন মহাশয় বিলেত যান এবং সেখানে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। সেই বছরেই কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিযেশন গঠিত হয় ২৯শে অক্টোবর। দ্বিতীয়োক্ত সংস্থাটির ছত্রছায়ায় সুলভ সমাচার নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৬ই নভেম্বর, ১৮৭০ খ্রী শ্রমজীবীদের জন্য এবং ২৮শে নভেম্বব একটি শ্রমজীবী সংগঠন স্থাপিত হয়। সংস্কার আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে যখন ১৮৭২ খ্রী কেশব-বিরোধী গোষ্ঠী 'সমদর্শী' ওই একই নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে।

আমাদের আলোচ্য শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টতই কেশব সেন পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বরানগরে তাঁর নিজস্ব সমাজ সংস্কার আন্দোলনেব কর্মসূচী বিস্তৃত বঙ্গদেশে ১৮৬০-৭৫ এই পনেরো বছরের ব্যাপক সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর প্রথম স্ত্রীকে শিক্ষাদান (১৮৬২), স্থানীয় টেম্পারেন্স আন্দোলনে নেতৃত্ব দান (১৮৬৪), বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন (এই বালিকা বিদ্যালয়ই আজকের রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয়), বালকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনা, শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমজীবী সংগঠন, ভারত শ্রমজীবী ও বরাহনগর সমাচার নামক দুটি পত্রিকার প্রকাশনা প্রভৃতি সমাজসংস্কারমূলক কর্মসূচী শশিপদ বরানগরে গ্রহণ করেছিলেন। তবে, বরানগরের কাছে তাঁর অঙ্গীকার এবং একই সঙ্গে কলিকাতার বৃহত্তর জগতে উত্তীর্ণ হবার আকাঙ্খা, শশিপদকে এক সংঘাতের মুখোমুখি করেছিল। সংস্কারমনা শশিপদ বরানগরে সংখ্যালঘিষ্ঠের দলে ছিলেন, ফলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরনোপন্থীদের সঙ্গে তাঁকে প্রায়ই সমঝোতায় আসতে হ'ত। এবং হয়তো সে কারণেই তাঁর বহু সিদ্ধান্ত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মেনে নিতে পারে নি।

মেরী কার্পেণ্টার, শশিপদ ও শ্রমিকমঙ্গল

সমাজ সংস্কারক শশিপদর জন্ম হয় বরানগরে টেম্পারেন্স আন্দোলনের সূচনা থেকে (১৮৬৪)। এই সময়েই শশিপদব জীবনের মোড ঘুরে যায় কেননা এই সময় থেকেই ভবিষ্যতের শ্রমিক-সংস্কারক শশিপদ কলিকাতার সমাজ সংস্কাব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। রেভারেণ্ড সি, এইচ, দাল, রেভারেণ্ড জে পাইন, পিয়ারিচরণ সরকার এবং কেশবচন্দ্র সেন —এঁরাই তখন নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস গ্রন্থে বলছেন যে বরানগর টেম্পারেন্স সোসাইটিই বস্তুত বরানগরে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সূচনা কবে। ১৮৬৫ খ্রী ২৩শে জুলাই সিঁদুরিয়াপট্টির গোপাল মল্লিকেব বাড়িতে কেশব সেনেব বক্তৃতা 'Struggle for Religious Independence and Progress in the Brahmo Samaj' শুনেই শশিপদ ব্রাহ্মধর্মে আসক্ত হ'ন ও দীক্ষা নেন। তিনি তাঁর পবিত্র পৈতা ত্যাগ করেন ও বরানগবে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা কবেন। (এখানে স্মরণীয় যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়েব এই সিদ্ধান্তের সত্যতা বিতর্কের উর্দ্ধে নয় কারণ শশিপদব অন্যতম যোগ্য জীবনীকার কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় তাঁর 'নবযুগের সাধনা' গ্রন্থে স্পষ্টতই বলেছেন যে শশিপদর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক কোনদিনই ভাল ছিল না এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে 'হিন্দু' বলে পরিচয় দিতেন। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।)

শশিপদ শ্রমিক সংস্কারের কাজে আগ্রহী হলেন মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের সান্নিধ্যে এসে। এই বিদেশিনী মহিলা তাঁর স্বদেশ ব্রিস্টলে বহু জনহিতকর সংস্থার স্থাপয়িতা এবং ইনি ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শুরু করেন রামমোহন রায় ও কেশব সেনের সংস্পর্শে এসে। রামমোহন মেরী কার্পেণ্টারে সঙ্গে ব্রিস্টল-এর রেড লজ হাউস-এ দীর্ঘদিন ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই বাড়িতেই ১৮৩৩ খ্রী রামমোহন দেহত্যাগ কবেন এবং এখানেই মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে বহু ভারতীয় মনীষী ও নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ হয়। ১৮৬৬ খ্রী মেরী কার্পেণ্টার যখন তৃতীয় বারের জন্য ভারত সফরে আসেন তখন কলিকাতায় বহু সভা সমিতিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এমনই একটি সভায় এই ভারত-প্রেমিকা শশিপদর

ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হ'ন এবং বরানগরে আসার জন্য শশিপদ দম্পতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মেরী কার্পেন্টার বরানগরে শশিপদ-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসেছিলেন ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খ্রী। এতদিন পর্যন্ত শশিপদর সংস্কার আন্দোলন নিবদ্ধ ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। মেরী কার্পেন্টারের বরানগর সফরের অব্যবহিত আগে অবশ্য শশিপদ স্থানীয় জুট মিল শ্রমিকদের নিয়ে একটি সান্ধ্য বিদ্যালয় গঠন করেন এবং সেখানে তিনি ও তাঁর ভাই কেদারনাথ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করতে শুরু করেন। কিন্তু সেই বিদ্যালয়ে সবাই শ্রমিক ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কেননা ১৮৬৭ খ্রী যখন শশিপদর আমন্ত্রণে মেরী কার্পেন্টার বরানগরের একটি সভায় যোগদান করেন এবং সমবেত জনগণকে শ্রমজীবী বলে সম্ভাষণ করেন তখন অনেকেই অসন্তুষ্ট হ'ন (মেরী কার্পেন্টার 'Unwillingly offended some of my turbaned audience by addressing them as those who were engaged in factory work, that being performed, they considered, solely by persons who were ignorant and illiterate; the fact of their being able to understand me proved the contrary with regard to themselves')। ইংরেজ ও স্বদেশী অধিবাসীদের নিয়ে শ্রমিক মঙ্গল স্বার্থে একটি সংগঠন গ'ড়ে তোলার প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়। এই সংগঠনটিই পরবর্তীকালে 'Baranagar Social Improvement Society' নামে পরিচিত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতিসাধন প্রকল্পে শশিপদ এইভাবেই মেরী কার্পেন্টার দ্বারা প্রভাবিত হ'ন। মেরী কার্পেন্টার তাঁর দেশে শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণকারী সংস্থা ও শ্রমিক মঙ্গল বিষয়ক নানা সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি এদেশেও তাই সমাজের নীচু শ্রেণীর মানুষের মঙ্গলসাধনের ওপর গুরুত্ব দিলেন (স্মরণীয় যে বিলেতে Working Men's Club-এর সঙ্গে মেরী কার্পেন্টার সংযুক্ত ছিলেন)। তিনি জেনেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণী এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সুফলগুলি ভোগ করে না। পরবর্তীকালে শশিপদ নিজেই মেরী কার্পেন্টারের প্রভাবের কথা স্বীকার ক'রে মিস্ কার্পেন্টারকে চিঠি লেখেন

I used to look to that Church (Brahmo Samaj) only as the torch from which light would gradually fall on all sides of

Barahanagar and its adjoining places, .. but your visit has opened out new paths to my view, new fields of action. I had scarcely time to do anything practical good for the great mass of the people, and had scarcely thought of so doing. Indeed I had opened a Girl's School for educating girls of the respectable community... I have even succeeded to start a night school for the working people of the factory, but all these are nothing to compare with the work we have in view... the Temperance Society of this place so long tried to only reclaim gentlemen from the habit of drinking strong liquors. Now we should try to go into the circles of the working people, people who are in this country held as low, and as not important members of the society.

মেরী কার্পেন্টারের এই শ্রমিকপ্রেমী ভাবধাবায় উদ্বুদ্ধ হয়েই শশিপদর মূল সংস্কারক জীবন সুরু হয়। ১৮৬৯-১৮৭৪ এই পাঁচবছর সময়কালে শশিপদ দ্রুত নিজেকে নিয়োজিত করেন বহুধাবিস্তৃত সমাজ সেবায়। বরানগরে প্রথম নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৪ই জুন ১৮৬৯ খ্রী যেখানে জুটমিল শ্রমিকেরা তাদেব সান্ধ্যকালীন ভোজনের পব দুঘণ্টার জন্য নিয়মিত আসতে সুরু করে। ১৮৭১ খ্রী অনুরূপ নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কুঠিঘাটে, আড়িয়াদহে কামারপাড়ায় (এখানে উল্লেখ্য যে শ্রীরামপুবে জুটমিল এলাকা বড়াই-তে শশিপদ শ্রমিকদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা করেন। ১৮৭০ খ্রী ২০শে আগষ্ট শশিপদ গঠন করেন 'শ্রমজীবী সংঘ' বা Working Men's Club) এই সংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত ছিল মদ্যপান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। জনৈক ইংরেজ টেম্পারেন্স আন্দোলনকারী ডব্লিউ. এস. কেইন-এর মতে, বরানগরের পুরনো টেম্পারেন্স সোসাইটিই রূপ পরিবর্তন করে শ্রমজীবী সংঘ হিসেবে পরিচিত হয়। শশিপদ এই সংঘের কাছে আদর্শ স্বরূপ নিজে হুঁকা খাওয়া থেকে বিরত হয়েছিলেন। এই সংঘের সভা বিভিন্ন সদস্যদের গৃহে অনুষ্ঠিত হ'ত যেখানে কলিকাতার তদানীন্তন সংস্কারকরা, দ্বারকা-

নাথ গাঙ্গুলী. কৃষ্ণকুমার মিত্র কালীশঙ্কর শুকুল প্রমুখ নিয়মিত আসতেন এবং নৈতিক ও বাস্তব চরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস-এ বলেছেন যে এই সংঘ বরানগরবাসীর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। স্বল্পকালের জন্য তা হলেও দীর্ঘদিনের জন্য হয়নি কেননা ১৮৭৩ খ্রী শশিপদ সাধারণ ধর্ম সভা গঠন করেন এবং সেখানে ধর্মান্তকরণের চেয়ে সর্বধর্মসহনশীলতার নীতিই প্রাধান্য পায়। এই সময়েই শশিপদ বরানগরে আনা ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন ইংলণ্ডের পেনি ব্যাঙ্কের ধাঁচে। ভারতে সর্বপ্রথম এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সঞ্চয়-দর্শন প্রচার করা। মাঘ, ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ভারত শ্রমজীবী পত্রিকায় 'পয়সা ধনভাণ্ডার' শীর্ষক একটি ছোট নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'ল

> বিলাতে পেনি ব্যাঙ্ক নামে গরিব লোকের উপকারের জন্য একপ্রকার ব্যাঙ্ক আছে। যাহারা দিন আনে দিন খায় তাহারা যে পয়সা জমাইবে এবং টাকার মানুষ হইবে ইহা আমাদের দেশে কেহ কখনও ভাবে না। বিলাতের দয়ালু লোকেরা গরিবদের টাকা বেশী করিয়া দিবার জন্য নানা শহরে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন। মানুষ হাজার গরিব হউক ৩।৪ পয়সা অক্লেশে খরচবাদে বাঁচাইতে পারে। বিলাতের গরিবেরা এই পয়সা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখে এবং এইরূপে মাস ২ কিছু ২ পয়সা জমিতে জমিতে অবশেষে একটি টাকা হয় এবং এই টাকার সুদ হইতে থাকে। কতক দিন সুদ না নিলে অবশেষে সুদে আসলে অনেক টাকা হয়। এই ৩ ৪ পয়সা হাতে থাকিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন কাজে খরচ হইয়া যাইত। কিন্তু জমা করিয়া রাখিবার একটি স্থান থাকাতে, তাহাদের পয়সা খরচ না হইয়া ক্রমে সুদে আসলে পয়সা টাকা হয়, একটাকা একশ টাকা হয়, একশ টাকা হাজার টাকা হয়। অনেক গরিব এইরূপে অনেক টাকা সঞ্চয় করে অথচ কিছুই তাহাদের গায়ে লাগে না। ৩।৪ পয়সা জমাইতে জমাইতে যে হাজার টাকা হইতে পারে আমাদের দেশে অনেক লোকেই তাহা জানেন না। যদি জানিতেন তবে অনেক গরিব লোক সুখের মুখ দেখিতে পাইত।

এই আন্‌ ব্যাঙ্ক ছাড়াও শশিপদ তদানীন্তন সরকার বাহাদুরকে চব্বিশ পরগনা জেলায় একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলার জন্য চাপসৃষ্টি করেন এবং সম্ভবত ববানগরে একটি সেভিংস ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ খ্রী। ভারত শ্রমজীবী এবং বরাহনগর সমাচার পত্রিকাদুটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে শশিপদ মূলত কেশব সেনের 'সুলভ সমাচার'-এর দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিলেন।

এখন আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কিত সচেতনতা, আমাদের আলোচ্য সময়কালে, এ দেশের নিজস্ব ভাবধারায় গ'ড়ে ওঠেনি। এই শ্রমিক মঙ্গলবোধ মেরী কার্পেন্টারের সহায়তায় ইউরোপ থেকে আমদানি করা হয়েছিল। মেরী কার্পেন্টার ১৮৬৬ খ্রী বরানগরে এসে উপলব্ধি করেন যে এখানকার চার হাজার জুট মিল শ্রমিক তাঁদের নিয়মিত ভাল পরিমাণের মজুরি হাতে পেয়ে বিপথে চালিত হতে পারে যদি তাদের যথাযোগ্য সামাজিক প্রগতির পথ যথাসময়ে দেখানো না হয়। এবং সেই থেকেই শশিপদ ও মেরী কার্পেন্টারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সূচনা হয়। শশিপদ এত বেশী এই মহিলার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন যে পরবর্তীকালে তিনি সুখে দুঃখে এই বিদেশিনীর উপদেশ প্রার্থনা করতেন এবং নিয়মিত তাঁর কার্যাবলীর প্রতিবেদন পাঠাতেন। কলিকাতা ও শহরাঞ্চলে এবং বোম্বাই শহরেও মেরী কার্পেন্টারের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল সে-সময়ে। বস্তুত তাঁর উদ্যোগে গঠিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনই কেশব সেন গঠিত ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনকে অর্থ এবং উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছিল। শশিপদর কর্মকাণ্ডের কথা কলিকাতা শহরে ব্যাপ্ত হয়ে গেল কেশব সেন যখন বিলেত থেকে ফিরলেন এবং উভয়েই বিদেশিনী এই মহিলার প্রভাবে সংস্কারমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করলেন। শশিপদও ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন।

বরানগরে শশিপদর পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

বেশ কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় সরকারি এবং বেসরকারি ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ শশিপদর সমাজ সংস্কারক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় প্রশাসনে তাঁর সক্রিয় অংশ গ্রহণ (শশিপদ বরানগর পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রথম

নির্বাচিত কমিশনারদের অন্যতম ছিলেন) এবং ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে শশিপদ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন বাড ফিয়ার-এর এর মত কিছু গণ্যমান্য ইংরেজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফিয়ার সাহেব মনে করতেন যে ভারতের মুখ্য সমস্যা হ'ল সভ্যতার সমস্যা। শশিপদ এবং কেশব সেনের নৈশ বিদ্যালয়কে ফিয়ার সাহেব একদা দি ক্যালকাটা রিভিউ-তে তাঁর একটি নিবন্ধে প্রশংসা করেছিলেন কারণ তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকেই এদেশে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে কেশব সেন ও শশিপদ-র বিলেত যাত্রার অন্যতম কারণ ছিল ওদেশের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও এদেশে তা প্রযোজ্য কিনা বিচার করা। শশিপদ তাঁর বিলেত যাত্রার প্রাক্‌কালে মেরী কার্পেণ্টারকে লিখছেন 'We (তিনি এবং তাঁর পত্নী) go to see English life and benefit by seeing English institutions, so that we may be able to do some good to the working classes.' ইংরেজরাই যে এদেশকে সভ্য করতে পারে এই ধারণা সুস্পষ্ট হয় মেরী কার্পেণ্টার যখন কেশব সেনকে লেখেন 'I feel sure that you are fully conscious that I love India as a mother does her child.'

সম্ভবত এমনই একটি ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে বরানগরেও শশিপদকে ঘিরে বেশ কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁকে সমাজসংস্কারকমূলক কাজে পৃষ্ঠ-পোষণা করেছেন এবং শশিপদও তাঁদের ওপর, সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যের জন্য, বিভিন্ন সময়ে নির্ভরশীল হয়েছেন। ১৮৬৫খ্রী যখন তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন স্থানীয় এক আর্মেনিয়ান জুট ব্যবসায়ীর কাছে তিনি অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন এবং কিছু অর্থ চাঁদা বাবদ পান। লেফট্যানাণ্ট গবর্নর বিডনের কাছে শশিপদ সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লিখলে লাটসাহেব তাঁকে ষোলো টাকা চাঁদা পাঠান বিদ্যালয়ের জন্য। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়েই শশিপদর সঙ্গে ফিয়ার সাহেবেরও আলাপ হয় এবং ফিয়ার সাহেব ১৮৬৮ খ্রী এই বিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য করেন। ডঃ ডেভিড ওয়ালডি নামক এক সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতকারক শশিপদর অন্যতম সমর্থক ছিলেন। ওয়ালডি সাহেব বরানগরে সোশ্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট হয়ে-

ছিলেন। এই সোসাইটিতে চব্বিশ পরগনার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এ. এম. ব্রডলে, ফিয়ার সাহেব প্রমুখ বক্তৃতা দিতেন শশিপদর কার্যাবলীর প্রশংসা ক'রে। জেলা শাসক ও তাঁর ডেপুটিরা এই ধরনের স্বদেশী উদ্যোগমূলক কাজে সবসময়েই প্রেরণা দিতেন (সম্ভবত ওই 'সভ্যতা'-র অনুষঙ্গে)। শশিপদ-সম্পাদিত 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার প্রচার ছিল ১৫,০০০ কপি। সে-সময়ে। এই বিপুল প্রচারের জন্যও শশিপদ জেলা প্রশাসনের সক্রিয় সাহায্য পেতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ডেভিড ওয়ালডি শশিপদ-প্রতিষ্ঠিত বরানগর ইনস্টিট্যুট-এরও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন (এই বরানগর ইনস্টিট্যুট পরে শশিপদ ইনস্টিট্যুট নামে পরিচিত হয়। বরানগর মিউনিসিপ্যাল অফিসের পশ্চিমে এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের সম্মুখে যে রাস্তাটি আজ ইনস্টিট্যুট লেন নামে পরিচিত তা ওই শশিপদ ইনস্টিট্যুট-এর নামানুসারে। এই ইনস্টিট্যুট-এর অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল মূলত উল্লিখিত বরানগরপ্রেমী ইউরোপীয় ভদ্রমহোদয়গণের কাছে। মেরী কার্পেণ্টার স্বয়ং দিয়েছিলেন ৫০০ টাকা, তাঁর বন্ধুবর্গ ৫০০ টাকা, ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ২৫০ টাকা, ডেভিড ওয়ালডি ৫০ টাকা, এফ. এল. বিউফোর্ট (ইনি কি চব্বিশ পরগনার জেলা জজ ছিলেন?) ১০০ টাকা, ফিয়ার সাহেব ১৫০ টাকা এবং শশিপদ নিজে ৫০০ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

শুধুমাত্র অর্থসাহায্যই যে শশিপদ পেয়েছিলেন তা নয়। তাঁর ক্রিয়াকলাপকে নৈতিক ও আইনগত সমর্থন জানাতেও ইউরোপীয়রা এগিয়ে এসেছেন। শশিপদ যখন বিলেত গেলেন, স্থানীয় পুরনোপন্থী ব্যক্তিরা, কালাপানি পার হওয়ার অভিযোগে তাঁকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করার জন্য একটি সভা করেন। ওয়ালডি সাহেব সেই সভায় শশিপদর সমর্থনে বিক্ষোভ জানিয়েছেন। স্থানীয় এক মদ্যব্যবসায়ী আদালতে শশিপদর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলে ফিয়ার সাহেব শশিপদর পক্ষে আদালতের মাশুল দিয়ে দেন।

শশিপদর এই পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ আপাতদৃষ্টিতে কোনো সংগঠিত গোষ্ঠী ছিলেন না। কিন্তু সমকালীন সামাজিক কাজকর্মে এঁদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ সকলকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। মেরী কার্পেণ্টারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন ফিয়ার সাহেব।

এঁরা দুজনেই ৬ই জানুয়ারি ১৮৭৬ খ্রী বরানগর ইনস্টিট্যুট হল উদ্বোধনে এসেছিলেন। কেশব সেনের ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন প্রস্তাবিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল অ্যাণ্ড ওয়ার্কিংমেনস্ ইনস্টিট্যুশন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও ২৮শে নভেম্বর ১৮৭১ খ্রী ফিয়ার সাহেব সভাপতিত্ব করেন। শশিপদর ঘনিষ্ঠতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বোর্নিও জুট কোম্পানির মালিক মি. উইলিয়াম আলেকজাণ্ডার যাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বরানগর জুট মিল পরিচালিত হত। উইলিয়ামের পিতা ড আলেকজাণ্ডার আবার মেরী কার্পেন্টারের বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

ইংরেজদের সমর্থন ও আনুকূল্যের ওপর নির্ভরশীলতা শশিপদ সমকালীন বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কারকদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, কারণ, সংস্কারকদের স্বদেশী সমাজ সংস্কারের কাজে কখনই সুপ্রচুর সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেনি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন এবং আলোচ্য শশিপদ তাই, ইংরেজ-নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না। ৯ই নভেম্বর, ১৮৭০ খ্রী কেশব সেন মেরী কার্পেন্টারকে লিখছেন 'You know our people do not appreciate these things and, we can not therefore expect pecuniary aid from them which may alleviate the necessity of inviting foreign help. We must depend on England. আমরা আগেই জেনেছি বরানগর ইনস্টিট্যুট-এর অর্থ এসেছিল শশিপদর ইংরেজ বন্ধুদের কাছ থেকে। জানা যায়, এই উদ্যোগে তিনি স্থানীয় ও কলিকাতার বন্ধুবর্গের কাছে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর আগে শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় গঠনের ব্যাপারে বরানগর সোশ্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটিতে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টাতেও তিনি অসমর্থ হ'ন। স্বদেশের মানুষের কাছে সাহায্য না পেয়ে বিদেশীদের কাছে যাওয়ার এই ঘটনার আলোকে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মত শশিপদকেও বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।

জুটমিল মালিকদের সাহায্য ও শশিপদ

শশিপদর শ্রমিক-সংস্কার আন্দোলনে স্বভাবতই যাঁরা তাঁকে সবচেয়ে বেশী সমর্থন করেছেন, অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরা হলেন বোর্নিও জুট কোম্পানির মালিকবৃন্দ। কিন্তু মালিকরা যেখানে শ্রমিক মঙ্গলে সাহায্য

করে, সেখানে সেই মঙ্গলকর্মে কিছু অবশ্যম্ভাবী সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। ১৮৬৬ খ্রী মেরী কার্পেণ্টার শশিপদকে বুঝিয়েছিলেন যে জুটমিল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার বিশাল সুযোগ আছে কিন্তু তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই সংস্কার কর্মে শশিপদ যেন ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় না করেন। তাছাড়া, শশিপদও বুঝতেন যে তাঁর একক উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। তাই জুট মিলের মালিকরা ছাড়া কেইবা তাঁকে সাহায্য করবে। তাঁদেরই একমাত্র এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। এই সময়ে বরানগর জুট মিলের কলেবর ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৬৪ খ্রী কোম্পানির কাজ দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৮৬৬ খ্রী চারহাজার শ্রমিক সংখ্যা হয়। ১৮৭৩ খ্রী এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ছ'হাজারের বেশী হয়। কলেবর এবং শ্রমিক-সংখ্যা বৃদ্ধির কুফলগুলিও পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফ্যাক্টরি-র কাছাকাছি দুটি নতুন মদের দোকান খোলা হয়েছিল। শশিপদ উদ্বিগ্ন হয়ে মেরী কার্পেণ্টারকে লিখলেন যে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অসহায় শশিপদ কী করবেন, যদি চারহাজার শ্রমিক মদ্যপানে আসক্ত হয়? তিনি জানালেন 'But what can I do but only feel for them ; nothing of a practical kind can be expected from me......if 4,000 people of......Barahanagar (Jute Factory) becomes vicious. I don't see any hope of the place. I have commenced to assemble these (men) now and then and to speak to them on their duties as men .....This I do in the night school.' শশিপদ মনে করলেন যে এই ধরনের নৈশবিদ্যালয় আরো বেশী সংখ্যায় প্রয়োজন। ১৮৬৭ খ্রী তাই জুট মিল কর্তৃপক্ষ যখন নিজেরাই একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিলেন, শশিপদ আশ্বস্ত হলেন। শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষার ভাবধারার অনুষঙ্গেই জুটমিল কর্তৃপক্ষ এই আগ্রহ প্রকাশ করেন নি, বরানগরের সামাজিক প্রতিবেশের বাস্তব উন্নয়নের দিকেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল। মালিক উইলিয়াম আলেকজাণ্ডার মেরী কার্পেণ্টারের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ড. ডেভিড ওয়ালডির (প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে বর্তমান ব্যারিস্টার পি. মিত্র রোড একদা এই সাহেবের নামানুসারে ওয়ালডি স্ট্রিট নামে পরিচিত ছিল) মত একজন আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপীয় সাহেব বরানগর জুট ফ্যাক্টরির প্রথম ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু এটাও

অসম্ভব নয় যে, যে-সমস্যা সামাজিক পটভূমিতে শশিপদকে উদ্বিগ্ন করেছিল, সেই সমস্যাই মিল ব্যবস্থাপনায় মালিকগোষ্ঠীকে বিব্রত করেছিল। তাই শশিপদর কাছে যা ছিল জনগণের নৈতিকতার প্রশ্ন, মিল মালিকদের কাছে তা শ্রমিক-নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল, এবং এই আঙ্গিকেই উভয়ের স্বার্থ মুখোমুখি মিলিত হয়েছিল। ১৪ই মে ১৮৬৮ খ্রী শশিপদ মেরী কার্পেণ্টারকে লিখলেন যে বোর্নিও জুট কোম্পানির উইলিয়াম আলেকজাণ্ডার ফ্যাক্টরির ভেতরে শ্রমজীবীদের জন্য একটি বিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন এবং 'The evening school which I have opened for them and which you were pleased to see when you were in this country, will be made over to the factory school.' এই নতুন মিলিত বিদ্যালয়ের ব্যাবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে শশিপদর ওপর। ১৪ই জুন, '৮৬৯ খ্রী বরানগর জুট ফ্যাক্টরির ম্যানেজার মি. মেয়ার এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন তিনশ' শ্রমিকের সমাবেশে। শশিপদ এই সভায় শ্রমিকদের সামনে বাংলায় বক্তৃতা দেন। কিন্তু তেরোদিন পরে, এক বিধ্বংসী আগুনে এই বিদ্যালয় গৃহটি নষ্ট হয়ে যায়। নতুন করে গ'ড়ে তোলা বিদ্যালয়ে পুনরায় ক্লাস সুরু হয় ৫ই জুলাই ১৮৭০ খ্রী। বরানগর সোশ্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটিও এই বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এইভাবে শশিপদ ও মিল মালিকদের মধ্যে এমনই এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে ৮ই আগস্ট ১৮৭০ খ্রী হিন্দু প্যাট্রিয়ট-এ শশিপদ সম্পর্কে লেখা হয় 'a very humble, native gentleman himselt struggling for bread', (subsisting on the benevolence of) 'God and the generous assistance of the Borneo Company ......'

শশিপদ ও ভারত শ্রমজীবী

১৮৭২ খ্রী বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে শশিপদ শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের সেবায় বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি 'ভারত শ্রমজীবী' নামে এক পয়সা মূল্যের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। জনগণের ব্যক্তিসত্তা ও চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার সহজ পথ হিসেবে শশিপদ শ্রমজীবীদের জন্য সুলভ একটি পত্রিকা প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তারতে

এটিই প্রথম সচিত্র শ্রমজীবী পত্রিকা। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে ১৮৭৪ শ্রী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরযুক্ত একটি ইংরেজী ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারে বলা হয় যে পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য শিক্ষা-বিস্তার এবং শ্রমজীবীদের কিভাবে উন্নত করা যায় সে-সম্পর্কে উপদেশ ও উপায় নির্ধারণ করা। শ্রমজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক এবং মালিকের প্রতি এবং সমাজের প্রতি তাদের কি মনোভাব হওয়া উচিত সে-সম্পর্কেও নির্দেশ থাকবে। এই পত্রিকা প্রকাশের আগে 'বরাহনগর সমাচার' নামে একটি পত্রিকাও শশিপদর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার কোনো সংখ্যাই এখন পাওয়া যায় না। এ পত্রিকাতেও শ্রমজীবী সাধারণের অভাব অভিযোগের কথা প্রকাশিত হ'ত।

ভারত শ্রমজীবী পত্রিকার প্রকাশনাকাল মে, ১৮৭৪। আগেই জেনেছি যে এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল সে সময়ে ১৫০০০ কপি এবং প্রতিটি দরিদ্র শ্রমিকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এর দাম হয় মাত্র এক পয়সা। 'পরিশ্রমেই সম্মান, পরিশ্রমে মনুষ্যত্ব, মানুষ যত পরিশ্রম করিবে তত তাদের গৌরব বাড়িবে'—এইভাবে শশিপদ শ্রমজীবীদের শিক্ষা দিতেন। এই পত্রিকায় লেখা হোত

শ্রমনামে কল্পতরু অতি চমৎকার,
যাহা চাবে তাহা পাবে নিকটে তাহার।

বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্র পাইওনীয়ার ও তৎকালীন বহু দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ভারত শ্রমজীবী-র সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। Indian Daily News-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হ'ল

> It is a purely educational paper and its object is to supply a means of supplying the moral and intellectual condition of the working classes by short and simple articles on descriptions of natural phenomena on objects of general interests, accounts of native arts and manufacturers and the application of science to the improvement of such arts and other useful purposes

exemplified in more advanced countries, biographical sketches of individuals whose characters and careers may be likely to exercise beneficial influences on the readers, and advise any suggestion on subjects bearing on their own class, or of their employers, or of the community in general such as may tend to make or keep them worthy and respectable members of society.

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্য করে প্রথম কবিতা লেখেন

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই
উপস্থিত যুগান্তর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই
... ..
আয় তবে শ্রমজীবীগণ
সোৎসাহে চলে আয়,
সময় বহিয়ে যায়,
ঘোরতর বাজিয়াছে রণ
যা করিবে সার্থক জীবন।

বেশ কয়েকবছর ধ'রে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমরা এবং সমস্ত শ্রমিকপ্রেমী মানুষ অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ কেননা তিনি একক প্রচেষ্টায়, ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বহু শ্রমসাধনায় একবছরের পুরো সংখ্যাগুলি উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশ থেকে, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ ও গ্রন্থাগারের সৌজন্যে তিনি এই সমস্ত সংখ্যাগুলির পুনর্মুদ্রনও করেছেন তাঁর 'ভারত শ্রমজীবী' গ্রন্থে। বর্তমান অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে ভারত শ্রমজীবী-র উদ্ধৃতি প্রকীর্ণ হয়ে আছে প্রাসঙ্গিক উল্লেখে। এইসব

উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, শশিপদ এই পত্রিকাটিকে শ্রমজীবীদেব স্বার্থে কীভাবে ব্যবহার করেছেন। সমকালীন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে পত্রপত্রিকাব মাধ্যমে শ্রমিক ও দবিদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্যোগ পরিব্যাপ্ত হযেছিল এই বাংলাদেশে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমাব মিত্র, রাজকুমাব বিদ্যাবত্ন প্রমুখ যাঁরা শশিপদব বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, তাঁবাও পববর্তীকালে আসামেব চা শ্রমিকদের সম্বন্ধে সঞ্জীবনী ও বেঙ্গলি পত্রিকার মাধ্যমে আন্দোলন গ'ডে তোলেন। পরবর্তীকালে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায প্রমুখ যে সুসংহত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত কবেন, এঁরা ছিলেন তাঁদেব পূর্বসূরি।

যদিও শশিপদ তাঁব সময়কালে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যথার্থ চেতনা জাগাতে পাবেননি, তবু, তিনি যে বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ থাকে না। ভাবত শ্রমজীবী এদেশেব শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে অন্যতম প্রথম মুখপত্র। ভারত শ্রমজীবীর প্রকাশের প্রাক্‌কালে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয তাতে সম্পাদক মহাশয় এই পত্রিকাকে ধর্ম ও বাজনীতি থেকে মুক্ত রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু বস্তুত, ভারত শ্রমজীবীতে ধর্ম-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ধর্মচেতনা জাগিয়ে শশিপদ তাঁদের মদ্যপান থেকে বিরত কবতে চেয়ে অজান্তেই তাদেব শ্রেণী-সচেতনতা গ'ডে তোলার পথে বাধাসৃষ্টি করেছিলেন। শশিপদই প্রথম শ্রমজীবী আন্দোলনের সঠিক প্রবক্তা কিনা সে বিষয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। এখন শুধু জেনে রাখি যে, নানা তাত্ত্বিক ত্রুটি সত্ত্বেও 'ভারত শ্রমজীবী' মানুষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

শশিপদ ও প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন

এটা বিস্ময়ের কথা, যে-শশিপদ তাঁর প্রায় সমগ্র জীবন বরানগরের শ্রমজীবী মানুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন, তিনি কখনই সচেতনভাবে শ্রমিকদের একটি শোষিত শ্রেণী হিসেবে দেখেননি। যদিও বিভিন্ন ঐতিহাসিক গবেষকবৃন্দ তাঁকে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাঁর

সমসময়ে বিদ্রোহী প্যারিসের কথা মনে রেখে শ্রমিক আন্দোলনের ভিন্নতর প্রকৃতির কথা বলতে চেয়েছেন (শশিপদর সমকালেই সুখ্যাত প্যারী কমিউন গঠিত হয় এবং ভারত শ্রমজীবীতে শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতাও সম্ভবত প্যারী কমিউনকে মনে করে), শশিপদ নিজে এই সচেতনতা থেকে বহু দূরে ছিলেন। তাঁর পুত্র, আলবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জী নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে শ্রমজীবী সংঘ 'exercised a healthy influence on the workers with a view of ending the use of the strike weapon .. Sasipada advised the workers to look to the interests of their employers and at the same time to present their grievances in a legitimate manner'. শশিপদ নিজে বিলেতে বক্তৃতাকালে বলেছেন

> ...a loud cry is raised against me that I am disturbing society—setting class against class. Let them cry, I shall go on.... I have been trying to teach them (the working class) that labour is honourable, not to bring disorder and confusion among them, but to bring class and class in sympathy with each other.

কিন্তু যে-শ্রমিকশ্রেণীর জন্য শশিপদ কাজ করতেন, সেই শ্রমিকশ্রেণীর সমাকলীন প্রতিক্রিয়া কী ছিল জানা প্রয়োজন। যেটুকু সামান্য তথ্য এ সম্পর্কে পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যাচ্ছে যে জুটমিলের সীমিত সংখ্যক শ্রমিক সে-সময়ে মালিকপক্ষের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে যেত। ১৮৯০ খ্রী বরানগর জুট ফ্যাক্টরির একজন শ্রমিক নদেরচাঁদ ফ্যাক্টরি কমিশনের সামনে বলেছে যে সে এমন কিছু মামলার কথা জানে যেখানে শ্রমিকরা বিচারালয়ে গেছে তাদের মজুরি-সংক্রান্ত বিক্ষোভ নিয়ে এবং মামলা জিতেছে। এ-বিষয়ে শশিপদর কি ভূমিকা ছিল সে-সম্পর্কে শশিপদর জীবনীকাররা নীরব থাকায়, আমরাও অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়ে গেলাম। বস্তুত, শশিপদ সবসময়েই শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দিয়েছেন। এর জন্য,

জুট মিল মালিকেরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন (by declaring that those of their hands who attended Sasi Babu's school were the very people who were found to be most careful and painstaking in their work)। এছাড়া, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই বিক্ষোভকারীদেব মুখ্য অস্ত্র তখন শশিপদর উদ্যোগকে প্রশংসা করেন স্যার কে. জি. গুপ্ত, আই. সি. এস. এবং সেক্রেটারি অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের ভারতীয় সদস্য। শাসকশ্রেণীর প্রতি শশিপদ এত অনুগত ছিলেন যে লর্ড কার্জন যখন ১৯০৫ খ্রী শাসনভার ছেড়ে বিলেত ফিরে যাচ্ছেন, শশিপদর ববানগব ইনষ্টিট্যুট তাঁকে বিশেষভাবে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। এব থেকে অনুমান কবা যায়, যে শাসক ও মালিকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেই শশিপদ শ্রমিকদের শিখিয়েছিলেন।

শ্রমিকশ্রেণীর শোষণেব আঙ্গিককে গুরুত্ব না দিয়ে শশিপদ সচেতনভাবেই শ্রমিকদের নিয়মানুবর্তিতাব ওপব জোর দিয়েছিলেন এবং তাঁর সম্পাদিত 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকায এ বিষয়ে প্রচার করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, শ্রমজীবী-র প্রতিটি সংখ্যার শীর্ষে লেখা থাকত, 'শ্রমেই মনুষ্যত্ব'। এছাড়া, বিভিন্ন নিবন্ধে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন বোঝাতে যে দুঃখ-দুর্দশার প্রয়োজন আছে জীবনে, এই দুঃখের আগুনেই মনুষ্য-চরিত্র গ'ড়ে ওঠে। অথচ লক্ষ্যণীয় যে শশিপদ যখন ইংলণ্ডের শিল্প-শহরগুলি পরিভ্রমণ করছেন তখন ওদেশে শ্রমিক অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৮৩৪ খ্রী গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনসোলি-ডেটেড ট্রেডস্ ইউনিয়ন আহুত ধর্মঘট ব্যর্থ হওয়ার পর ইংলণ্ডে এত ব্যাপক আকারে ধর্মঘট আর হয়নি (১৮৭১-৭৪ খ্রী)। রেভাবেণ্ড হেনরি সোল্লি (Rev. Henry Solly) ১৮৬২ খ্রী যে ওয়ার্কিং মেনস্ ক্লাব অ্যাণ্ড ইনস্টিট্যুট ইউনিয়ন গঠন করেন তা ছিল শ্রমিক-আন্দোলনে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। মিস্ মেরী কার্পেণ্টার এই গোষ্ঠীতেই ছিলেন বলে তাঁরই প্রভাবে শশিপদ সক্রিয় শ্রমিক-আন্দোলনের প্রকৃত চেহারাটি বিলেতে বুঝতে পারেননি এবং ভারতের মাটিতেও ওই নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য বহন করে এনেছিলেন। তরুণ ঐতিহাসিক-গবেষক অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী একটি মৌলিক নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করে লিখেছেন যে এমনও হতে পারে, উপরোক্ত কারণগুলি

ছাড়াও, শশিপদ গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছিলেন পুঁজিবাদিদের পৃষ্ঠপোষণার প্রয়োজনীয়তা। 'Education of the Masses in India' শীর্ষক একটি নিবন্ধে শশিপদ নিজেই একদা বলেছিলেন

> It is a subject, worthy (of) the attention of the capitalists, for by educating their workmen they would not only raise a low and degraded people, but also improve their own resources; for the more educated and skilled the assistants, the better would be the work obtained from them

১৮৭০ খ্রী থেকে শুরু ক'রে ভারতীয় শ্রমিকদের বাস্তব ও নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা স্বল্পসংখ্যক আদর্শবাদী নেতা করেছিলেন শশিপদ অবশ্যই তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শশিপদর সমকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশে এ-বিষয়ে যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের কথাও এই আলোচনার অনুষঙ্গে জানা উচিত। বোম্বাইতে এস. এস. বেঙ্গলি শ্রমিকদের কাজের সময় বেঁধে দেওয়ার জন্য একটি বিলের খসড়া করেছিলেন ১৮৭৮ খ্রী। মিল শ্রমিকদের কাজের সময় কমানো ও সপ্তাহে একটি দিন অন্তত ছুটি দেওয়ার দাবীতে এন. এম. লোখাণ্ডে বহু বড় বড় জনসভার আয়োজন করেন ১৮৮৪ খ্রী এবং ১৮৯০ খ্রী। শ্রমিক-স্বার্থ সমর্থনে তিনি ইঙ্গ-মারাঠা সাপ্তাহিক 'দীনবন্ধু' সম্পাদনা করতে শুরু করেন ১৮৮০ খ্রী এবং বোম্বাই মিল হ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন ১৮৯০ খ্রী। অবশ্য এই অ্যাসোসিয়েশন-এর নামের সঙ্গে কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না, কোন ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ ছিল না। মারাঠা ঐক্যেচ্ছু সভা বোম্বাই-তে মিল শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা এবং টেম্পারেন্স আন্দোলন গ'ড়ে তোলে। কলিকাতার কাছাকাছি কাঁকিনাড়া এলাকাতে ১৮৯৫ খ্রী কাজী জাহিরুদ্দিন আহমেদ এবং মহম্মদ জুলফিকার হায়দার নামক দুই মুসলমান শ্রমিক দরদী নেতা এই ধরনের একটি মুসলমান সংস্থা গঠন করে জুট মিল শ্রমিকদের নিয়ে। সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের যে ধারা প্রবাহিত ছিল,

তা থেকে এইসব ব্যক্তিকেন্দ্রিক শ্রমিকমঙ্গল উদ্যোগগুলি আদর্শগতভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমানকালে অর্থনৈতিক ইতিহাসে এদেশের অন্যতম প্রবক্তা ড: বিপন চন্দ্র তাঁর 'দি রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালইজম্ ইন ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে তথ্য সমৃদ্ধ একটি অধ্যায়ে ১৯০৫ খ্রী পর্যন্ত শ্রমিক-বিষয়ে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুষঙ্গে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ১৯০৫ খ্রী পর্যন্ত এদেশে শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ে একটি নিশ্চিত অনীহা ছিল, ফ্যাক্টরি আইনের বিরোধিতা ছিল (ড: চন্দ্রের মতে ভারতের নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত হানতে পারে এই ভীতির জন্যেই এই বিরোধিতা) এবং ব্রিটিশ মালিকানায় ফ্যাক্টরি, কয়লাখনি এবং চা-বাগানগুলিতে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য এক বিশেষ মানবিক সহানুভূতি ছিল। ভারতে সুতীবস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে তৎকালীন 'র‍্যাডিকাল' সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় কী নিষ্ঠুর মন্তব্য করা হয়েছিল, দেখা যাক্ "A longer death rate amongst our operatives is far more preferable to the collapse of this rising Industry ...We can after the manufacturers are fully established, seek to protect the operatives." (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫)

এই বঙ্গদেশে, যেখানে শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজির আধিপত্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে বরং ১৯০৫খ্রী-র পরে, স্বদেশী যুগে, শ্রমিক-অসন্তোষে জাতীয়তাবাদী সমর্থনের গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। শ্রমিকদের জন্য সহানুভূতি আর সংবাদ পত্রের পাতায় বা অর্থ-সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। শ্রমিকদের আইনগত সাহায্য দেওয়া হয়েছে, ধর্মঘটের সমর্থনে সভা হয়েছে এবং মোটামুটি স্থিতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গ'ড়ে তোলা হয়েছে। এ সময়ে যে-চারজন বাঙালী এই সক্রিয় আন্দোলনে শরিক হয়েছেন তাঁরা—অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বসু এবং অপূর্ব কুমার ঘোষ। এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের নিবন্ধের এলাকাধীন নয়। আমাদের মনে হয়েছে যে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভারতে প্রথম এবং বঙ্গদেশে ত বটেই, শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপক আন্দোলন করেছেন। নদীয়া জেলার ব্রাহ্মণ পরিবারের এই সুসন্তান ১৮৬৬ খ্রী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রী তিনি

বিলেত যান আইন পড়তে, ফিরে আসেন ১৮৯১ খ্রী এবং নিজেকে একজন শক্তিশালী ব্যারিস্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ-সময় থেকেই তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের সুকঠিন ভাষায় সমালোচনা করেন। বয়কট আন্দোলনের সময় থেকেই অশ্বিনীকুমার পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। বিচারালয়ে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে সুদৃঢ় কণ্ঠে সওয়াল করেন এবং তদানীন্তন ইনস্পেকটর জেনারেল অব পুলিশ সি. স্টিভেনসন ম্যুর এর ভাষায় তিনি 'threw himself heart and soul into the strike movement.' বার্ন কোম্পানির শ্রমিক, ছাপাখানার শ্রমিক, ট্রামকোম্পানি এবং জুটমিল শ্রমিকদের যে ব্যাপক ধর্মঘট হয়েছিল ১৯০৫ খ্রী অশ্বিনীকুমার তাতে সক্রিয় অংশ নিলেন। পুলিশ রিপোর্টে বলা হ'ল 'He and Bepin Chandra Pal...are undoubtedly the most dangerous among the agitators.' ইতিহাসের ট্রাজেডি যে তিনি দীর্ঘদিন ধ'রে এই সক্রিয় ভূমিকায় থাকতে পারেননি। ১৯০৬ খ্রী যখন তিনি কর্পোরেশন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। সুরাট কংগ্রেসে দলের মধ্যে বিভেদ সুস্পষ্ট হলে অশ্বিনীকুমার নিরপেক্ষ থাকতে চেয়ে বললেন, তিনি নরম অথবা চরম কোন সংস্থাতেই বিশ্বাস করেন না।

আমাদের আলোচ্য শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু শুধুমাত্র শ্রমিকদের নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়েই ক্ষান্ত হননি। ড. বিপন চন্দ্রের মত মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে যে তাঁর সমসময়ে শশিপদ যথেষ্ট শ্রমিকদরদী ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে প্রকৃতার্থে দেশপ্রেম জাগরূক ছিল। ইংরেজদের প্রতি মোহ তখন সকল শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই গোপন ছিল। এই মোহায়নের কারণও ছিল যথেষ্ট। ভারত শ্রমজীবী-র একটি সংখ্যায় শশিপদ শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে ইংলণ্ডে শিল্পক্ষেত্রে বিস্ময়কর সার্থকতা সম্ভব হয়েছে কারণ সেখানে শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রমী, সঞ্চয়ী, স্বাধীনচেতা, সত্যবাদী এবং অধ্যবসায়ী। ১২৮৬ বঙ্গাব্দ পৌষ সংখ্যার ভারত শ্রমজীবীতে তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন

তোমরা শরীরের রক্ত জল করিয়া যাহা উপার্জন কর, বড়লোকে তাহা দ্বারা বিনা পরিশ্রমে কত আমোদ ও আহ্লাদে দিন কাটায় কেন?

তোমরা লেখাপড়া জান না সেই জন্যই তোমাদের সকল দুঃখ। তোমাদের দুঃখে আমরা দুঃখী হইয়াছি তোমাদের চক্ষের জল আর আমরা দেখিতে পারি না।...যাহাতে তোমাদের কষ্ট দূর হয় আমরা তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব।

এ-দেশে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উনিশ শতকীয় বৈশিষ্টতা হ'ল, যে-মনোবল ও উদ্যোগ নিয়ে কোন ব্যক্তি এই ধরনের মহান্ কাজ আত্মনিয়োগ করতেন, সেই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত স্থিতিশীল হ'ত না। সহসা বিলীন হয়ে যেত গড্ডলিকায়, উদ্যোগী সমাজ-সংস্কারকও পিছু হেঁটে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতেন। শশিপদর ক্ষেত্রেও এই ঐতিহাসিক সত্যেব ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮৭০ খ্রীর দশকে তাঁর যে কর্মযজ্ঞ, পরবর্তী দশকে তা ক্রমশই দৈনন্দিন কর্মধারায় পরিণত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেন গোষ্ঠীর পতন হ'ল ১৮৭৫ খ্রী। মেরী কার্পেণ্টার দেহ রাখলেন ১৮৭৭ খ্রী, ১৫ই জুন। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা প্রায় দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন শশিপদকে সাহায্য করতে, তাঁরাও হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। শশিপদ বিলেত থেকে ফেরার পরেই, জুট মিল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। এবং উদ্যোগী ম্যানেজার মি. উইলিয়ামস্ মেয়ার বরানগর জুট ফ্যাক্টরি ছেড়ে যাওয়াব পর, ওই ফ্যাক্টরির কাছ থেকে আর কোন সাহায্যই বরানগরের উদ্যোগী মানুষ পাননি (এর প্রমাণ মেলে যখন দেখি কোন একটি সুবিধাব বিনিময়ে জুট মিল কর্তৃপক্ষ বরানগর পুরসভাকে এক হাজার টাকা দান করে এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত Reis and Rayyet পত্রিকায় মন্তব্যে লেখা হয় 'It is something to have got even a thousand rupees from the Baranagar Jute Factory, which, since the departure of their able, public-spirited manager Mr. Williams Mair has become quite a close-fisted Scotch concern'. আমরা জেনেছি যে এই জুট ফ্যাক্টরির ভেতরেই বরানগর সোশ্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটি একসময় স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং শশিপদ-মালিকগোষ্ঠী সম্পর্কের আলোকোজ্জ্বল দিনগুলিতে ফ্যাক্টরি অভ্যন্তরে শশিপদগোষ্ঠীর যাতায়াত ছিল

অবাধ। অথচ ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ খ্রী বরানগর সোশ্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটির তদানীন্তন সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জুট মিল কোম্পানি লিখলেন যে ফ্যাক্টরি অভ্যন্তরে কোন সভাসমিতি করতে হলে কোম্পানির আগাম অনুমতি প্রয়োজন। ২৫শে নভেম্বর, ১৮৭৯ খ্রী কোম্পানি সোসাইটির লাইব্রেরি স্থানান্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করছে। শশিপদর নৈশ বিদ্যালয়ও ক্রমে তার প্রাক্তন বৈভব হারাল। বরানগর নৈশ বিদ্যালয়ের পঞ্চদশ পুরস্কার বিতরণী সভার একটি রিপোর্টে দেখা যায়—ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা মাত্র বাইশ। বরানগরে শশিপদর গ'ড়ে তোলা শেষতম সংগঠনটি ছিল হিন্দু বিধবা আশ্রয়শালা। ১৮৮৭ খ্রী এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি গ'ড়ে তোলেন কিন্তু ১৯০১ খ্রী এটিও বন্ধ হয়ে যায়। শশিপদ কলিকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে আসেন এ-সময়ে এবং 'দেবালয়' নামক একটি ধর্মীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে তিনি শিশুদের জন্য একটি 'বাল্য সমাজ'ও গঠন করেন। যে-সব শিশুরা তাদের পিতামাতার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে আসত এবং পিতামাতার আরাধনায় বিঘ্ন ঘটাত, তাদের কথা মনে রেখেই ওই সমাজ তিনি গঠন করেন।

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অনুদানপুষ্ট হয়ে বরানগর ইনস্টিট্যুট দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। বস্তুত, এখনও এই সংস্থাটি কোনরকমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই সব ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে শশিপদ যে ধরনের কার্যোদ্যোগ নিয়েছিলেন বরানগরে, স্থানীয় মানুষদের সক্রিয় সহযোগিতার অভাবে সেইসব উদ্যোগ শশিপদর জীবদ্দশাতেই অর্ধসমাপ্ত হয়ে মধ্যপথে থম্‌কে দাঁড়ায়। ১৮৯৪ খ্রী শশিপদ নবোদ্যমে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের সম্প্রসারণে ব্রতী হয়েছিলেন বরানগরে কিন্তু তাঁর সহমর্মী বন্ধু সীতানাথ তত্ত্বভূষণের ভাষায় 'no one in his native province seems to have caught fire from Babu Sasipada's noble example.'। আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই যখন দেখি শশিপদ ১৯১১ খ্রী বরানগরে এসে দেখেন যে তাঁর স্বহস্তনির্মিত বরানগর ইনস্টিট্যুট-এর মহামূল্যবান সংগ্রহশালার বহু দুর্মূল্য বস্তুই হারিয়ে গেছে। ইনস্টিট্যুট-এর সমকালীন সেক্রেটারি অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি দুঃখিত-চিত্তে লিখেন, বরানগরের মানুষ ওই সংগ্রহশালার মূল্য বুঝতে পারল না।

সংস্কার আন্দোলনের এই কর্মিষ্ঠ পথিক তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে

পাবেননি, হঠাৎ বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর সহযোগী সমর্থকগণ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে এবং নেহাতই রোমান্টিক উদ্যোগে একক প্রচেষ্টায় এহেন হিমালয়-প্রতিম কর্মযজ্ঞে সার্থক হওয়া যায় না। কিন্তু, আমরা গর্বিত যে উনিশ শতকীয় ভদ্রলোক সমাজে অন্তত এই মানুষটি বরানগর নামক ছোট্ট এক জনপদকে কেন্দ্র ক'রে এক মহতী, মানবিক কর্মধারায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। প্রকৃত শ্রমিক-আন্দোলনের (যা পরবর্তীকালে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হয়েছিল) দর্শনে তিনি উদ্বুদ্ধ হননি ঠিক, কিন্তু, তাঁর সমসময়ে, শশিপদ বৃহত্তর কলিকাতার উচ্চবিত্ত বৃত্তের সহায়তা ও সমর্থন যে-ভাবে আদায় করেছিলেন শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষের সেবার্থে, তা ইতিহাসে স্মরণীয়। শ্রমিক মঙ্গলে শশিপদ ছিলেন আবেগ ও বিবেকতাড়িত, এবং তাঁর পঁচিশ বছর পরে অশ্বিনীকুমার ছিলেন যুক্তিতাড়িত।

বৃত্তি বাণিজ্য বরানগর ও সমাজ

সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে শ্রম-বিভাগের যে ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয়, পরবর্তীকালে জাতি ব্যবস্থায় সেইটাই ব্যাপক আকাব লাভ করেছে এবং মুখ্যত হিন্দুসমাজের আর্থিক সংগঠন জাতি ব্যবস্থাভিত্তিক হয়েছে। কোনো সমাজের আর্থিক সংগঠনের ওপবই সেই সমাজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন গডনটিও নির্ভর করে। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির নির্দিষ্ট বৃত্তি থাকে এবং সে-কাবণে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও অধিকার স্বভাবতই আরোপিত হয। জাতির সঙ্গে বৃত্তির বে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মনু-রচিত ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে তা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত। আধুনিক কালে লোকগণনাব বিস্তারিত প্রতিবেদনগুলি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, জাতিব সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রত্যেক জাতি নির্দিষ্ট বৃত্তি দ্বারা ব্যবস্থিত। নিজের নির্দিষ্ট বৃত্তিতে প্রত্যেক জাতির নির্ব্যূঢ় ও নিরঙ্কুশ অধিকাব। কৃষির মত বৃত্তিতে একাধিক জাতি লিপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু কাপডবোনা বা মাটির বাসন গড়া বা শোলাব কারুকীর্তি করার মত বৃত্তিতে অন্য কোনো জাতির অধিকার থাকে না। বিভিন্ন জাতি পুরুষানুক্রমে স্ববৃত্তিতে নিযুক্ত থাকবে। হিন্দুসমাজের সংগঠকগণ সম্ভবত ভেবেছিলেন যে পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার ফলে জাতিগুলি স্বাভাবিক পারদর্শিতা অর্জন করবে এবং পুরুষপরম্পরা শিক্ষার ব্যবস্থাও অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই ধরনের আর্থিক সংগঠনের দুটি প্রধান তাৎপর্য হ'ল, নির্দিষ্ট বৃত্তিতে জাতি বিশেষের নিরঙ্কুশ অধিকার থাকায় প্রতিযোগিতাব কোন সুযোগ ছিল না আর উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সহজ ও সাবলীলভাবে নির্বাহ করা যেত। কিন্তু, এইরকম আর্থিক ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্থানু আর্থিক অবস্থার মধ্যেই প্রচলিত থাকা সম্ভব। ইংরেজবা যখন প্রথম এদেশের শাসক হবার স্বাদ পেল, তখন এখানকার প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্থানু ক'রে রাখতেই চেয়েছিল শোষণের সুবিধার্থে। পলাশীর যুদ্ধের কয়েকমাস আগে, ৭ই এপ্রিল, ১৭৫৭খ্রী কলিকাতার ইংরেজ জমিদার **'all weavers, carpenters, bricklayers, smiths, tailors, braziers etc. handicraft, shall be**

incorporated into their respective bodies, one into each district of the town'—এই মর্মে এক দীর্ঘ ফতোয়া জারি করে। ফতোয়ার বক্তব্য হ'ল এই যে ছুতোর, কামার, কুমোর, মিস্ত্রি, দর্জি, তাঁতী প্রভৃতি কারুকার্য কলিকাতার বিভিন্ন নির্দিষ্ট পাড়ায় স্বতন্ত্র বৃত্তিগত গোষ্ঠী হিসেবে বাস করবে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন ক'রে 'চৌধুরী' বা headman এবং প্রত্যেক পাড়ায় একজন ক'রে 'মণ্ডল' থাকবে। অর্থাৎ যা ছিল পুরাতন গ্রামীণ ব্যবস্থা, তা কলিকাতা শহরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। সমগ্র আঠারো শতক ধ'রে এই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল কলিকাতা ও মফঃস্বলে এবং ক্রমে যখন ইংরেজদের প্রসাদপুষ্ট একটি 'ভ্যাসাল' শ্রেণী শহর ও শহরাঞ্চলকে ঘিরে গ'ড়ে উঠল, তখন থেকে এদের অবলুপ্তি। তাছাড়া, পরবর্তীকালে, এদেশে শিল্পায়ণ হয়ে এবং কৃষির বাণিজ্যকরণ হয়ে, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ ও এলাকা ব্যবস্থার অবনতি হ'ল। *কলিকাতায় দর্জিপাড়া, কাঁসারি পাড়া, শাঁখারিপাড়া, বেনিয়াটোলা,* পটুয়াটোলা ইত্যাদি আঞ্চলিক নামের মধ্যে আজও তার চিহ্ন রয়ে গেছে।

আমাদের আলোচ্য বরানগরেও এহেন ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ছিল না। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের আমল থেকেই এই জনপদটিতে জনবসতি বৃদ্ধি পায়। বিদেশী বাণিজ্যগোষ্ঠীর বৈভবের আনুকূল্যে বরানগরেও বৃত্তিভিত্তিক সমাজ গ'ড়ে ওঠে। আমরা ধরে নিতে পারি যে পর্তুগীজদের আগমনের আগে এই জনপদটিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে জনবসতি ছিল, তা *কোন সম্পূর্ণ সমাজ হয়ে* ওঠেনি এবং বৃত্তিগত গোষ্ঠীর আকারও লাভ করেনি। ওলন্দাজদের আমলেই দেখা যাচ্ছে বরানগরে বিভিন্ন এলাকার নাম তাঁতিপাড়া, কামারপাড়া, দর্জিপাড়া, বারুইপাড়া, কুমোরপাড়া, মালিপাড়া, কালাকারপাড়া, জেলেপাড়া ইত্যাদি। *অর্থাৎ বৃত্তিগত গোষ্ঠী ক্রমে গড়ে উঠছে।* তাঁতিপাড়া, খাসবাগান, আলমবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে সতেরো, আঠারো শতকে তাঁতি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল এবং ইংরেজদের তৈরি বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বঙ্গদেশের তাঁতিদের যে দুর্ভাগ্য বরানগরের তাঁতিরাও স্বভাবতই তার শরিক হয়েছিল। ১৮২৩খ্রী দেখা যাচ্ছে আগরপাড়া, পাণিহাটি, মাহেশ, দক্ষিণেশ্বর এবং বরানগরের তাঁতিরা একজোটে বরানগরের ফ্যাক্টরি রেসিডেন্ট এবং তাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে কারণ সেখানে পুরনো তাঁতিদের দাদন না দিয়ে কোম্পানির

লোকজন নতুন তাঁতিদের দাদন দিচ্ছে ঘুষ নিয়ে। জনৈক তাঁতি ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে তাকে ফ্যাক্টরির বাইরে যেতে না দিয়ে আটক করা হয়। আসলে, রেসিডেন্ট সাহেব নিজে প্রত্যক্ষভাবে এইগুলি দেখাশুনো করতেন না, তিনি একজন গোমস্তার মাধ্যমে কাজ করাতেন এবং সেই গোমস্তার নৈতিক অনাচারের ফলে তাঁতিদের এই দুরবস্থা হয়েছিল। যাই হোক্ তদানীন্তন বোর্ড অব ট্রেড এই অভিযোগ পেয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং রেসিডেন্ট সাহেবকে সরেজমিনে তদন্তের নির্দেশ দেয়। কিন্তু পরপর দুবার এমন নির্দেশ সত্ত্বেও রেসিডেন্ট সাহেব নীরব হয়ে থাকলে বোর্ড অব ট্রেড গবর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট'কে তাঁতিদের অভিযোগের কথা জানান এবং অনুরোধ করেন যে এই ঘটনার তদন্তের জন্য বরানগরে যেন একজন সরাসরি অফিসার নিয়োগ করা হয়। শোষণের ফলে বরানগরের তাঁতিরা ক্রমশই তাদের বৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৮৫৯ খ্রী যখন বোর্নিও কোম্পানি বরানগরে জুট মিল স্থাপন করেন তখন দেখা যাচ্ছে সেখানে স্থানীয় শ্রমিকদের অধিকাংশই যুগী ও তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত। বারুইপাড়া, জেলেপাড়া এবং কুমোরপাড়া ব্যতীত অন্যান্য সব বৃত্তিনাম অঙ্কিত অঞ্চলগুলিই আঠারো শতকে নিছক অঞ্চল-নামে পর্যবসিত হয়। ১৭৯৩ খ্রী কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, সেই শ্রেণীর একাংশ বরানগরেও প্রতিপত্তি বিস্তার করে। জমিদারদের অধীনে এইসব বৃত্তি প্রধান মানুষজন আরও বেশী অর্থানুকূল্যের আশ্বাস পায় এবং বৃত্তি সেবার চেয়ে ধনীতোষণের পথটিই শ্রেয় মনে করে। তাছাড়া, ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই যেমন, বরানগরেও তেমনি, একটি আত্মতুষ্ট শিক্ষিত মধ্যপন্থী জনগোষ্ঠী গ'ড়ে ওঠে যাদের কাছে পুরাতনী বৃত্তিব্যবস্থা সসম্মান জীবন যাপনের পরিপন্থী মনে হয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও বরানগরে কিছু বৃত্তি প্রধান গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু ক্রমেই, খুব দ্রুত, ভিন্নতর শ্রেণীর উদ্ভবে, এবং কলিকাতার কাছাকাছি হওয়াতে নানা প্রশাসনিক প্রভাবে, বরানগর শহরাঞ্চলে উত্তীর্ণ হতে থাকে। নিছক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদ আর বরানগর রইল না। আজও যে কয়েকটি বৃত্তিগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা বরানগরে রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম কুমোরপাড়া এবং বেহালাপাড়া। (বেহালাপাড়া এলাকাটি

আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এখানে শতকরা ষাট জন অধিবাসী আজও শুধুমাত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করেই জীবিকা নির্বাহ করে এবং এই বৃত্তির উৎকর্ষে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। এঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র সর্দার এবং নগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরিবারদুটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।)

বারুইপাড়া অঞ্চলে যে বারুজীবীদের বসবাস দীর্ঘদিনের সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনো প্রামাণ্য তথ্য না পাওয়া গেলেও স্থানীয় বয়োবৃদ্ধদের কাছে শুনেছি এই অঞ্চলে বারুজীবীদের পানের বরজ ছিল এবং পানচাষে অঞ্চলটি সুপ্রতিষ্ঠ ছিল। এখনও, এই পাড়ার কিছু অধিবাসী এই ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। গঙ্গার উপকূলে জেলেপাড়াও বহু পুরনো। কিন্তু বরানগর-সংলগ্ন সৎচাষী পাড়ার নাম শুনলে সন্দেহ হয় কোনদিন কী এখানে চাষীদের আবাস ছিল? বরানগরে আবাদযোগ্য জমি এবং সেই জমিকে কেন্দ্র ক'রে কৃষক সম্প্রদায় কোন দিন ছিল কিনা সে-বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য আমরা পাইনি। তবে জনশ্রুতি যে বি টি রোডের পূর্বদিকে যে বরানগর সেখানে পঞ্চাশ দশকেও বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল আবাদযোগ্য। আমাদের এই জনপদটিতে যে গোষ্ঠীর প্রতিপত্ত ছিল সবচেয়ে বেশী, বিশেষত, বৈদেশিক বাণিজ্যগোষ্ঠীর আগমনের পর, তারা হ'ল সুবর্ণ-বণিক। কোনো বাণিজ্য-প্রধান এলাকায় বণিক সম্প্রদায়ের আধিপত্যই স্বাভাবিক। বরানগর সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকেই একটি উল্লেখ্য বাণিজ্য কেন্দ্র, সে-কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জেনেছি। তাছাড়া, বৃত্তিগত সাফল্য থেকে বেশ কিছু নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। যেমন তাঁতিদের মধ্যে বসাকরা ও শেঠ বসাক সমাজ সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে এবং কাপড় বোনা ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের ব্যবসা ক'রে বিত্তশালী হয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বরানগরেও।

বরানগরে যখন বিদেশীদের বাণিজ্য কুঠি গ'ড়ে উঠল, তখন থেকেই এখানকার সমাজ ব্যবস্থার সুনিশ্চিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিদেশীদের বিলাস ব্যসনে স্থানীয় মানুষরাও স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট হয়। আরও পরে কলিকাতার নবোদ্ভূত জমিদার গোষ্ঠীর বিলাসিতার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র হিসেবেও জনপদটি সুখ্যাত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রথমে বিদেশীদের ও পরে হঠাৎ-ধনী জমিদারদের বিলাস ব্যসনকে সম্পূর্ণ করতে বরানগরে একটি বিচ্ছিন্ন বারবণিতা শ্রেণীও গ'ড়ে ওঠে।

ওম্যালি সাহেবের জেলা গেজেটিয়ারে এদেরই women of easy virtue আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলত, নীচু বর্ণের মানুষজন উঁচুবর্ণের জমিদারের কৃপাধন্য হয়ে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেল। সামাজিক ইতিহাসের নিয়মেই রয়েছে যে নিম্নতর পর্যায়ের জাতিগুলি সবসময়েই চেষ্টা করেছে স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে। বরানগরে এই সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়নি কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহে, অনেকেই ধনী জমিদারের কৃপানুকূল্যে অর্থবাণ হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই গ্রন্থের সমীক্ষা অংশে 'মন্দির পরিক্রমা'-য় এই তত্ত্বের কিঞ্চিৎ সমর্থন মিলবে। লোকগণনার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বরানগরে চণ্ডাল শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। পুরাণে আছে যে ব্রাহ্মণ পিতা এবং শূদ্র মাতার মিলনে যে সন্তান, সেই চণ্ডাল। অসম্ভব নয়, যে, বরানগরে উচ্চবর্ণ জমিদার গোষ্ঠীর মদমত্ত বিলাসেই এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, বনহুগলী এলাকাটিতেই এঁদের বসবাস কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

বরানগরের সমাজ ব্যবস্থার একটি মিশ্র চরিত্র লক্ষিত হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে যখন জনপদটি ইংলণ্ডীয় প্রভাবে একটি শিল্পকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়। তার আগেই, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বরানগরেও মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' সমাজ গ'ড়ে ওঠে। দ্রুত শিল্পায়ণ হতে থাকলে এই সমাজের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া তার কিছুটা আমরা পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়ে জেনেছি। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একজন প্রগতিবাদী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যখন শিল্পায়ণকে আবাহন করেন, অন্যান্যরা তখন তাদের আত্মতৃপ্ত অচলাবস্থা ভেঙে যাবে, এই ভয়ে, প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। প্রায় ছ' হাজার শ্রমিক নিয়ে গ'ড়ে ওঠা জুট মিল, কলভিন সাহেবের চিনির কল প্রভৃতি বরানগরের সামাজিক চেহারার আদল পাল্টে দেয়। বহু পরস্পরবিরোধী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজ-অবয়বটি হঠাৎ খুব জটিল হয়ে যায়। তারই মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে একটি ধর্মীয় সমাজের সৃষ্টি হয়। শশিপদর ক্রিয়াকলাপে সকলেই সচকিত হয়ে ওঠেন। কলিকাতায় উদ্বোধিত নবজাগরণের ঢেউ এসে এই ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলে আছড়ে পড়ে। শশিপদ এবং রামকৃষ্ণকে ঘিরে বহু ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক

ব্যক্তিবর্গের আনাগোনা শুরু হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই সামাজিক অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দ্রুত শেষ হয়ে গেছে সব প্রগতিবাদী উদ্যোগ, শশিপদ স্থানীয় সমর্থন পাননি, রামকৃষ্ণদেব সর্বধর্মসমন্বয় করতে পারেননি বরানগরে। অনুমেয় যে, বরানগরের উচ্চবিত্ত 'বাবু' সমাজ এবং মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' সমাজ ইতিহাসের গতির সঙ্গে পা মেলাতে পারেননি। তাঁরা প্রথানুবাগী হয়ে, পুরনো ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন, শ্রমিক শ্রেণীব প্রতি সহানুভূতিশীল হননি। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে বরানগরের সামাজিক চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে ইতিহাসেব নিয়মে। একটি প্রোথিত সামাজিক অবস্থা, যা পুরনোপন্থীরা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, ক্রমেই ভেঙেচুবে ভিন্নরূপ গ্রহণ করেছে। উচ্চবিত্তদের বিত্ত গেছে হারিয়ে, মিথ্যে সামাজিক মর্যাদা নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে চেয়েছেন, কেউবা পুরনো ভুল শুধরে নিয়ে শ্রেণীহীন হয়ে গেছেন।

মূলত, বিদেশীদের বাণিজ্যকুঠিকে কেন্দ্র ক'রে যে জনপদটির সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল, সেখানে পববর্তীকালে পরস্পর বিরোধী সামাজিক শক্তির অনুপ্রবেশে সমাজ কিছুটা সংকররূপ পরিগ্রহ করে। এখানে তাই, কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠে না এবং বাণিজ্য-বুদ্ধিই প্রাধান্য পেয়েছে বলে কলিকাতায় সংস্কৃতির যে সমৃদ্ধি, বরানগবে তা কয়েকজনমাত্র বুদ্ধিজীবীর কুক্ষিগত। উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সামিল হয়েছিলেন, বরানগরের অবদান সেখানে যৎসামান্য। একমাত্র শশিপদই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এবং তিনিও তাঁর কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছিলেন ইউরোপীয় 'এলিট' ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায়। এখানকার সামাজিক কাঠামোর কোন সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল না বলেই সুবিন্যস্ত সমাজ গ'ড়ে ওঠেনি। তাছাড়া উপনিবেশিকতার শিকার হয়েছিল এই ধরনের নগন্য শহরাঞ্চলগুলিই। বরানগরেও এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

প্রথম চারটি অধ্যায়ের সংযোজন, সংশোধন ও নির্দেশিকা

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই· বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে · '। কবি-কথিত এই উক্তিতে প্রাণিত হয়েই বরানগর নামক জনপদটিকে তুচ্ছজ্ঞান না ক'রে এই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলাম। সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করেছেন, রাজবংশানুক্রমের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে একদা যে অনুশীলন রীতি নির্ভরযোগ্য ছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রমায়ত ধারা বিশ্লেষণের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য প্রত্যেক দেশের ছোট ছোট অঞ্চলের ইতিহাসালোচনা প্রয়োজন। ইতিহাস রচনার এই রীতিকে সামাজিক ইতিহাসবেত্তাগণ বলেছেন 'the process of writing history 'from the bottom up', through the use of local materials and a local focus'. চারটি ভিন্ন নিবন্ধে গ্রথিত বরানগরের ইতিহাস এই সাম্প্রতিক ধারায় অনুকৃত রীতিতে রচনা করায় প্রয়াসী হয়েছি।

প্রথম নিবন্ধ (গ্রন্থের সুবিধার্থে নিবন্ধগুলিকে অধ্যায় বলা হয়েছে) 'দেশকাল পরিচিতি ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিতর্ক'-এ দেশ শব্দটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দেশ বলতে বোঝায় স্থান। জীবনে যা-কিছু ঘটে বা আছে, তা আছে বা ঘটে কোনো স্থানে। সে স্থান হতে পারে একটি নিভৃত গৃহকোণ, হতে পারে একটি ভৌগোলিক মহাদেশ বা মানুষ-অধ্যুষিত প্রায় সমগ্র ভূ-মণ্ডল। কোন্ স্থান বা পরিধি কোন্ তথ্য বা ঘটনার প্রেক্ষিতে কিভাবে কতটা মর্যাদা পাবে তা একদিকে যেমন নির্ভর করবে বিশিষ্ট তথ্য বা ঘটনার গভীরতার ওপর, অন্যদিকে তেমনই নির্ভর করবে ঐতিহাসিকের বিচার, বুদ্ধি ও জীবনাভিজ্ঞতার ওপর। সব তথ্য, সব ঘটনাই তো সর্বদা ও সর্বথা সমান অর্থবহ নয় ; কোন্ ঐতিহাসিক কোন্ তথ্য বা ঘটনাকে কতটুকু মর্যাদা দেবেন তার জন্য কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন নেই। সুতরাং এ-ক্রিয়াটি ঐতিহাসিকের চোখ, বোধ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিচার সাপেক্ষ। একথা স্বীকার

করা সৎ ও সঙ্গত। এটাও স্বীকার্য যে ইতিহাস লেখা নামক বৌদ্ধিক ক্রিয়াটি যতটা একান্ত বস্তুগত ও নৈর্ব্যক্তিক বলে ধরে নেওয়া হয়, বিশুদ্ধ যুক্তির দিক থেকে ততটা তা নয়। প্রয়াত ঐতিহাসিক আচার্য নীহাররঞ্জন রায় তাঁর একটি নিবন্ধে বলেছিলেন, ঐতিহাসিকই নির্বাচন করেন তাঁর ইতিহাসের আশ্রয়; অর্থাৎ তাঁর আলোচ্য দেশ বা স্থানের পরিধি। সে পরিধি একটি দেশখণ্ড বা অঞ্চলমাত্র, একটি গ্রামমাত্র হতেও বাধা নেই। তবে এ ব্যাপারে একটি বিবেচনা আছে এবং তা অর্থবহ। ঐতিহাসিক যে স্থান বা দেশই নির্বাচন করুন, যত সীমিত বা ক্ষুদ্র সংকীর্ণ তা হোক্ না কেন, ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকে তা মোটামুটি একটি ঐক্যবদ্ধ স্বসম্পূর্ণ unit হওয়া প্রয়োজন। বরানগরের এমন একটি ঐক্যবদ্ধ স্বসম্পূর্ণতা আছে মনে ক'রে, আচার্য নীহাররঞ্জনের ইতিহাস-চেতনাকে পাথেয় করে এই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করি। আচার্য নীহাররঞ্জনের বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থের রচনার কাঠামো এবং তথ্য প্রথম নিবন্ধটি রচনায় প্রভূত সাহায্য করেছে। প্রয়াত অধ্যাপকের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমীক্ষা পরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞ। আমরা স্থিরনিশ্চয় যে তিনি জীবিত থাকলে এই ধরনের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় খুশী হতেন। প্রথম নিবন্ধটি সযত্নে, সচেতনে, তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা রেখে রচনা করার প্রয়াস থাকলেও কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। অসম্পূর্ণতা এই অর্থে যে মুদ্রাকরের কাছে রচনা প্রেরিত হওয়ার পর কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, কিছু তথ্য সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। বরানগরের একটি প্রাচীন পরিবারের সন্তান, ইতিহাস-সচেতন শ্রীযুক্ত ক্ষৌণিশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় জানিয়েছেন যে ১৮৫৮ খ্রী কোম্পানির রাজত্বের অবসানে এবং রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করার পর, বরানগর নামক জনপদটি সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যায়। বৃহত্তর অর্থে সমগ্র ভারত-ভূখণ্ডটিই রাণী ভিক্টোরিয়ার সম্পত্তি হয় ১৮৫৮ খ্রী-র পর, কিন্তু ক্ষৌণিশবাবু বলতে চেয়েছেন যে একদা যেমন চব্বিশ পরগনা জেলাটি লর্ড ক্লাইভের ব্যক্তিগত জমিদারি হয়ে যায়, তেমনই, বরানগর ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত জমিদারি ছিল। এই তথ্যের কোন ঐতিহাসিক সমর্থন আমি পাইনি। তবে, ক্ষৌণিশবাবুর অন্য একটি তথ্য আমার নিবন্ধকে সমর্থন করেছে। বরানগরে ওঁদের বংশের প্রথম পুরুষ দামোদর দেবশর্মণঃ

বরানগরে এসেছিলেন একজন ওলন্দাজ সাহেবকে বাংলা ভাষা শেখাতে। সেই থেকেই তাঁর বসবাস শুরু। ক্ষৌণিশবাবুর কাছে আমি এই তথ্যগুলি পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। যে তথ্যটি আমাকে দ্বিধান্বিত করেছে তা হ'ল এই নিবন্ধের উপসংহারে আমি বলেছি যে জর্জ হেণ্ডারসন সাহেব ১৮৫৯ খ্রী বরানগরে প্রথম যন্ত্রচালিত তাঁত বসিয়ে বিশ'ল জুট মিল গ'ড়ে তোলেন। অথচ, আমাব তৃতীয় নিবন্ধে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে দেখছি যে ১৮৬৫ খ্রী বোর্ণিও কোম্পানির অন্যতম মালিক মি. উইলিযামস্ আলেকজাণ্ডার। হেণ্ডারসনের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারিনি। পাঠক এজন্য ক্ষমা করবেন।

আমার দ্বিতীয় নিবন্ধ 'ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ও প্রবাহ'-তে শ্রীচৈতন্যের বরানগরে আগমনকে কেন্দ্র ক'রে বৈষ্ণব ধর্ম তথা ধর্ম-চেতনার যে সূচনা, তাকেই উন্মেষ বলেছি ও পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম আন্দোলন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সৃষ্ট ধর্মচেতনা এবং নানা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মগোষ্ঠীর উদ্ভবকে প্রবাহ আখ্যা দিয়েছি। স্বীকার করা ভাল যে শ্রীচৈতন্যদেবকে ঘিরে বরানগরে পাঠবাড়ির ইতিহাস ও শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে দক্ষিণেশ্বরের ইতিহাস যেভাবে এই নিবন্ধে বিবৃত হয়েছে তা এই গ্রন্থরচনার কাঠামোগত দর্শনের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয় নি। বরানগরের অগণিত ধর্ম পিপাসু মানুষের কথা মনে রেখেই এই সচেতন বিচ্যুতি। এই নিবন্ধটি লিখতে গিয়ে বরানগরের আজও সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে সুপ্রচুর তথ্যাদি ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি পেয়েছি। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন সম্পর্কে একদা সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যাল-মহাশয়ের সঙ্গে বেশ কিছু তত্ত্বগত আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। সেই আলোচনাটি আমার মতামত গঠনে সাহায্য করেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত 'মতুয়া' গোষ্ঠীদের কথা আমাকে বলেছেন আমার সহপাঠী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণী আলোচনার বই আমায় সন্ধান দিয়েছেন সুবর্ণরেখার ইন্দ্রনাথ মজুমদার। ইন্দ্রনাথবাবু আমাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। এই নিবন্ধের সূচনায় ভারতীয় ধর্মের ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি সর্বজনগ্রাহ্য আলোচনা আছে কিন্তু উপসংহারে ধর্ম সম্পর্কে

আমার এবং সমীক্ষা পরিষদ এর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে ধর্মের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা আছে, বিশেষত, এ-দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয়। এক্ষেত্রে যেসব মন্তব্য করেছি, তা আমাদের প্রত্যয়ের গভীর অতল থেকে উৎসারিত। কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি যদি অবচেতনে আঘাত হেনে থাকি, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্যের সততা উপলব্ধি করবেন।

আমার তৃতীয় নিবন্ধ 'শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারত শ্রমজীবী' রচনার সময় যে অসাধারণ প্রবন্ধটি আমাকে নিরন্তর সাহায্য করেছে তা হ'ল 'Sasipada Banerjee: A Study in the nature of the first contact of the Bengali Bhadralok with the working classes of Bengal.' বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনারত তরুণ ঐতিহাসিক অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তীর এই মৌলিক নিবন্ধটি প্রথমে সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের চার নম্বর অকেশনাল পেপার হিসেবে প্রকাশিত হয়। পরে, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রিভিউ-তে পুনর্মুদ্রিত হয়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ঐতিহাসিক সন্ধিৎসায় অধ্যাপক চক্রবর্তী বরানগরে শশিপদর কর্মকাণ্ডের ওপর যে গবেষণা করেছেন, আমরা তার বিন্দুমাত্র পারিনি। আমার এই তৃতীয় নিবন্ধটিতে আগাগোড়া অধ্যাপক চক্রবর্তীর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়ে গেছে। তবে, তৎসত্ত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে। বরানগর সোশ্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটি বরানগরের কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় জানতে পারিনি। বরানগরে সেভিংস ব্যাঙ্কই বা কবে কোথায় শশিপদর উদ্যোগে গ'ড়ে ওঠে সন্ধান পাইনি। উল্লেখ করিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের অন্যতম বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে শশিপদর দীর্ঘদিনের বন্ধুতার কথা। বিপিনচন্দ্র নিয়মিত বরানগরে আসতেন। অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ভারত-শ্রমজীবী গ্রন্থটিও আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছে। তাঁর কাছে আমি এবং সমীক্ষা পরিষদ বিশেষভাবে ঋণী হয়ে রইলাম। কিন্তু, ভারত শ্রমজবীর আলোচনায় উল্লেখ করতে বিস্মৃত হয়েছি যে এই পত্রিকার ১৫,০০০ গ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আনন্দ মোহন বসু। অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম যুক্তিতাড়িত

শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে শশিপদ ও অশ্বিনীকুমারের মধ্যে সময়কালের ফারাক প্রায় তিরিশ বছর। শশিপদ তাঁর সমসময়ে যে কর্মধারার উদ্বোধন করেছিলেন, তা অভাবনীয়। প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলনের অবয়বটি আঁকতে অধ্যাপক চক্রবর্তীর নিবন্ধ ছাড়াও যে গ্রন্থটি আমাকে আলোকিত করেছে তা হ'ল 'The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908)'। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সুমিত সরকার রচিত এই আকর গ্রন্থটির 'Labour Unrest and Trade Unions' অধ্যায়টি বহু অজ্ঞাত তথ্য সমৃদ্ধ। অধ্যাপক সরকারের কাছেও আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞ। এই নিবন্ধটিতে একটি মারাত্মক মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। শশিপদর জন্মতারিখ ২রা ফেব্রুয়ারী, ৮৪০। মুদ্রিত হয়েছে ১৮৪০। চারটি নিবন্ধেই আমি 'কলকাতা'কে 'কলিকাতা' বলেছি কারণ আলোচ্য সময়কালে কলিকাতার আধুনিকতম অপভ্রংশটি প্রচলিত ছিল না।

চতুর্থ নিবন্ধটি আমাদের সংগৃহীত বিভিন্ন স্থানীয় তথ্যের সন্নিবেশে রচিত হয়েছে। কিন্তু, এটি আশানুরূপ সুবিন্যস্ত হয়নি। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করার ইচ্ছে র'ল। মূলত, অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যাল এর 'বর্ণ ও জাতি' প্রবন্ধটির সাহায্য নিয়েছি (এক্ষণ, চতুর্দশবর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৮)। এতদ্ব্যতীত, এই দীর্ঘ চারটি নিবন্ধ রচনার সময় এই গ্রন্থ পরিকল্পনায় আমার সহযোগী রঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা তীক্ষ্ণধী উপদেশ, জিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণ আমাকে অনিঃশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে। অন্যান্য সহযোগী বন্ধুদ্বয় দেবকুমার শেঠ ও জয়দেব মুখোপাধ্যায়ও নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। আমার সকল কাজেই উৎসাহদাতা কালনা কলেজের অধ্যাপক দীপক গোস্বামী এবং অগ্রজপ্রতিম তুফানগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ীর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। সুদূর কর্মস্থল থেকে এঁরা অনুপ্রাণিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় উৎসাহদাতাদের মধ্যে আছেন উত্তরসূরি-সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য আশৈশব বরানগরের বাসিন্দা, বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সহপাঠী, সুহৃদশ্রেষ্ঠ আনন্দবাজার পত্রিকার সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও আমার শিক্ষক গৌতম ভদ্রও নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। **অনুপ মতিলাল**

বরানগরের পুরনো বাড়ি, বাগানবাড়ি

[সমস্ত বরানগর জুড়ে কতো যে পুরনো বাড়ি বাগানবাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রাপ্ত তথ্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায়, এইসব বাড়ি, বাগানবাড়িব অনেকগুলিরই নির্মাণকাল দেড়শো থেকে দু'শ বছরের মধ্যে। একসময়, কলকাতার বিত্তবান মানুষেরা অন্যান্য স্থানের মতো বরানগরকেও তাঁদের প্রমোদ উদ্যান বা অবকাশরঞ্জনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এর নানা কারণ থাকতে পারে। অনেকে বাণিজ্যসূত্রে বরানগরে এসেছিলেন, কেউ বা দূরদূরান্তে আসা যাওয়ার পথে স্থানটির গঙ্গাতীরস্থ নির্জনতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে, শুধু কলকাতার নয়, চব্বিশ পরগণা, হুগলি এবং বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্থানের জমিদারদেরও দৃষ্টি পড়েছিলো বরানগরের ওপর। এইসব বাড়ি, বাগানবাড়ির অনেকগুলি যেমন লুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনই অনেকগুলি এখনও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ জীর্ণ হয়ে আসা অস্তিত্ব নিয়ে ধরে রাখতে চাইছে তার প্রাচীন জৌলুশকে। পূর্বতন বরানগরের কিছু কিছু বাড়ি, বাগানবাড়ি এখনকার কাশীপুর, দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটির অন্তর্গত হওয়ায় বর্তমান অধ্যায় থেকে বিযুক্ত হলো।

এই অধ্যায়ে বাড়ি, বাগানবাড়িগুলির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই এইসব প্রমোদউদ্যান ও অট্টালিকার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট মালিকদের পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে। তাই বাড়ি, বাগানবাড়িগুলির নির্মাণকাল, আয়তন এবং ঐসব স্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমন ব্যতিরেকে ইতিহাস অধিকাংশক্ষেত্রেই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠাতার পারিবারিক ঘটনাস্রোতের ওপর। তবে, এই পরিক্রমার বাইরেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বাড়ি ও বাগানবাড়ি থেকে গেল। কিন্তু প্রকৃত তথ্য প্রমাণাদি হাতে না পাওয়ায় শুধুমাত্র লোকশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রাখতে পারিনি। এপ্রসংগে একটি কথা পাঠকদের মনে রাখতে সবিনয়ে অনুরোধ করি যে, এই পরিক্রমায় কোনোভাবেই পক্ষপাতিত্ব বা বিশেষ পছন্দ-অপছন্দকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। এই পরিক্রমায়

মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ যুগ ও সময়কে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র এই অধ্যায় জমিদার দর্পণ নয়, বাবুবৃত্তান্তও নয়। নয় তাঁদের শ্রেণী-চরিত্রের বিশ্লেষণ। চিন্তাশীল পাঠককে এটুকু স্মরণ করাতে হবে না যে, মূলত বংশ-পরম্পরায়ক্রমে পাওয়া সম্পদ অথবা কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতার পুরস্কারস্বরূপই বণিক-ব্যবসায়ীকুলের উৎপত্তি। দেওয়ান, দালাল, মুৎসুদ্দি—এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই কেউ বা জমিদার, কেউ বাবু। কেউ বা এমন কী রাজা, মহারাজা। এই শ্রেণীর সামাজিক পরিচয় বিশ্লেষণ ইতিহাসনির্ভর সমাজতত্ত্বের বিষয়। আমরা শুধু বাড়ি ও বাগানবাড়ির সূত্র ধরে বরানগরে এই শ্রেণীর অবস্থানকে চিহ্নিত করেছি মাত্র।

বাড়ি বাগানবাড়ির ইতিহাস পরিবার কেন্দ্রিক হয়ে ওঠার আর একটি কারণ—সমীক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে যে ইতিহাস তুলে ধরা হলো, তার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ইতিহাস হয়ত নিকট ও দূর ভবিষ্যতে রচিত হবে। সুতরাং পরিবারগুলির পরিচিতি সামনে পেলে তাঁদের কাজ আরও সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। বাড়ি, বাগানবাড়ির ইতিহাস সন্ধানকালে আমাদের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ অতএব অভিজ্ঞতার স্বাদও স্থানে স্থানে বদলেছে। অভিজ্ঞতা যেখানে মধুর ও জ্ঞানান্বেষণের সহায়ক, সেখানে আমরা কৃতজ্ঞ। তিক্ত অভিজ্ঞতা বেদনাদায়ক, অতএব বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সমস্যা আমাদের পীড়িত করেছে, তা হলো উপযুক্ত নথিপত্রের অভাব। প্রাচীন পরিবারের বর্তমান পুরুষেরা একাধিক-ক্ষেত্রেই জানেন না, এই অঞ্চলে তাঁদের পূর্বপুরুষের আগমনের ইতিহাস। কেউ কেউ জেনেও মুখ খুলতে সাহসী নন্। অনেক পরিবারেই বংশলতিকা অনুপস্থিত। অথচ সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজে বংশলতিকা অতি অপরিহার্য বস্তু। সময়ের পারম্পর্যকে স্পর্শ করতে হলে বংশলতিকার সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী কাজ (দ্র. Genealogy As a Source of Social History, Romila Thaper, I. H. R. Vol. II. No. 2 1976)। পরিষদের বিনীত অনুরোধ এখনও যাঁদের পরিবারে বংশলতিকা নিতান্ত অবহেলায় রক্ষিত আছে, সেগুলিকে সংরক্ষণ করুন। পরিবারের পুরাতন গ্রন্থ-গুলিও অমূল্য সম্পদ। সংরক্ষণের নানা বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। যদি কেউ পুরাতন গ্রন্থ বা

সংকলতিকা সংরক্ষণে অপারগ হন, তবে সেগুলিকে উপযুক্ত গ্রন্থাগারে দান করুন। এর ফলে একটি অঞ্চল থেকে শুরু ক'রে সামগ্রিক ভাবে এই দেশের সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'তে পারবে।]

বসাকবাগান

কুটিঘাটের যে অঞ্চলটিতে এখন বরদা বসাক স্ট্রীট, এই অঞ্চলটিকে এখনও অনেকে খাসবাগান বলে থাকেন। প্রায় ১৬ বিঘে জায়গা জুড়ে এই খাসবাগান এলাকা। এই খাসবাগান ছিল ইংরেজদের খাস জমি। ক্রমে ক্রমে সেই জমির মালিক হন বসাকরা। তারপর থেকেই এই এলাকা খাসবাগান নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এই বসাক পরিবারের অন্যতম পুরুষ ছিলেন বরদাকান্ত বসাক। ইনি নিঃসন্তান। এখন এই অঞ্চলে যে বসাক পরিবার বসবাস করছেন তাঁরা সকলেই বরদা বসাকের জ্ঞাতি সম্পর্ক। কলকাতার শেঠ বসাকদের ঐশ্বর্য সম্পর্কে নানা কাহিনীই প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা এঁরা তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু বেশ কিছুকাল ধরে কলকাতার শেঠ বসাক সমিতি বলে আসছেন যে তাঁরা তন্তুবায় নন্ তন্তুবণিক। অবশ্যই এটি বিতর্কের বিষয়। মতামত দেবেন বিশেষজ্ঞরা। আপাতত চোখ ফেরানো যাক্ বরদা বসাকের পারিবারিক ইতিহাসের দিকে। এঁদের পরিববারের আদি পুরুষ হলেন কেশবরাম। তাঁর পুত্র গঙ্গারাম। গঙ্গারামের আবার দুই পুত্র শোভারাম ও অযোধ্যারাম। শোভারাম হলেন বিখ্যাত শোভারাম বসাক। আকবরের রাজত্বকালে এঁদের কোন পূর্বপুরুষ "বৃশাখ" উপাধি প্রাপ্ত হন। শোভারাম ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সুতীবস্ত্রের ব্যবসা ক'রে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। তাঁর নামেই বর্তমান শোভাবাজার। ১৭৫৭ সালে মীরজাফর সিরাজউদৌল্লার কাছ থেকে কলকাতা উদ্ধারের পর দেশী প্রজাদের মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন এবং এ-ব্যাপারে যেসব কমিশনার নিযুক্ত করেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন শোভারাম। এই শোভারামেরই ভাই অযোধ্যারাম। এঁরও জন্ম মকসুদাবাদ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ)। তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে শোভারামকে রেশমি বস্ত্র সরবরাহ করতেন। 'কিন্তু ঐ সময়ে ইংরেজদের প্রবল

অত্যাচারে উৎপীড়িত তাঁতীরা বুড়ো আঙুল কেটে ফেলতে লাগল। সেই সময় অযোধ্যারাম সুতানুটিতে পালিয়ে আসেন এবং বর্তমান বড়বাজার অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। এখন যেখানে মার্কাস স্কোয়ার, সেখানেই তাঁর বিশাল কলাবাগান ছিল। এখানে একটি বড় দীঘিও ছিল। তিনি ১৮০১ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর পাঁচ পুত্র। গুপীমোহন, লালমোহন, গোকুলচাঁদ, তিলকচাঁদ, রসিকলাল। চতুর্থ পুত্র তিলকচাঁদই হলেন বরদাকান্ত বসাকের পিতৃদেব। তিলকচাঁদ মৌদ্গল্য গোত্রজ পীতাম্বর শেঠের দ্বিতীয়া কন্যা দুর্গামণিকে বিবাহ করেন। তিনি বিপুল ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। 'দ্বাদশ কুপকুঞ্জ' নামে কামারহাটিতে তাঁর একটি রমণীয় উদ্যান ছিল। ইনি "কৌয়ারীন বসাক" নামে একটি অফিসে মুৎসুদ্দি হিসাবে কাজ করতেন। এঁর একমাত্র পুত্র বরদাকান্ত। তিনি খাসবাগান অঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন। বরদা বসাকের মৃত্যুকাল সম্ভবতঃ ১৮৮১। এই খাসবাগান অঞ্চলে একসময়ে তাঁতীদের বাস ছিলো। বসাকদের কাছ থেকেই তারা দাদন পেত। এখানে উৎপন্ন তাঁতের কাপড় ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি জায়গায় পাঠানো হত। বর্তমানে এখানে যে পরিবার থাকেন তাঁরা কলকাতার প্রখ্যাত বৃন্দাবন বসাকের বংশধর।

মল্লিক ভবন

২০, মথুরানাথ চৌধুরী ষ্ট্রীটস্থ মল্লিক ভবনের বয়স প্রায় দেড়শো বছর। এই বাড়ির আসল মালিক ছিলেন জনৈক দত্ত। তাঁর কাছ থেকে বরানগরের বিখ্যাত জমিদার জয়নারায়ন ব্যানার্জী এই বাড়ি কেনেন। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, যে জয়নারায়নবাবুই বরানগর অঞ্চলে ব্রাহ্মণ সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই জয়নারায়ন ব্যানার্জীর কাছ থেকেই কলকাতার হ্যারিসন রোডের সিংহবাহিনী মল্লিক বংশের এক পুরুষ প্রেমনাথ মল্লিক ১৮৩৫-৩৬ সাল নাগাদ এই বাড়ি কিনে নেন। তখন এই বাড়িসংলগ্ন মোট জমির আয়তন ছিল ৭ বিঘা। প্রেমনাথ মল্লিক ছিলেন রামমোহন মল্লিকের পুত্র। প্রেমনাথ মল্লিকের তিন পুত্র প্রসাদদাস, নিত্যদাস, মনোলাল। পরবর্তীকালে এঁদের বংশধরেরাই এই বাড়ির মালিক হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যে সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিকহিতসাধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রেমনাথ মল্লিক ছিলেন তার অন্যতম সম্পাদক।

গোলকধাম

৪১/১, জয়নারায়ন ব্যানার্জী লেনের গোলকধাম আসা যাওয়ার পথে সকলেরই চোখে পড়বে। ক্রমশ জীর্ণ হয়ে আসা এক ইতিহাস যেন তার প্রাচীন উজ্জ্বলতাকে বিকশিত করতে চাইছে। এই বাড়িব নির্মাণকাল প্রায় সিপাহী-বিদ্রোহেব সমসাময়িক। গোলকধাম নামকবণ বাবু গোলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েব নামে। এঁব পিতামহ রামশরণ মুখোপাধ্যায বিবাহসূত্রে জয়নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন। বিবাহের পর কানপুবে যান এবং সেখানে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত "রামরতন এ্যাণ্ড কোং" নামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেব পরিচালনা শুরু কবেন। এই প্রতিষ্ঠান দেশীয় রাজ্যগুলিতে মদ সববরাহেব ব্যবসা কবত। কানপুবে মল রোডেব ওপর এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ছিল। লোকেবা একে গোলকবাবুব সরাইখানাও বলতো। বাবু গোলকচন্দ্র মুখার্জীব পূর্বপুরুষ আগেই ববানগবে এসেছিলেন। গোলকবাবু ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। কুটিঘাটে গঙ্গার ধাবে তিনি ঘাট নির্মাণ কবেছিলেন। ১৮৭২ সালে কুঠিঘাটায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারেও তাঁর অবদান ছিল। 'ববানগর হিন্দু স্কুল' বা পরবর্ত্তীকালের বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি যে যথেষ্ট বিত্তশালী মানুষ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এঁদের আদি বাড়ী চব্বিশ পরগনায় বারাসতের কাছে বাদুতে। মদনবাটী, বন্দীপুর প্রভৃতি স্থান ছিল এঁদের মৌজা। এঁরা বর্ধমানের মহারাজা এবং চকদীঘির সিংহরায়দের কাছ থেকে খাজনা পেতেন। এই গোলকধাম প্রায় ৩ বিঘা জমির ওপর স্থাপিত হয়। খুবই বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, এই বাড়িতে মোট ১০০টিরও বেশী ঘর আছে। শোনা যায়, কী এক ব্যাপারে দান সংগ্রহের জন্ম বিদ্যাসাগর নাকি এই বাড়িতে এসেছিলেন। তবে, এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ হয়নি। এই বাড়িতে বহু প্রাচীন নারায়ণ বিগ্রহ আছে।

আলমবাজারে চ্যাটার্জী বাড়ি

দেশবন্ধু রোডের যে অংশ আলমবাজারের অন্তর্গত, সেখানে ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ নম্বর বাড়ীগুলিই চাটুজ্জ্যে বাড়ি। আনুমানিক ১৬০ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮২১ সাল নাগাদ এই বংশেরই পূর্বপুরুষ রামরাম চট্টোপাধ্যায়

বরানগরে আসেন। শোনা যায়, উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বরানগরে (আলমবাজার) লাভ করেছিলেন নিঃসন্তান এক বোনের সম্পত্তি। এঁদের আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রাম। এই রামরাম চাটুজ্যের দুই পুত্র রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণ ছিলেন নিঃসন্তান। রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জীরও দুই পুত্র জয়কৃষ্ণ ও বৃন্দাবন। এই দুজনের বংশধরেরাই পরবর্ত্তীকালে উত্তরাধিকার সূত্রে বসবাস ক'রে আসছেন। জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই বাড়িতে এসেছিলেন। কেননা পাশেই দক্ষিণেশ্বর। বর্ত্তমানে এই বাড়িতে যে সুরম্য ঠাকুর দালানটি দেখা যায়, তার নির্মাণকাল ১২০৮। নির্মাণ করেছিলেন জয়কৃষ্ণবাবুর পুত্র কানাইলাল ও বৃন্দাবনবাবুর পুত্র অমূল্যধন। কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতসাধক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে এই বাড়িতে নামকরা ওস্তাদদের সমাগম হত। এই বাড়ির ও তৎসংলগ্ন জমির মোট আয়তন ৯ বিঘা।

রামচন্দ্র বাগচি লেনের বাগচি বাড়ি

প্রায় দেড়শ থেকে দু'শ বছর আগে এই উত্তর বরানগরে পিতাম্বর বাগচির আগমন ঘটে। এই পিতাম্বর বাগচির পুত্র রামচন্দ্র বাগচি। এঁর পুত্র কেদারনাথ, কালোধন। এই বাড়ির অন্যতম আকর্ষণ একটি মঞ্চ। বাড়ির ভেতর এই মঞ্চ এখন আর নেই। সেখানে তৈরী হয়েছে ঘর। কিন্তু একসময় মঞ্চ যে ছিল, যে-কেউ ঘরটির গঠন বৈচিত্র দেখে সে-ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে পারেন। এই মঞ্চ স্থাপন করেন কেদারনাথ বাগচি। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যেই এই মঞ্চ প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্ত্তীকালে এই মঞ্চকে ঘিরে নাটকের আসর জমানোর জন্য কালোধন বাগচিই সচেষ্ট ছিলেন সব থেকে বেশী। যে-আমলে মেয়েদের মঞ্চাভিনয় ছিল নিন্দামন্দের বিষয় সেই আমলেই কেদারনাথের তৎপরতায় এই মঞ্চে হরিমতী নাম্নী জনৈকা অভিনেত্রীকে দেখা গিয়েছিল। এরপর নানা সময়ে এই মঞ্চে প্রচুর নাটক অভিনীত হয়। এই মঞ্চকে ঘিরেই ১৯১১ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর বরাহনগর নাট্য সমাজ। কেদারনাথের সময়ে এই মঞ্চে দৃশ্যাঙ্কনের কাজ করতেন বরানগরনিবাসী প্রখ্যাত যাদুকর গণপতি চক্রবর্ত্তী। এই মঞ্চে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নদী, সাগর প্রভৃতি

সৃষ্টি করা হত। মঞ্চেই দেখানো হত সীতার পাতাল প্রবেশ। বিশ্বামিত্র, রাজা হরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাটক এই মঞ্চে অভিনয়কালীন সময়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। মধু বসুর 'আলিবাবা'তে যিনি আলিবাবার অভিনয় করেছিলেন, সেই বিভূতি গাঙ্গুলিই ছিলেন কালোধন বাগচির অভিনয়-গুরু। কালোধন বাগচির আমলে যখন মিনার্ভা থিয়েটার এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল, তখন মিনার্ভার নাটক মিশরকুমারী বেশ কিছুদিন এই মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। এই মঞ্চে যোগেশ চৌধুরির মত অভিনেতাও মহানিশা নাটকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শুধু নাটকই নয়, এই মঞ্চে মাঝেমাঝেই জমে উঠত সঙ্গীতের আসর। তার সেই সূত্রেই আসেন রাধিকা গোঁসাই থেকে শুরু করে বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অবধি বহু সংগীত সাধক। বছর ১৫/২০ হল এই মঞ্চে নাটক অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। বরানগরের গুটিকয় মানুষের কাছে খুঁজলে এই মঞ্চের পুরনো একটি দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফও পাওয়া যেতে পারে।

আলমবাজারে বিনোদলাল ঘোষের বাড়ি

হুগলী জেলার এক অজ্ঞ পল্লীর জনৈক দয়ালচাঁদ ঘোষের পুত্রই বিনোদলাল ঘোষ। বিনোদলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাধানাথ ঘোষ। বিনোদলালের জন্ম আনুমানিক ১৮৪৮ খ্রী। বিনোদলালের বরানগরে আগমন ঘটে তাঁর মাতুলস্থানীয় যদুনাথ ব্রহ্মের দৌলতে। যদুনাথ ছিলেন চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ বারাসতের মানুষ। তিনি বিনোদলাল ও রাধানাথকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেন। বিনোদলাল অল্প লেখাপড়া শিখে বোর্নিও কোম্পানির জুটমিলে চাকরি নেন্। পরে এই জুটমিলেরই এক বড সাহেব গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে বাউরিয়া জুটমিলে বিনোদলালকে নিয়োগ করেন। এর পরই বিনোদলাল ২৭-পরগনার এক ছোটখাটো জমিদার বৃন্দাবন মিত্রের বোনকে এবং রাধানাথ সুখচরের মজুমদার বাড়ির কন্যাকে বিবাহ করেন। ইতিমধ্যে যদুনাথ ব্রহ্ম পরলোকগমন করলে বিনোদলাল রামচন্দ্র বাগচি লেনে যদুনাথের বাড়ি কিনে নেন। অকস্মাৎ রাধানাথও মারা গেলেন। বিনোদলাল ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অতুলচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। ইতিমধ্যে বিনোদলাল আলমবাজার, টালা ও বর্মতলায় প্রচুর জমি ও বাড়ি কেনেন। এক সময়

তিনি বরানগর পুরসভার ভাইসচেয়ারম্যান হয়েছিলেন (১৯০৯-১১)। বাড়িতে অত্যন্ত ঘটা করে দুর্গাপূজা হতো। তার জন্য ছিল বিশাল ঠাকুর দালান। এটি এখনও আছে। বিনোদলাল ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ধার্মিক পুরুষ। এই বরানগর-আলমবাজার অঞ্চলে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিশাল।

মতিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি

বর্তমানে ৩নং নিয়োগীপাড়া রোডে যেখানে গোয়েলের রং-এর কারখানা, তার ভেতরে যে বিশাল, সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি এখনও এই অঞ্চলের শোভা বর্ধন করছে, সেটিই মতিলাল্ মল্লিকের বাগানবাড়ি। এখন প্রশ্ন আসে এই মতিলাল মল্লিক কে ছিলেন? কলকাতার বিভিন্ন মল্লিক বংশের পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধান কালে দু'জন মতিলাল মল্লিকের সন্ধান মেলে। এঁদের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত নিমাইচরণ মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র। এঁরা বড়বাজারের মল্লিক বংশ। এই মতিলাল মল্লিকেরই দত্তকপুত্র হলেন প্রখ্যাত যদুলাল মল্লিক। এই মতিলাল পাথুরিয়াঘাটায় বিশাল এক বাড়ি তৈরী করেছিলেন। বরানগর অঞ্চলে অনেকের ধারণা মতিলাল মল্লিক লেন বুঝি বা এই পাথুরেঘাটার মতিলালের নামেই। কিন্তু তা নয়। নিয়োগীপাড়া ও মতিলাল লেন জুড়ে একসময় যে বাগান ছিল, তার মালিক ছিলেন বর্তমান ২৭৯-এ রবীন্দ্র সরণি, অর্থাৎ পূর্বেকার চিৎপুর রোডের বিখ্যাত ঘড়িঅলা বাড়ির মতিলাল মল্লিক। ইতিহাসে অবশ্য তৃতীয় একজন মতিলাল মল্লিকেরও সন্ধান মেলে। তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী নেতা। এই আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গ অবান্তর। বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত মতিলাল ছিলেন ব্রজবন্ধু মল্লিকের (১৮১০-১৮৬০) পুত্র। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানানো দরকার। পাথুরে ঘাটার মল্লিকেরা হলেন দে মল্লিক। কিন্তু চিৎপুর রোডের এই মল্লিকেরা হলেন শীল মল্লিক। এঁদের আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। সে অবশ্য ইংরেজ যুগের গোড়ার কথা। কোনো নবাবের কাছ থেকেই এঁরা মল্লিক উপাধি পান। ব্রজবন্ধুর দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর পুত্র হলেন মাণিকতলার মল্লিক লজের প্রতিষ্ঠাতা রসিকলাল মল্লিক। দ্বিতীয় স্ত্রীর চার পুত্র গোবিন্দলাল, গোপাললাল, বনমালী ও মতিলাল। মতিলালেরও আবার দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী প্রেমলাল দত্তের কন্যা নয়ন মঞ্জরী দাসী। দ্বিতীয় স্ত্রী ঠনঠনের লালমোহন দত্তের কন্যা সৌদামিনী দাসী।

এঁর তিন পুত্র মদনমোহন, প্যারীমোহন, কাত্তিকমোহন। এই কার্ত্তিকমোহন এখনও জীবিত। ১৯২২-২৩ সাল নাগাদ বরানগরের নিয়োগীপাড়া অঞ্চলের বেশ কিছু অংশ মতিলাল কিনে নেন। এই জমির বেশীব ভাগ অংশ কেনা হয় বিহারীলাল শেঠের কাছ থেকে। বাকী অংশের মালিক ছিল মুসলমান সম্প্রদায়। বর্ত্তমান মসজিদ বাড়ী লেন সংলগ্ন জমিজমা সমস্তই মুসলমানদের ছিল। মতিলাল এই সুরম্য বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন ব্রজকুঞ্জ। বাড়িটি তৈরী করতে সময় লেগেছিল দুবছর এবং দৈনিক প্রায় তিনশো রাজমিস্ত্রী এই বাড়ি নির্মাণের পেছনে তাদের শ্রম দান কবেছিল। বাড়ীটির সংলগ্ন বাগানের এলাকা ছিল প্রায় ২০ বিঘার মত। এই বাগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর অন্তর্গত একটি চিড়িয়াখানা। নানারকমের পশু পাখীর সমাবেশ ঘটেছিল সেখানে। এই সব পশু পাখীর মধ্যে ছিল ভালুক, হরিণ, ম্যানড্রিল প্রভৃতি। পাখীদের জন্যও ছিল একটি নির্দিষ্ট জায়গা। ঘোড়ার আস্তাবলটি ছিল বর্ত্তমান মতিলাল মল্লিক লেনের ৩২ নং প্লটে ঢুকতেই ডানদিকের জায়গাটি। এটি বর্তমানে একটি পরিত্যক্ত কারখানা। এই বাগানের ভেতর ছিল একটি অগভীর হ্রদ। সেখানে খেলা করতো অজস্র রাজহাঁস। 'ব্রজকুঞ্জ' নামের বাড়িটি তৈরী হয়েছিলো মার্বেল পাথরে এবং থামগুলি ছিল করিন্থিয়ান ধাঁচের। বাড়িটি অবশ্য এখনও বেশ সুদৃশ্য অবস্থাতেই রয়েছে। বাড়ির আসবাবপত্র কেনা হয়েছিলো তৎকালীন প্রখ্যাত পুরনো ফার্ণিচার ডীলার ম্যাকেঞ্জি, লাল এ্যাণ্ড কোং থেকে। এবং সমস্ত এলাকা জুড়ে প্রায় ৩০টি মেহগণি গাছ ছিল। ছিল অজস্র সুস্বাদু ফলের গাছ। ১৯৪১ সালে সরকার এই বাড়িতে দমকল বাহিনীর অফিস করেন। ওই সময় থেকেই দমকলের গাড়ীর আসা-যাওয়ার দরুন বাগানটি অনেকাংশে নষ্ট হতে শুরু করে। অবশ্য ১৯৪৭-৪৮ সালে এই বাবদ ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ট্যালবট এ্যাণ্ড কোং কে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি পরিমাপ করানোর পর চারটি প্লটে এই এলাকাকে ভাগ করে বিক্রী শুরু হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১-র মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী হয়ে যায়। এই বাগানবাড়িতে একসময় নির্বাক যুগের অনেক চলচ্চিত্রের শুটিং হয়েছে। সেই উপলক্ষে পেসেন্সকুপার সমেত বহু প্রখ্যাত অভিনেতা এই বাড়িতে এসেছেন। এই বাড়ীতে ১৯২৩-২৪ সাল নাগাদ ১৯১১ সালের শীল্ড জয়ী মোহনবাগান

দলের খেলোয়াড়েরা এক প্রীতিভোজে মিলিত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। এই হলো মতিলাল মল্লিকের বাগানবাড়ির ইতিহাস। কলকাতায় এদের এখনও বহু সম্পত্তি আছে। এঁরা জাতিতে গৌতম গোত্রজ সুবর্ণ বণিক এবং কলকাতার মার্বেল প্যালেসের মল্লিকদের জ্ঞাতি। বেনিয়ান হিসেবে বিদেশ থেকে নানা-রকম জিনিষের আমদানি ও বন্ধকী কারবারই ছিল এদের অর্থাগমের পথ। চিৎপুর রোডে এঁদের ঘড়িওয়ালা বাড়িতেই ১৮৭১ সালে 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে বিখ্যাত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সূচনা হয়। তখন অবশ্য এটি সান্যালদের বাড়ি ছিল।

গঙ্গাধর সেনের বাড়ি

৩ নং গঙ্গাধর সেন লেনের এই বাড়িটি প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। অথচ এই বাড়িটির বয়স আনুমানিক ১০০ বছরেরও বেশী। গঙ্গাধর সেন হলেন মধুসূদন সেনের পুত্র। গঙ্গাধরের আবার চারপুত্র—পাঁচকড়ি, প্রিয়নাথ, সুসারময় ও সুবল। এঁরা জাতিতে তাম্বুলি। এঁদের আদি নিবাস ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা গ্রাম। অবশ্য বর্তমানে সেখানে এঁদের কোন সম্পত্তি নেই। গঙ্গাধর খুব বাল্যকালেই গ্রাম থেকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলকাতায় চলে আসেন। এবং অত্যন্ত অল্প মাইনেতে স্বজাতিরই একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন। এরপর তিনি ইংরেজ সরকারের সৈন্য বিভাগে খাদ্য সরবরাহ করতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষপতি হয়ে ওঠেন। তিনি কাশীতেও শিবমন্দির ও বসতবাটী স্থাপন করেছিলেন। গঙ্গাধর বরানগরে আসেন বাংলা ১২৭৫ সন নাগাদ। যদিও উইলে ১৩০৫ সনের উল্লেখ আছে। এঁর বাড়িটিও ভারী সুন্দর। আগে বাড়ীর এলাকা ছিল সাত বিঘা। এখন কমে দাঁড়িয়েছে দেড়বিঘা। দীর্ঘকাল ধরে এঁদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীগঙ্গাধর জিউ ঠাকুরের নিত্য সেবাদি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

হীরালাল শীলের বাগান বাড়ি

১৮৭৩ সালের ১৫ থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত হিন্দু মেলার যে সপ্তম অধিবেশন হয়েছিলো তার আগে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সহকারী নবগোপাল মিত্রের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত

হয়। সেই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়েছিল মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনটি ছিল এই রকম

আগামী ৬ই ও ৭ই ফাল্গুন
পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনান
নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল
শীল মহাশয়ের বাগানে ঐ মেলা
হইবেক

এই যে নৈনান অঞ্চল, এ যে বর্তমানের নৈনানপাড়া এলাকা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য অতদিন আগে এই অঞ্চল নিশ্চয়ই আয়তনে বিশাল ছিল। নৈনান নামে একটি আলাদা অঞ্চলের অস্তিত্ব অবশ্য বরানগরের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ওম্যালী সাহেবের ১৯০৪ সালে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৮৯ সালে বরানগর ও কামারহাটি পুরসভা পৃথকীকৃত হওয়ার পর বরানগরে চারটি ওয়ার্ড ছিল। সেগুলি হ'ল দক্ষিণ বরানগর, উত্তর বরানগর, দক্ষিণেশ্বর ও বনহুগলি, এবং পালপাড়-নোয়াপাড়া সিঁথি নৈনান নিয়ে একটি ওয়ার্ড। অতএব নৈনান অঞ্চল যে ছিল সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে না। এবং ১৮৭৩ সালে এখানে হিন্দুমেলার অধিবেশন হওয়াও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু হীরালাল শীলের বাগানটি কোথায়? এই বাগান আজ লুপ্ত। হয়ত সেখানে জমেছিল আরও অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসকে খুঁজে বের করা আজ দুঃসাধ্য তবে এটুকু জানানো যেতে পারে যে হীরালাল শীল ছিলেন বিখ্যাত মতি শীলের বড় ছেলে। হীরালালের মা ছিলেন প্রবাদ খ্যাত গৌরী সেনের বংশের কন্যা আনন্দময়ী। হীরালালের চার ভাই ও পাঁচ বোন ছিল। কাশীপুর বরানগর অঞ্চলে হীরালাল শীলের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। তিনিই ভারতবর্ষীয় বীমা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অন্যতম অগ্রনী। এঁর নামে কাশীপুর চিৎপুর অঞ্চলে গঙ্গার একটি ঘাটও রয়েছে। একটি কথা নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে পারে, নৈনান অঞ্চলে তাঁর বাগানে হিন্দু মেলার অধিবেশন উপলক্ষ্যে নিশ্চয়ই ঊনবিংশ শতাব্দির বহু চিন্তাবিদের আগমন ঘটেছিল।

মূক ও বধির বিদ্যালয়ের বাড়ি

বর্তমানে নবপল্লীতে যে মূক ও বধির বিদ্যালয় আছে, সেই বাড়িটি কিন্তু বহুদিনের। ঠিক কবে এই বাড়ি তৈরী হয়েছিল, জানা যায় না। তবে এর বয়স একশোর বেশী নয়। কারুর মতে এই বাড়ির মালিক ছিলেন পাথুরে ঘাটার ঠাকুর পরিবার। আবার কেউ কেউ বলেন এটি ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সম্পত্তি। কোন্ ধারনা সঠিক বলা মুশকিল। কেননা বরানগর অঞ্চলে পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রচুর সম্পত্তি দিল। আবার এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যে অনেকবার এসেছেন, সে ব্যাপারে মস্ত বড়ো প্রমাণ এই অঞ্চলের প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণদের বিবরণ। তাঁরা অনেকেই দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই বাড়ির বারান্দায় বিশাল ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। প্রায়শই তাঁর সঙ্গে থাকতেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। রবীন্দ্রনাথের বাসকালীন অবস্থায় নজরুলও এ বাড়িতে কয়েকবার এসেছিলেন। তবে এই ঘটনা কুড়ি বা ৩০'র দশকের আগেকার নয়। ঐ সময়ে এই বাড়ির সংলগ্ন এলাকাও ছিল বিশাল। বেশ কয়েকটি বড়ো পুকুর ছিল। এবং বাড়ির মূল নম্বর ছিল ২৬৫। এই বাড়িটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অবশ্য এটা জানা যায় যে, ঠাকুরদের কাছ থেকে এই বাড়ি কেনেন মহম্মদ জ্যাকারিয়া। এর নামেই কি জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট? হবেও বা। জ্যাকারিয়া সাহেব এই বাড়ি কিনেছিলেন অবসর বিনোদনের জন্য। তিনি ছিলেন গুজরাটী মুসলমান। মশলার ব্যবসা ছিল তাঁর। তিনি এই অঞ্চলের মানুষদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। স্থানীয় অঞ্চলে জলের অভাব দেখা দিলে তাঁর কর্মচারী ঢ্যারা পিটিয়ে বলে যেত যে, সাহেব অনুমতি দিয়েছেন সকলে যেন তাঁর পুকুর ব্যবহার করে। ত্রিশের দশকের শেষ দিকে জ্যাকারিয়া তাঁর সম্পত্তি সিঁথি নিবাসী ফকির ঘোষকে বিক্রী করে দেন। ফকির ঘোষ আবার এই জমি টুকরো হিসাবে পরবর্তীকালে বিক্রী করেন। এই সময়ে এই বাড়ি ক্রমশই সমাজবিরোধীদের আড্ডাস্থলে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। অবশেষে নানা হাত বদলের মাধ্যমে এই বাড়ির মালিক হন বরানগরবাসী প্রখ্যাত শিল্পপতি দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পিতা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য। কিন্তু বাড়িটি মূক ও বধির বিদ্যালয় হলো কিভাবে? ১৯৩০ সালের ১৭ই জুলাই ৪নং হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে মাখনলাল মজুমদার শ্যাম

বাজার মূক ও বধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু যথেষ্ট জায়গার অভাবে এই বিদ্যালয় প্রথম ১২ বছরে মাত্র কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দান করেছিল। এরপর ১৯৫২ সালের ৩রা মার্চ বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয় ১২/২এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে। কিন্তু ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে যখন ছাত্র সংখ্যা বেড়ে সত্তর হলো তখন ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস বা হস্টেলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এবং তখনই বর্তমান ২৬৫/১৯, গোপাললাল ঠাকুর রোডের ঠিকানায় মাসিক ২৫০ টাকা ভাড়ার ভিত্তিতে এই বিখ্যাত বাড়িটিতে মূক ও বধির বিদ্যালয় তার কাজ শুরু করে।

টেগোর ভিলা

আলমবাজারের মুখ থেকে সূর্য্য সেন রোড ধ'রে গিয়ে পি ডবলিউ ডি রোডে পড়বার মুখে বাঁদিকে যে বাড়িটিতে এখন বি. এস. এফের অফিস, সেই বাড়িটির আসল নাম টেগোর ভিলা। টেগোর নাম করলেই এটা পরিষ্কার যে, একদা এই বাড়ির মালিক ছিলেন ঠাকুর পরিবার। এই ঠাকুর পরিবার ছিলেন পাথুরিয়া ঘাটার। বর্তমানে এই বাড়িটির ভেতরকার দৃশ্যাবলী দেখার সৌভাগ্য হয়ত অনেকেরই হয়নি। কিন্তু একসময় এই টেগোর ভিলা তার মনোরম সৌন্দর্যের জন্য ক'লকাতার বিখ্যাত বাগানবাড়িগুলির অন্যতম ছিল। এই বাগান বাড়িটির ঐতিহাসিক পর্ব শুরু হয়েছিলো একটি নীলচাষের কুঠি হিসাবে। সে প্রায় দু'শ বছর আগেকার কথা। তার পরবর্তীকালে এই বাড়িটির মালিক হন গোপাললাল ঠাকুর। এবং মূলত রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের আমলেই এই বাগান বাড়িটি আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও সুসজ্জিত আকার ধারণ করে। একসময় এই বাগানবাড়ির অভ্যন্তরে ছিল নৌকাবিহারের জন্য সর্পিল হ্রদ। ছিল এক বিস্তৃত গাড়িবারান্দা যার পাশে আজও আছে মেহগনি কাঠের সিঁড়ি। অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটি আলোকিত হত পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ লুইএর আমলের বাতিদানে। দেওয়ালে ঝুলত পরিবারের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি। এঁরা অনেকেই ছিলেন বাংলার ইতিহাসে স্বনামধন্য। বাড়িটির পারিপার্শ্বিক জুড়ে বেষ্টিত বাগানে গোলাপ ও অর্কিডের বিপুল সমারোহ, বাগানের সম্মুখভাগে চৈনিক কায়দায় নির্মিত তোরন প্রভৃতি ছিল সত্যই দৃষ্টি নন্দন। স্বল্পায়তনের এই বাগানটির ভেতরকার ছোট সেতুগুলি নির্মিত হয়েছিল বহুমূল্য অলঙ্কৃত মার্বেল

পাথরে। বাগানজুড়ে অজস্র মূর্তি আজও বাড়িটির শোভাবর্ধন করছে। যদিও ক্রমশই প্রাক্তন জৌলুশ মুছে যাচ্ছে, তবু বাড়িটির ভেতরে পদার্পণ করলে একঝলক উনিশ শতকী বাতাস যেন আজও গায়ে এসে লাগে।

একটি অনাবিষ্কৃত বাড়ি

আজ বরানগরের যে অঞ্চলকে ময়রাডাঙ্গা বলা হয়, দেড়শো বছর আগেও এই একই নামে অঞ্চলটির অস্তিত্ব ছিল। আর ঐ সময়ে এই অঞ্চলে এক হতভাগ্য যুবরাজ নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় একটি বাড়িতে দিনাতিপাত ক'রতে ক'রতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। ঐ যুবরাজের মর্মন্তুদ কাহিনী বিবৃত আছে বঙ্কিমভ্রাতা 'পালামৌ' খ্যাত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জাল প্রতাপচাঁদ" গ্রন্থে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হুগলির আদালতে প্রতাপচাঁদের মামলাটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রতাপচাঁদ ছিলেন বর্ধমান রাজ পরিবারের রাজকুমার। তাঁর মাতুল (বিমাতার ভ্রাতা) জনৈক পরানচন্দ্রের কূট-কৌশলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে বিতাড়িত হন। এ হলো ১৮২০ সালের ঘটনা। এরপর ১৮৩৫ সালে এক সন্ন্যাসী বর্ধমানে এসে নিজেকে প্রতাপচাঁদ হিসাবে দাবি করেন। রাজবাড়ির ব্যক্তি থেকে শুরু ক'রে অনেকেই এই প্রতাপচাঁদকে চিনতে পারেন। এমনকি কলকাতা ও শহরতলীর অনেক জমিদার এঁকে প্রতাপচাঁদ ব'লে স্বীকৃতি দেন। এরপর আদালতে মামলা ওঠে। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ন্যায় বিচারের অনীহা এবং আদালতে পরাণবাবুর উৎকোচ সরবরাহের ফলে প্রতাপচাঁদ ওই মামলায় পরাজিত নন। এরপর নানা মিথ্যা অভিযোগে বেশ কিছুদিন তিনি হুগলির জেলে বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এই ঘটনার পরে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণও পুনরায় প্রতাপচাঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে অসম্মত হন। এইসব ঘটনার পর জীবনের শেষ পর্বে প্রতাপচাঁদ বরানগরে আসেন। সঞ্জীবচন্দ্র লিখছেন "মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্বে তিনি কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল :ছিল না॥ অর্থেরও কিছু অনটন হইয়া থাকিবে কেন না, বাটীর ভাড়া একেবারে দিতে পারেন নাই। এই সময় বোধহয়, তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন, তাই আপনাকে একা

বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, এক থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করিতেন। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতেন। যাঁহারা আসিতেন, কাতরভাবে তাঁহাদের বলিতেন, "আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।"

এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙা পল্লীতে একটি সামান্য বাটীতে দুই তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।" সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বহু চেষ্টা করেও, প্রতাপচাঁদ যে বাড়িতে থাকতেন, তার হদিশ মেলেনি। বর্তমান ময়রাডাঙা অঞ্চলে ১৫০ বছর আগেকার বাড়ি গুটিকয় মাত্র। তাছাড়া সেই আমলে ময়রাডাঙার সীমানা সম্পর্কে ধারণা করাও কঠিন। তাই যে-বাড়িতে প্রতাপচাঁদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই বাড়িটি অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল। যদিও এই অঞ্চলে যাঁরা দীর্ঘকাল ধ'রে বংশপরম্পরায় বাস করছেন, তাঁরা অনেকেই, প্রতাপচাঁদের ঘটনাটি শোনামাত্র দাবী করতে শুরু করেন, প্রতাপচাঁদ তাঁদের বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু তথ্য হীন বলে কোন দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয় নি।

মুন্সিবাড়ি

বরানগরের প্রাচীন অট্টালিকাগুলির অন্যতম এই মুন্সিবাড়ি। শুধু অট্টালিকা বললে ভুল বলা হবে, এ এক জনস্থানমধ্যবর্তী প্রাসাদোপম ইমারত। ধারণা হয়, গঠনবৈচিত্রে অনুপম ও আয়তনে বিশাল এই অট্টালিকার ইট কাঠ-পাথরে এমন ইতিহাস আজও বন্দী হ'য়ে আছে, যা প্রকাশ পেলে ইতিহাসপ্রেমী মানুষমাত্রেই তৃপ্ত হবেন। ঐ বন্দী ইতিহাসকে উজানী ক'রে তোলার চেষ্টায় আমাদের কোন ত্রুটি ছিল না। তবে, এই অট্টালিকার বর্তমান বাসিন্দাদের কাছ থেকে এমন কোন নথিপত্র বা গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি যার সাহায্যে অতীতকে স্পর্শ করা যায়। অবশেষে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীতে একটি গ্রন্থের সন্ধান মেলে। বহু চিত্রশোভিত, সুদৃশ্য এই গ্রন্থটির নাম Glimpses of Bengal; রচয়িতা A. C. Campbell; প্রকাশকাল ১৯০৭।

এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নাম "The Munshi 'House' of Taki and Barahanagar (পৃষ্ঠা : ১২৪)। আমাদের বর্তমান অংশটি মূলত ক্যাম্পবেলের বর্ণনার ভিত্তিতেই রচিত।

সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে উচ্চ-বর্ণের কুলীনদের অন্যতম ভবানীদাস রায় চৌধুরী খুলনা জেলায় ইছামতীর পূর্বপাড়ে শ্রীপুর গ্রামে যে বিরাট জমিদারীর মালিক ছিলেন, তা কালক্রমে, তাঁরই উত্তরপুরুষ রঘুনাথের সময়ে টাকীতে স্থানান্তরিত হয়। এরপর নানা ঘটনাচক্রে বিবর্তনের পর এই পরিবারের রামকান্ত রায় চৌধুরী পলাশীর যুদ্ধের সময় বহু সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। রামকান্ত ছিলেন ফার্সী ভাষায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তি। হঠাৎ নানারকম বিরোধের সম্মুখীন হয়ে রামকান্ত কলকাতায় এসে ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গানন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সরকারী দফতরে করনিকের কাজ পান। এই সময় হেষ্টিংস রামকান্তের যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'মুন্সী' পদে উন্নীত করেন। তিনি সদ্যগঠিত বোর্ড অফ রেভিনিউর সেটেলমেণ্ট অফিসার হিসাবেও কাজ চালিয়েছিলেন। এই সময়েই হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদে থেকে রাজধানী কলকাতা স্থানান্তরিত করেন। রামকান্ত তাঁর জীবদ্দশাতেই বরানগরে একটি নিবাস তৈরী করেছিলেন (বর্তমান বাড়িটি নয়)। সম্ভবত এটি ছিল বরানগর মুন্সির মাঠের পূর্বতন গৃহটি। রামকান্তের মৃত্যুর (১৭৪১-১৮০১) পর তাঁর পুত্র শ্রীনাথের ওপর মুন্সি এস্টেটের ভার পড়ে। ১৮১৩ সালের পর এই ভার গ্রহণ করেন শ্রীনাথের সহোদর গোপীনাথ। তৎকালীন কলকাতায় কায়স্থ-সমাজের তিনি ছিলেন একজন প্রতিভূ। গোপীনাথের সফল উদ্যোগে মুন্সিদের জমিদারী একটি শক্ত জমির ওপর স্থাপিত হয়। ১৮২২ সালে মারা যাবার সময় গোপীনাথ নগদ বাইশ লক্ষ টাকা রেখে যান। তিনি একটি উইল মারফৎ তাঁর সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র কালীনাথকে অর্পণ করেন। বাংলাদেশের জমিদারদের পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে ধর্ম ও দান-সাহায্যের প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। অনেকক্ষেত্রেই ধর্মীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অর্থ-বস্ত্র-অন্ন বিতরণ ছিল জমিদারকুলের একটি প্রচলিত সংস্কার, যা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি মনস্তাত্ত্বিক সোপান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। কালীনাথও বরানগরে বাসকালীন অবস্থায় মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গায় আগত স্নানার্থীদের মধ্যে অন্ন বিতরণ

করতেন। সম্ভবত জমিদারশ্রেণীর মহিমা-কীর্তনই ক্যাম্পবেলের উদ্দেশ্য ছিল, তাই তিনি কালীনাথের দান-প্রসংগে লিখছেন, "There was another gift for which Kalinath and his brother were held in high esteem by his fellow countrymen"; যাই হোক, কালীনাথ একজন সংগীত সাধকও ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের বিরোধিতা সত্বেও ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনে কালীনাথ ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সে কারণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের নথিপত্রে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাশাপাশি কালীনাথেব নামও পাওয়া যায়। কালীনাথ মারা যান ১৮৪০ সালে। কালীনাথের পর এই পরিবারের অন্যতম পুরুষ রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী তাঁর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যথেষ্ট মান্য ছিলেন। এক সময় এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে চিৎপুর এলাকার দরিদ্র মানুষদের বাড়িঘর বিনষ্ট হলে, বৈকুণ্ঠনাথ ঐসব মানুষদের বিপুল অর্থ সাহায্য করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭৫ সালে। এই পরিবার এরপর দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। একটি পরিবার বৈকুণ্ঠনাথের ভাই মথুরানাথ এবং কৃষ্ণনাথের এবং অন্যটি গোপীনাথের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথের। প্রিয়নাথের পুত্রেরা, যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথের বহু সম্পত্তি হাতছাড়া হয়। স্যার অ্যাসলে ইডেন নরেন্দ্রনাথকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দান করেন। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে ১৮৮৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে মথুরানাথের পুত্রদ্বয় সুরেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ বহু সম্পত্তির মালিক হন। কিন্তু আঠাশ বছর বছর বয়সে ১৮৮৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তিনি বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মুন্সিদের বর্তমান বাড়িটির নির্মানকাল ১৮৫৫ সালে হলেও ১৮৮৫ সালে সুরেন্দ্রনাথই এই বাড়িটিকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন। একসময় এঁদের পুরনো বাড়িতে 'আত্মোন্নতি বিধায়ণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে পরাজিত হন। যতীন্দ্রনাথও নানা সূত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তিনি একসময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মনোনীত হন।

গঙ্গার তীরবর্তী, রায় মথুরানাথ চৌধুরী লেনের এই মুন্সিবাড়ির প্রাচীন

কাঠামোটি আজ জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে আসছে। তবু, আজও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকু অংশে কান পাতলেও বরানগরের অতীত-স্বরলিপিকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

ডাচকুঠি

বঙ্গদেশ যখন ডাচ-শাসনাধীন, সম্ভবত সেইসময় থেকেই কুঠিয়ালদের আবির্ভাব হয়। আর এই কুঠিয়ালদের বাসস্থানকেই 'কুঠি' বলা হতো। নানা-ধরনের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও কুঠিগুলি ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে নীলকুঠিগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদের আলোচ্য বাড়িটির নাম ডাচ-কুঠি ও তৎসংলগ্ন এলাকার নাম কুঠিঘাট। এই দুটি ঘটনা যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। বরানগর একসময় ডাচেদের অধীন ছিল (দ্র. দেশ-কাল পরিচিতি ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিতর্ক; ইতিহাস)। একারণে বরানগরে ডাচেদের কুঠি হওয়াও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। বি. কে. মৈত্র রোডের ৮১, ৮১এ, ৮১বি ও ৮২ নম্বর বাড়িগুলিই ডাচ-কুঠির অনুষঙ্গ বহন করছে। বাড়িটির গায়ে একটি ফলকে লেখা আছে

> This house was the residence
> of Dutch Governor when
> Baranagar was under Dutch
> Possession.

এই ফলকটি কোন্ কালে লাগানো হ'য়েছিল, তা জানা যায় না। তবে, অনেকের যে ধারণা আছে ফলকটি ডাচেদের আমলে বসানো হয়েছিল, তা ভুল। মনে হয় এই বাড়িটির বর্তমান মালিকদের পূর্বপুরুষ বা তাঁদেরও পূর্বতন কোনও ব্যক্তি এই ফলকটি লাগান। ফলকটি ডাচেদের আমলে লাগানো হলে বাক্যটি অতীত-কাল জ্ঞাপক 'was' শব্দ দিয়ে গঠিত হতো না। ফলকটির অক্ষর-বিন্যাস দেখেও মনে হয়, এটি ডাচ পরবর্তী কোনো সময়ের। অবশ্য এ-সব অপ্রাসঙ্গিক বিতর্ক। বাড়িটি সম্পর্কে যেটি সবচেয়ে জ্ঞাপনীয় বিষয়, তা হলো এই বাড়িটির কোন ইতিহাস আমাদের আয়ত্তাধীন হয়নি। বাড়িটির বর্তমান

মালিক বিখ্যাত বস্ত্র-ব্যবসায়ী জহরলাল-পান্নালাল পরিবার। এঁদের কাছে নথিপত্র কিছু নেই বললেই চলে। তবে এঁদের পবিবারের স্বনামধন্য হরিধন দাঁ মহাশয় প্রায় আশি-নব্বুই বছর আগে এই বাড়িটি কেনেন। এই পরিবার ঐ সময় এখানে আবও কয়েকটি বাড়ি ক্রয় করেন। দাঁ-মহাশয় ক্রীত অন্য বাডিগুলি ডাচ কুঠি নয। কিন্তু স্থানীয় অনেকের ধারণা সবগুলিই ডাচ-কুঠি। কিন্তু তা হবে কেন? যেটিতে ডাচেরা বসবাস করতো সেটিই ডাচ-কুঠি। অন্যগুলি দাঁ পরিবাবের বাড়ি। হরিধন দাঁ ডাচ কুঠিটি কার কাছ থেকে কেনেন, তা জানা যায় না। তবে, এই এলাকার বহু বৃদ্ধ মানুষদেব মুখে শোনা গেছে, বাড়িটি কেনা হয়েছিল টালার চাটুজ্জেদের কাছ থেকে। এ সম্পর্কে কোন নথিপত্র পাওযা যায় নি। হরিধন দাঁ এর আর এক সহোদর ভাই শিবকেদার দাঁ। এঁদের পিতৃদেব বামেশ্বব দাঁ-এর নামানুসাবে কাশীপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের নাম হয় 'রামেশ্বর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ডাচ-কুঠিব ইতিহাস অজানা থেকে গেলেও এই বাডিটি সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। বস্তুত পূর্বতন ডাচ-কুঠিটি আয়তনে আরও বড ছিল। শোনা যায় এই বাডি থেকে গঙ্গা পর্যন্ত লম্বা গুপ্ত টানেল ছিল। বাডির ভেতরে মাটির তলায় ছিল বিশাল ঘর। ডাচ কুঠিটির গঠন-বৈচিত্র্যটিও সকলেরই চোখে পড়বে। সচবাচর পুরনো আমলের এই ধরনের বাড়ি চোখে পডে না। রাস্তা থেকে প্রায় ৬ কি ৭ ফুট উঁচুতে থাকা বাডিটি ছিল খিলেনের ওপর নির্মিত, ফলে বাড়িটির নীচ দিয়ে এক-প্রান্ত থেকে অপর-প্রান্তে যাওয়া যেত। বাড়িটি এখনও যথেষ্ট মজবুত অবস্থায় দাঁডিয়ে।

ভবিষ্যতে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে কেউ যদি এই বাড়িটির ইতিহাস খুঁজে বের করেন, তাহলে একটি দুরূহ কাজ সম্পন্ন হবে।

বরানগরের প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

[বরানগরের মত একটি বিশাল এলাকায় ছোট-বড় নানাধরনের বহু প্রতিষ্ঠানের সহাবস্থান সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে প্রাচীনত্বের মাপকাঠিতে পুরাতন প্রতিষ্ঠান, তেমনই রয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণাকেন্দ্র। আবাব এমন প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিও চোখে পড়ে, সমস্তরকম প্রচার থেকে দূরে থেকে দিনের পর দিন চলছে যাদের নীরব কর্মসাধনা। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশী। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস রচনা করতে হলে একটি আলাদা গ্রন্থ প্রণয়ন করতে হয়। একারণে বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছি, যেগুলি জনস্বার্থের সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট অথবা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক গবেষণায় যাদের ইতিহাস অপরিহার্য হতে পারে, তাদের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের পাঠ-শেষে একটি সম্পূর্ণ ইতিহাসের স্বাদ থেকে পাঠকেরা যদি নিজেদের বঞ্চিত মনে করেন, তাহলে একটি কথা স্মরণ রাখতে তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে—বর্তমান অধ্যায়টি কোন অর্থেই প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘ ইতিহাস নয়, এটি বস্তুত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা প্রতিষ্ঠান পরিচিতি মাত্র। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যেকোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস-প্রাপ্তির ঘটনাটি অনেক সহজে সম্পন্ন হয়। সেকারণে আশা করা যেতে পারে, ভবিষ্যতে এইসব প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব দপ্তরের নথিপত্রে সংরক্ষিত হবে। একথা মনে রেখেই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা থেকে আমরা বিরত থেকেছি। যদি কোনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কোন উদ্যোগী কর্মবীরের কথা বাদ গিয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে নিতান্তই তথ্যের ভ্রান্তিজনিত ঘটনায়। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে নানা অসুবিধা ও পরস্পর বিরোধী মতামতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্য

এবং ইতিহাস-সম্বলিত স্মারক-পুস্তিক আমাদের হাতে তুলে দিতেও বহুক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য যাঁরা আমাদের সঙ্গে অকৃপণ সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি বরানগরবাসীর পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞ।

বর্তমান অধ্যায় থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে বাদও দেওয়া হয়েছে। কেননা এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক পর্বের কথা 'ইতিহাস'-এর কয়েকটি অধ্যায়ে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। যথা পাঠবাড়ি, বরানগর ও আলমবাজার মঠ (ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ও প্রবাহ), রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয় (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারত শ্রমজীবী)। শতবর্ষ অতিক্রান্ত রামেশ্বর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরানগর ভার্ণাকুলার ও বনহুগলী বঙ্গ বিদ্যালয়ের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের হাতে আসেনি। আশা করি সচেতন পাঠক এর যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন।]

বরানগর পুরসভা

বরানগরে প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল হলো বরানগব পুরসভা। বরানগরের প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে এই পুরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটির বয়সও ১১২ বছর অতিক্রান্ত। তবে, আজ যা বরানগর মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৮১ সালের আগে তার নাম ছিল 'নর্থ সুবার্বণ মিউনিসিপ্যালিটি'। আর ওই মিউনিসিপ্যালিটির জন্ম ১৮৬৯ সালে। তার আট বছর আগেই 'কাউন্সিল অ্যাক্ট' গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাজের একটি নতুন ধারার সূচনা মুহূর্তেই নর্থ সুবার্বণ মিউনিসিপ্যালিটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৬৪ সালে বাংলা দেশের সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইন অনুযায়ী গঠিত পঁচিশটি পুরসভার মধ্যে নর্থ সুবার্বন মিউনি-সিপ্যালিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশের ইতিহাসে ওই সময়টি ছিল একটি যুগ সন্ধিক্ষণ। ব্রিটিশ শাসকবর্গ তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে প্রশাসনের ক্ষেত্রে নতুন রীতি প্রবর্তনের চেষ্টায় সক্রিয়। দুঃখের বিষয় এই পুরসভার তৎকালীন কোন বিবরণী ও দলিল খুজে পাওয়া যায় না। ১৮৮৫ পর্যন্ত এই পুরসভার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া না গেলেও ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়

বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটী।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে ইংরাজী ১৯৩৪ সালের আগামী ২৯শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে নূতন কমিশনর নির্ব্বাচন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডের জন্য নির্ব্বাচনের যে যে স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নির্ব্বাচনের জন্য যে শেষ সময় লিখিত হইল ঐ সময় অতীত হইলে কোন ভোটারকে যে বাটীতে অথবা নির্দিষ্ট ঘেরা জমির মধ্যে নির্ব্বাচন হইবে ঐ বাটীতে অথবা ঐ নির্দ্দিষ্ট ঘেরা জমির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। যাঁহারা উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত বাটীতে বা নির্দ্দিষ্ট ঘেরা জমির মধ্যে প্রবেশ করিবেন কেবল তাঁহাদেরই ভোট লওয়া হইবে।

ওয়ার্ড নং	নির্বাচনের স্থান	নির্বাচনের সময়	
১নং ওয়ার্ড	বরাহনগর ভিক্টোরিয়া এইচ, ই, স্কুল	পূর্বাহ্ণ ৭টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত	১
২নং ওয়ার্ড	বরাহনগর মিউনিসিপ্যাল সেন্ট্রাল আফিস	পূর্বাহ্ণ ৭টা হইতে অপরাহ্ণ ৬-৩০ পর্য্যন্ত	২
৩নং ওয়ার্ড	৫৫নং হেষ্টি রোডস্থ বাবু সুবোধচন্দ্র নিয়োগীর খালি জমি (হোল্ডিং নং ৭৮, সার্কেল নং ৩)	পূর্বাহ্ণ ৭টা হইতে অপবাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত	৩
৪নং ওয়ার্ড	সিঁতি শিক্ষায়াতন ইউ, পি, স্কুল আটাপ'ড়া	পূর্বাহ্ণ ৭টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত	৪

দ্রষ্টব্য :—প্রতি ওয়ার্ডে বেলা ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত টিফিনের জন্য এক ঘণ্টা ভোট লওয়া বন্ধ থাকিবে।

বরাহনগর মিউনিসিপ্যাল আফিস,
১৯৩৪ সাল ২০শে মার্চ

অক্ষয়কুমার মুখার্জ্জী
চেয়ারম্যান
বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটী।

Arundhaty Printing Works, Barnagore.

১৮৮৫ সালে এই পুরসভায় ২১ জন প্রতিনিধি ছিলেন। এঁদের মধ্যে ১৩ জন নির্বাচিত ও ৮ জন মনোনীত। পুরসভায় তখন মোট ওবার্ড ছিল ৬টি। নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন সতীশচন্দ্র রায় ও অতুলকৃষ্ণ বসু (১নং ওয়ার্ড), সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ারীমোহন মিত্র, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২নং ওয়ার্ড) নিমচাঁদ মৈত্র, রায় প্রসন্নকুমার ব্যানার্জী বাহাদুর, পূর্ণচন্দ্র সরকার (৩নং ওয়ার্ড), শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র মিত্র, (৪নং ওয়ার্ড) ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় (৫নং ওয়ার্ড), রামকালী মুখোপাধ্যায় (৬নং ওয়ার্ড)। মনোনীত সদস্যেরা হলেন গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিহারীলাল পাল, বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাদেব ঘোষাল, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ দত্ত। কলিকাতা গেজেট থেকে আরও জানা যায়, যে সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বরানগর পুরসভার প্রথম বাঙালী পুরপ্রধান। ৮৯৮ সালে পুর-প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ১৮৯৯ সালে কামারহাটি এলাকাটি বরানগর থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। এবং একটি স্বতন্ত্র পুরসভা হিসাবে গঠিত হলো। ফলে পুর-সভার জনসংখ্যা ও করদাতার সংখ্যাও হ্রাস পেল। বরানগর পুরসভার ৬ জন নির্বাচিত এবং ৩ জন মনোনীত সদস্য মিলিয়ে কমিশনার বোর্ডের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল নয়-তে। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ওম্যালী সাহেবের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে দেখা যাচ্ছে ঐ সময়ে বরানগর পুরসভার মোট কমিশনার ৯ জন। যদিও দেখা যাচ্ছে যে ঐ সময়ে বরানগর পুরসভায় স্থানীয় সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তিদের প্রাধান্য এবং তাঁরা সকলেই বাঙালী, কিন্তু ১৯২৫ সাল অবধি পুর-দলিলে বিদেশী পৌর প্রধানদের নামও পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৮২ সালে লর্ড রিপনের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের ঘোষণার প্রতিফলন হিসাবে ১৮৮৪ সালে বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন প্রকাশিত হয়। এই আইনে জনপ্রতিনিধিদের কথা বলা হয়। বরানগরে বিদেশী পুর প্রধানদের নাম দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে, বরানগর যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজ প্রভাব অধ্যুষিত একটি অঞ্চল ছিল। শ্বেতাঙ্গ পুর প্রধানগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন স্থানীয় জুটমিলের মালিকবর্গ। এবং সম্ভবত একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জুট-মিলের ওপর পুরসভার নির্ভরতাও ছিল অনেক বেশী। স্থানীয় প্রশাসনে শ্বেতাঙ্গ

প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে ১৯২৩ সাল থেকে। ১৯২৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পৌরপ্রধান হন প্রাণকৃষ্ণ সাহা। এর দু বছর আগে, ১৯২১ সাল থেকেই গোপন ব্যালট প্রথা চালু হয়। ১৯২৩ সাল থেকে ক্রমশই বরানগর পুরসভার কাজের দায়িত্বও বাড়তে থাকে। নানা সমস্যায় ক্লিষ্ট অঞ্চলটির স্বার্থ রক্ষায় পুরসভার বিরাট ভূমিকা কার্যকরীভাবে অনিবার্য হয়ে পড়ে। ক্রমশ চালু হয় বরানগর-কামারহাটি যৌথ জলকল প্রকল্প ও নানা উন্নয়নমূলক কাজ। ১৯৪৭ সালে নমিশেন প্রথা বিলুপ্ত হয়। ফলে সদস্য সংখ্যাও কমে যায়। ১৯৪৯ সালে বরানগরের পুরসভা থেকে দক্ষিণেশ্বর মৌজাকে পৃথক করা হয়। এরপর ১৯৫২ সালে এল পুর নির্বাচন। সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৯ এবং বামপন্থী ও প্রগতিশীল নাগরিকদের নিয়ে গঠিত হলো কংগ্রেস-বিরোধী সংযুক্ত নাগরিক সমিতি। ১৯৬৫ সালের ১লা মার্চ থেকে পুরসভার পরিচালনভার সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে আসে এবং নির্বাচিত বোর্ড বাতিল হয়। ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসককে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর '৬৭ সালের ১৭ই জুন পুর-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হলো। এছাড়া ঐ সময় থেকে পূর্বেকার ৪টি ওয়ার্ডের বদলে গঠিত হলো ২০টি ওয়ার্ড এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য রইলেন এক একজন কমিশনার। ঐ নির্বাচনে ২৯টি আসনের মধ্যে ২২টি আসন অধিকার করে সংযুক্ত নাগরিক সমিতি। অবশ্য সমিতি পুর বোর্ড গঠন করে ১৯৬৯ সালের ২৪শে জুলাই। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ঐ বোর্ডই কার্যভার চালায়। কিন্তু ১৯৭২ সালে রাজ্যের সমস্ত পৌর বোর্ডগুলি বাতিল হয়। '৭২ থেকে' ৭৭ অবধি শাসনভার চালান সরকার কর্তৃক মনোনীত পুর প্রশাসক। আবার ১৯৭৭ সালে জনপ্রতিনিধিত্বের নিয়ম চালু হয়। ১৯৮১'র মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করে। সংক্ষেপে এই হলো বরানগর পুরসভার প্রশাসনের ইতিহাস। পুরসভা-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য বর্তমান গ্রন্থের 'সমীক্ষা' অংশের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট

২০৩, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড কলি—৩৫

বিজ্ঞান চর্চার একটি অন্যতম আন্তর্জাতিক কেন্দ্রভূমি হিসাবে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট বা সংক্ষেপে আই, এস, আই আজ সারা বিশ্বে অতি পরিচিত নাম। বরানগরে এমন একটি সংস্থার উপস্থিতি স্থানটির গুরুত্ব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। আই, এস, আইকে ঘিরে আজ যে ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পরিধি রচিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তার শুরুর ইতিহাসটি খুঁজে পেতে হলে ফিরে যেতে হবে পঞ্চাশ বছর আগে।

১৯২১ সাল। প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কিছু উদ্যোগী গবেষকের সাহায্যে স্ট্যাটিসটিক্যাল ল্যাবোরেটরী নামে একটি সংস্থার সূচনা করেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ নিখিলরঞ্জন সেন ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সভায় (সভাপতি ছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) আই. এস. আই প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রেশন হয়। প্রথম সম্পাদক হন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ। ১৯৩৪ সালে সংস্থার উপর কৃষিঋণ ও তাঁতশিল্প সম্পর্কে সমীক্ষা প্রণয়নের দায়িত্ব পড়ে। ১৯৪১-৪২-৪৩ সালে পাট উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ ও জমির ফলন নির্ণয় সংক্রান্ত নমুনা সমীক্ষাও আই. এস. আই-এর অধীনে গৃহীত হয়। ক্রমে ক্রমে আদম-শুমারি থেকে শুরু ক'রে নানা বিষয়ে নমুনা সমীক্ষার কাজে আই. এস. আই-এর দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৯৪৯ সালে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ভারত সরকারের অবৈতনিক পরিসংখ্যান উপদেষ্টার পদে যোগ দেন। অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ক্রমিক নমুনা-সমীক্ষার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ফলে ১৯৫০ সালে 'ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভে' প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু পরিসংখ্যান গত কর্মপদ্ধতির আবর্তের বাইরেও এই সংস্থার অবদান ১৯৩২ সাল থেকেই শুরু হয়। সেই সময় থেকেই বহু শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান

বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখানে আসা-যাওয়া শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৯ সাল থেকেই আই. এস. আই-এর শিক্ষাদান বিভাগ চালু হয়। ১৯৪১ সালে এখানকার কর্মীদের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান-বিভাগ খোলা হয়। ১৯৪৬ সাল অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের অবস্থান ছিল ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে। ১৯৪৯-৫০ সালে ভারত সরকারের দেওয়া বার্ষিক সাড়ে চার লক্ষ টাকার সাহায্যে আই. এস. আই-এর রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং স্কুল জোরদার ভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৫৯ সালে আই. এস. আই অ্যাক্টের ফলে পরিসংখ্যান বিষয়ে এই সংস্থা সর্বোচ্চ ডিগ্রী দান করতে পারে বি. স্ট্যাট, এম. স্ট্যাট ডিগ্রীর পাঠদান এবং পি. এইচ. ডি. ও ডি. এস. সি. পর্যায়ের মর্যাদা দানের অধিকারও সংস্থার ওপর অর্পিত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান গবেষণায় আই. এস. আই-এর কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এই সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আই. এস. আই-এর জাতীয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র উদ্বোধন করেন জওহরলাল নেহেরু। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বহুবার এই সংস্থায় পদার্পণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশের ঘনিষ্ঠতার কথা সকলেরই সুবিদিত। সংস্থার অন্যান্য শাখাগুলি যথাক্রমে ব্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, দিল্লী, গিরিডি, মাদ্রাজ, পুনা ও ত্রিবান্দমে অবস্থিত। ১৯৫৯ সালের আই-এস-আই অ্যাক্ট অনুযায়ী ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হয়। এখানকার গবেষণাকেন্দ্রে সমাজকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অজস্র বিষয় নিয়ে নিয়ত গবেষণারত রয়েছেন বহু বিজ্ঞানী। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানসাধক এই সংস্থায় পদার্পণ করেছেন। আরো এসেছেন দেশনায়ক চিন্তাবিদ প্রমুখ (দ্রঃ বিবিধ প্রসঙ্গ)। এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রথমেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নামোল্লেখ করতে হয়। প্রধানত তাঁরই কল্পনার ফসল আজকের আই. এস. আই। তিনি ছাড়াও পরবর্তীকালে আরও যাঁরা এর উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চিন্তামন দেশমুখ, শুভেন্দুশেখর বসু, রাজচন্দ্র বসু, সমর রায়, সি. আর. রাও প্রভৃতির নাম করা হেতে পারে। ইনস্টিটিউট সংলগ্ন গ্রন্থাগারটিও প্রতিষ্ঠানটির একটি অমূল্য

সম্পদ (দ্রঃ সমীক্ষা)। ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে বহু কৃতী পরিসংখ্যানবিদ ও গবেষককে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই সংস্থায় বিভিন্ন সময়ে বসানো হয়েছে আধুনিকতম কম্পুটার। ১৯৭২ সালে এন. এস. এস. ও অংশটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আসে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হলো বহু বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদের উপস্থিতিতে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

বিশাল এলাকা জুড়ে আই. এস. আই-এর অবস্থান। মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৩২ একর। বর্তমানে কর্মী সংখ্যা প্রায় ১২৫০। বরানগরবাসীর গর্ব এই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখে আজও বিজ্ঞান-সাধনার অন্যতম কেন্দ্রভূমি হিসেবে এগিয়ে চলেছে।

শশিপদ ইনস্টিটিউট

বরানগরের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এই শশিপদ ইনস্টিটিউট। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি শুধুমাত্র একটি গ্রন্থাগার হিসাবে। গ্রন্থাগারটির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। অথচ আজ থেকে ১০০ বছর আগে বরানগরের সামাজিক জীবনে শশিপদ ইনস্টিটিউটের ভূমিকা ছিল গঠনমূলক। যদিও ওই গঠনমূলক প্রয়াস কতটা সার্থকতালাভ করেছিল, সেসম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়, তবু, ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ১৯০৩ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানকে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের একটি অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ স্থানীয় জনসাধারনের মধ্যে কৃষ্টি বা 'কলচর'-এর স্পর্শ বিতরনের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। শশিপদ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন হয় ১৮৭৬ সালের ৬ই জানুয়ারী। উদ্বোধনী ভাষন দেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন বাড ফীয়ার। এঁর নামেই কি কলকাতার ফীয়ার্স লেনের নামকরণ! ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেরী কার্পেন্টার। ১৮৭১ সালে ক্যালকাটা রিভ্যুতে (c iii, no c iii সংখ্যায়) ফীয়ার সাহেব এই ইনস্টিটিউটের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। অবশ্য তখন এই ইনস্টিটিউটের

নাম ছিল বরানগর ইনস্টিটিউট। কিছুকালের জন্য এখানকার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন স্থানীয় সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবসায়ী ও জুট মিলের ডাক্তার ডেভিড ওয়ালডি। যদিও এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এর পেছনে অর্থসাহায্যের তালিকায় কিন্তু ইউরোপীয়দের নামই বেশী। (মেরী কার্পেণ্টার ৫০০ টাকা, দি ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসেসিয়েশন ২৫০ টা, ওয়ল্ডি ৫০ টা, এফ. এল. বিউফোর্ট ১০০ টা, ফীয়ার ১৫০ টা এবং ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন শশিপদ সংগ্রহ করেন ৫০০ টা)। ইনস্টিটিউট সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে বার্ষিক অর্থ সাহায্যের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন চলার পর ক্রমশ এর কার্যধারা স্তিমিত হয়ে আসে। এই ইনস্টিটিউটে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু ১৯১১ সালে দীর্ঘদিন কলকাতা বাসের পর শশিপদ যখন বরানগরে ফিরে আসেন, তখন দেখতে পান অযত্ন ও অবহেলায় সংগ্রহ-শালাটি নষ্ট হতে বসেছে। ইনস্টিটিউটের তৎকালীন সম্পাদক অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ লেখা এক পত্রে তিনি জানান, "বরানগরবাসী এই সংগ্রহশালাটির মূল্য বোঝে না।" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশাতেই যে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষয় পেতে শুরু করে, আজ তার অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুল

১৮৬৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী 'বরানগর হিন্দু স্কুল নামে যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৭ সালে তা-ই রূপান্তরিত হয় বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুলে। বরানগর হিন্দু স্কুলের ১৮৬৬ সালের প্রথম বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয় শুরু হয়েছিল বহু আগেই এবং এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাইকেল মধুসূদনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ গৌরদাস বসাক। ১৮৫৫ সালে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বাদে বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরির প্রচেষ্টায় নতুনভাবে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রথম কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে—বাবু হরনাথ রায়, গোপালকৃষ্ণ ব্যানার্জী, গোলকচন্দ্র মুখার্জী, শিবনারায়ণ বোস, অতুলকৃষ্ণ বোস, বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী,

মধুসূদন রায়, গোপালচন্দ্র ভাদুড়ি, প্রসন্নকুমার ব্যানার্জী, মাধবচন্দ্র মল্লিক, কালীদাস লাহিড়ী, কালীচরণ বোস। বিদ্যালয় কমিটির সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল শিক্ষামূলক নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা। ঐসময়ে বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬০ জন। কিন্তু অচিরেই যে সমস্যাটি প্রকট হয়ে ওঠে, তা হ'লো ছাত্রদের স্থানসংকুলান। এই অবস্থায় ১৮৮০ সাল নাগাদ বিদ্যালয়টি কিছুদিনের জন্য বাবু জয়নারায়ণ ব্যানার্জী ও কিছুকাল পরে মধুসূদন দে'র গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ছাত্রের সংখ্যাও বর্দ্ধিতহারে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তবু বিদ্যালয়ের বাড়ি নিয়ে সমস্যাটি থেকেই গেল। এইসময় রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি বাবু কাশীনাথ দত্ত, গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অতুলকৃষ্ণ বোসকে নিয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টীর হাতে অর্পিত হলো। হুগলি নদীর তীরে ৮ কাঠা জমিও পাওয়া গেল। রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরি ২০০০ টাকা সাহায্য হিসাবে দিলেন। দানসংগ্রহে জমা পড়ল আরও অর্থ। শোনা যায়, বিদ্যাসাগরও এই বিদ্যালয় সংস্কারে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও এই বিদ্যালয়কে গড়ে তুলবার পিছনে ছিল বাংলার বিদ্বৎ সমাজেরও এক অগ্রণী ভূমিকা। ১৮৮৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বিদ্যালয় কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়টি জাঁকজমকসহকারে আলোকমালায় সজ্জিত করা হবে। এবং তখন থেকেই এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় 'বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুল'। এই নামকরণের কথা ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারের সচিবকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৯৭ সালে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান ও স্কুল কমিটির মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ও অন্যান্য সম্প্রসারণের জন্য ৫ কাঠা ৬ ছটাক এবং ১০ বর্গ ফুট জমি ধার্য হয়। ১৯০০ সালের স্কুল রিপোর্টে বলা হয় "This being the only High English School in the northern suburb of Calcutta, comprising an area of nearly 8 sq. miles, it is attended by boys from Baranagar

and six other surrounding townships." দীর্ঘদিন সন্তোষজনকভাবে কাজকর্ম চলার পর ১৯৩৩ সালে হঠাৎ কোন এক রাজনৈতিক কারণে বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। এরপর সরকারের সঙ্গে স্কুল পরিচালনাগত নানা বিরোধের ফলে অবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে আসে। যদিও বিদ্যালয় কখনোই তার মূল লক্ষ্য—শিক্ষার প্রসার থেকে দূরে সরে আসেনি। ১৯৪৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত স্কুল কমিটির এক সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৬ সালের গোড়া থেকে বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগ চালু করা হলো, যার মাধ্যমে বরানগরে মহিলা শিক্ষা বিস্তারের ঐতিহ্যটি অক্ষুণ্ণ রইলো এবং ভিক্টোরিয়া স্কুলও পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হলো। ১৯৪৭ সালের পর যখন দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নিরাশ্রয় উদ্বাস্তুর দল অন্ন বস্ত্র শিক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামে রত, তখন বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুল উদ্বাস্তু বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তির বিশেষ সুযোগ প্রদান করেছিল। এরপর বিদ্যালয়ের নানা সংস্কার সাধিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ১৫০ বছরের নিরলস সাধনায় রত বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুল বরানগরবাসীর গর্বের বস্তু। ১৯৬৬ সালে এই বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উদযাপিত হয়েছে। বিভিন্নক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, বাংলার বহু মানুষ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার আলোকে আলোকিত। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত গ্রন্থাগারটিও একটি অমূল্য সম্পদ।

বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের আদর্শ আজ যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে। দেশে দেশে সমবায় সম্পর্কে নানাভাবে চিন্তা ভাবনাও করা হচ্ছে। সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকতে পারে যদি প্রতিটি স্তরের জনসাধারণ সমবায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। ভারতবর্ষের সমবায়ের বীজ বপন হয়েছিলো বহুকাল আগে। উনিশশতকী চিন্তভাবনার স্রোত বেয়ে সমবায়ের ঢেউ এসে লেগেছিল বাংলার বুকেও। তারও আগে সঞ্চয় প্রবণতা সম্পর্কে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার কথা যাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভিমি

বরানগরে ১৮৭০ সালে সেভিংস ব্যাংক গঠনে উদ্যোগী হন। ১৮৭১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ওই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিলো। যদিও এর আগেই শশিপদ আনা সেভিংস ব্যাক স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং যে বরানগরে ১৮৭১ সালে স্থানীয় নিম্নবিত্ত মানুষেয় স্বার্থে একটি ব্যাংক চালু হয়, সেই বরানগরে পরবর্তী কালে একটি সমবায়-সমিতি গঠন কিছুমাত্র অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। ১৯৩১ সালের ৪ঠা জুলাই ইন্দুকুমার ঘোষের প্রচেষ্টায় বরানগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড স্থাপিত হয়। ইন্দুবাবু ছাড়া আরও চোদ্দজনের অপরিসীম উৎসাহে এই সমিতির রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়। সমিতির তৎকালীন কার্য্যালয় ছিল ৮২ নং কুটিঘাট রোডে। প্রথম সম্পাদক হিসাবে কিছুকাল কার্যভার চালাবার পর ইন্দুবাবু কার্যভার ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপরে সমিতির অফিস স্থানান্তরিত হয় রমনীমোহন বসুর বাড়িতে। তখন এই সমিতির কাজ অতি কষ্টে চলতো। বিশেষ ক'রে আর্থিক অসঙ্গতি ছিল প্রকট। সমিতির কার্য্যালয় যখন ১১৮ নং কুঠিঘাট রোডে উঠে আসে তখন থেকে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মচারী রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সমিতির কাজের পরিধিও ব্যাপক হতে শুরু করে। যা ছিল একটি সমবায় সমিতি তা-ই ক্রমে ক্রমে পরিণত হলো পূর্ণাঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্কে। ৫০-এর দশকের গোড়া থেকে ব্যাঙ্কের একটি নিজস্ব গৃহ-নির্মাণের প্রচেষ্টাও শুরু হয়। অবশেষে ১৩ নং বি. কে. মৈত্র রোডে (বর্তমান ঠিকানা) পাকাপাকিভাবে ব্যাঙ্কের কাজ শুরু হয়। ১৯৩১-৩২ সালে যখন কাজ শুরু হয়, তখন সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল পনেরোজন। ১৯৭৯ ৮০ সালে ব্যাঙ্কের সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮১৭ জনে। সমিতির ঋণ প্রদানের পরিমান ১৯৩৫-৩৬ সালের টা. ৩১০০'০০ থেকে বেড়ে ১৯৭৯ ৮০ সালে দাঁড়ায় ৩১,১৮৬৪'০০ টাকায়। বহু উদ্যোগী মানুষের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এই ব্যাঙ্ক বরানগরের বুকে আজ এক অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়েছে আড়ম্বর সহকারে। এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক-পুস্তিকাটিতে এই ব্যাঙ্কের আরও অনেক ইতিহাস বিবৃত রয়েছে। তবে, এই ব্যাঙ্কের পেছনে যাঁদের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা রয়েছে তাঁদের মধ্যে স্মরণ করা যেতে পারে ইন্দুকুমার ঘোষ, মাখনলাল বাগচি, রাধারমন দত্ত, নৃপেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত (ব্যাঙ্কের প্রথম চেয়ারম্যান), রমনীমোহন বসু, রামগোপাল ঘোষ,

হরেন্দ্রনাথ স্যান্যাল, নীলমণি মণ্ডল, চারুচরিত চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ দে, গোপীজীবন সান্যাল, নীরদচন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী পাল, কানাইচন্দ্র লাহিড়ী, জগৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার মণ্ডল, হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শশাঙ্কশেকর গঙ্গোপাধ্যায়, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ দাঁ, প্রভৃতিকে। ১৯৬৭-৬৮ সালে বরানগর কো-অপারেটিভ সোয়াইটি'র নামকরণ হয় 'বরানগর কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক'। এই সংস্থা রেজিস্ট্রিকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে এই ব্যাঙ্ক আজ পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমানে ব্যাঙ্কের কর্মচারীর সংখ্যা কুড়িজন। ব্যাঙ্কটির কাজকর্ম সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মনে মাঝেমধ্যে অসন্তোষ দেখা গেলেও বিরোধের পরিবর্তে সহযোগিতামূলক ও উৎসাহী মনোভাবের ভেতর দিয়েই অসন্তোষের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব

আজ থেকে ৮৬ বছর আগে বরানগরের জমিদার দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের জমিতে কতিপয় উৎসাহী যুবকের একান্ত প্রচেষ্টায় এই ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানের জন্ম। জন্মলগ্নে ঐসব তরুণেরাই ছিলেন এই ক্লাবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এঁদের মধ্যে ছিলেন অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ফণীন্দ্রনাথ দে, অধীর মৈত্র, দাসু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। দীর্ঘদিন ধরে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে সুপরিচিত এই ক্লাবের নিজস্ব মাঠটিও বিশাল। আয়তন প্রায় ৯ বিঘা। একসময় এই মাঠে গ্যালারি নির্মাণের পরিকল্পনাও হয়েছিল। পরবর্তীকালে নানা বিরোধের ফলে এই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। ফুটবল ও ক্রিকেট, প্রধানত এই দুটি বিভাগেই ক্লাবের সুনাম। কলকাতার ফুটবল মাঠের অতীতের ও বর্তমানের বহু ফুটবল-খেলোয়াড়ের জীবন এই মাঠেই শুরু হয়। একসময় ফুটবলের নানা টুর্নামেন্টে বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব নিয়মিত যোগদান করত। শুধু তাই নয় অতীতে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের মত শক্তিশালী দল ক্লাবসংলগ্ন মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফুটবল ছাড়া ক্রিকেটেও বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব অতীতে

যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। ২৪ পরগণা জেলা আয়োজিত ক্রিকেট-লীগ প্রতিযোগিতায় এই ক্লাব পরপর ৭ বার চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্লাব সংলগ্ন মাঠে আযোজিত প্রীতি ক্রিকেট খেলায় বহু কৃতী ও অত্যুৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড় খেলে গেছেন। এঁদেব মধ্যে ছিলেন পঙ্কোজ রায়, প্রেমাংশু চ্যাট্যার্জী, সিদ্ধার্থশঙ্কব রায়, প্রকাশ পোদ্দাব, চুণী গোস্বামী, পি. বি. দত্ত প্রমুখ। ১৯৫৪ সালে বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হয়। এখনও সি. এ. বি. পরিচালিত ক্রিকেট লীগে এই ক্লাব অংশগ্রহণ করে। ফুটবল ও ক্রিকেট ছাডাও রোয়িং, ভলিবল, লন-টেনিস, হকি, এ্যাথলেটিক্স প্রভৃতিও একসময় এই ক্লাবের ক্রীড়াসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্লাব বঙ্গীয় ভলিবল এ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। যদিও বরানগরের প্রাচীন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব উল্লেখযোগ্য, তবু স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে একটি ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করার ব্যাপাবে ক্লাবের ভূমিকা নঞর্থক। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ—জনসাধাবণ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই ক্লাব তার পূর্ব-ঐতিহ্য থেকে সরে যেতে বসেছে। শহরাঞ্চলে যে ক্লাবের অবস্থান, নানা দেশীয় ক্রীডা ও অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে সর্বস্তবের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের একটি মিলনক্ষেত্রে পরিণত হতে হবে। একসময় এই ক্লাবের জন্য স্থানীয় বহু মানুষই তাঁদের উদ্যোগ ও সামর্থ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পরবর্তীকালে নানা হতাশায় তাঁরাই আবার দূরে স'রে গেছেন। আশা কবা যায়, বরানগব স্পোর্টিং ক্লাবের মত বিশাল ও ঐতিহ্যপূর্ণ ক্লাব, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে খেলাধূলার ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক অনুকূল পরিবেশ গ'ড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরী

বরানগর পোষ্ট অফিসের মুখ থেকে বি. কে. মৈত্র রোড ধরে গঙ্গার দিক বরাবর হাঁটতে থাকলে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির পেরিয়ে ডানদিকে একটি কাঁচা ও কানা গলির ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা নিয়ে আজ বরানগরবাসী গর্ব করতে পারতো। অথচ বরানগরের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক

হাজার মানুষ প্রতিষ্ঠানটির নাম অব্দি শোনেননি। প্রতিষ্ঠানটি আসলে একটি গ্রন্থাগার। বাল্বের অনুজ্জ্বল আলো, পুরনো বইয়ের পাগল করা গন্ধ এবং গুটিকয় পাঠকের আসা যাওয়া, এই নিয়ে কোনোরকমে টি৺কে আছে বরানগর পিপলস লাইব্রেরী। ঠিকানা ৫০/১, বি. কে. মৈত্র রোড, কলি-৩৬। এই গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। কুটিঘাট অঞ্চলের কিছু মানুষ ছাড়া এই ইতিহাস বোধকরি অনেকেরই অজানা। আর এর সন্ধানে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই সময়ে, যখন উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ প্রচলিত সংস্কারের বেড়া টপকে গড়ে তুলছে সেই বোধ, যা মননে ও কর্মে, বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়েছিলো এক স্বর্ণযুগ। ওই যুগেই বরানগরে ধর্ম ও নীতিশিক্ষার বিস্তারকল্পে গঠিত হয়েছিলো আত্মোন্নতি বিধায়নী সভা। তখন ১৮৭৫ সাল। ঢাকার জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরির বাড়ীতে (যাকে মুন্সির মাঠ বলা হয়) এরই সঙ্গে স্থাপন করা হয় একটি গ্রন্থাগার। নাম—আত্মোন্নতি বিধায়ণী সভার পুস্তকালয়। এটাই হলো বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরীর বীজ-সংগঠন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন রামকৃষ্ণ-শিষ্য ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কালীকৃষ্ণ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিনারায়ণ দাঁ, প্রভাতচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র দে, দাশরথি সান্যাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আর এঁদের অপরিসীম উৎসাহ যুগিয়েছেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। শোনা যায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদধুলি পড়েছিলো ওই আত্মোন্নতি বিধায়নী সভায়। বিবেকানন্দের সঙ্গে এই সভার যোগ ছিলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই সভায় প্রায়শই উপস্থিত থাকতেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। কয়েক বছর বাদে ১৮৮২ সালে কুটিঘাট নিবাসী মাধব মল্লিকের বাড়ীতেও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। দক্ষিণ বরানগর পাবলিক লাইব্রেরী নামে এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন, রামদাস ঘোষ, অধবচন্দ্র দে, অম্বিকা ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কিন্তু এরপর নানা কারণে আত্মোন্নতি বিধায়ণী সভার কাজকর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এবং এই দুটি গ্রন্থাগার একসঙ্গে মিলে যায় ও নাম হয় বরানগর পিপলস লাইব্রেরী। প্রকৃতপক্ষে বরানগর পিপলস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ১৮৮৬ সালের উল্লেখ সম্ভবতঃ ভুল। কেননা আত্মোন্নতি বিধায়নী সভা এবং দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা কাল যথাক্রমে ১৮৭৫

ও ১৮৮২, এবং মিলিতভাবে বরানগর পিপলস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৩-৯৪, সুতরাং অযথা কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রাচীনত্ব আরোপ করা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে না। সন তারিখ দিয়ে ইতিহাসের পায়ে বেড়ি পড়ানো যায় না যেমন, তেমনই সন তারিখের অপব্যবহারও অবশ্য বর্জনীয়। ১৮৯৩ সালে নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পেছনে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ সালে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারে ৫০ টাকা দান করেন। একসময়ে সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁর মামা রবি দত্তের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারে আসতেন। এই গ্রন্থাগারে ভাষণ দিয়েছেন শরৎচন্দ্র বসু। বিভিন্ন সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থেকেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও আরও অনেকে। পিপলস লাইব্রেরীর ফ্রী রীডিং রুম খোলা হয় ১৯৩১ সালের ১লা মার্চ। তৎকালীন পুর প্রতিষ্ঠান পাঠাগারকে অর্থ সাহায্য দিতেন। ১৯৩৪ সালে লাইব্রেরী, শ্রীরণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উঠে আসে ১১৩, কুটিঘাট রোডে, শ্রীসতীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে। পাঠাগার রেজিস্ট্রীকৃত হয় ১৯৩৬ সালে। এই গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে ১৯৫৫ সালে প্রাচীর প্রত্রিকা অগ্রণী ও 'বরানগর পিপলস লাইব্রেরী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সময়ে অনেকেই মূল্যবান বইপত্র দিয়ে পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখনও লাইব্রেরীতে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া, হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস অফ বেঙ্গল, বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্টের মত মূল্যবান গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই লাইব্রেরীর একটি অর্থনৈতিক ইতিহাসও আছে। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত নিজস্ব গৃহনির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৬০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বর্তমান ঠিকানায় ২৩০০ টাকা মূল্যে ১ কাঠা ১২ ছটাক জমি কেনা হয়। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গৃহ নির্মাণের জন্য এককালীন সরকারী সাহায্য হিসেবে ১৫০০ টাকা প্রদান করেন। সংক্ষেপে এই হলো বরানগর পিপলস লাইব্রেরীর ইতিহাস। এই ইতিহাস পেরিয়ে এসে বরানগর পিপলস লাইব্রেরী আজ নানা সমস্যায় আক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছে পুস্তকহীনতা, প্রশাসনিক দায় দায়িত্বের অভাব। অনেকেই

বই নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখে দেন দিনের পর দিন। এইভাবে ব্যক্তিগত সংগ্রহ বৃদ্ধির বিনিময়ে বরাহনগর পিপলস লাইব্রেরী ক্রমশই নিঃশেষিত হতে চলেছে। একথাও স্বীকার করতে হবে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে লাইব্রেরীকে দীর্ঘদিন ধরে নিরলস সেবা দান করছেন বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীপাঁচুগোপাল খামরুই।

জয় মিত্র কালীবাড়ি

কলকাতার একটি পথ নির্দেশিকা থেকে দেখা যায় জয় মিত্রের নামে দুটি রাস্তা রয়েছে। একটির নাম জয়মিত্র স্ট্রীট, যার উৎস ১৩১, আপার চিৎপুর রোড, কলি-৫ এবং অপরটি জয়মিত্র ঘাট লেন, উৎস ১৩, কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীট, কলি-২। জয় মিত্র সম্পর্কে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর 'কলকাতার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন "দুর্গোৎসবের দিন তিনদিন শাক্তদিগের গৃহে বলিদান হইত, নবমির অনেকস্থানে বলিদানের বিশেষ বাড়াবাড়ি। শোভাবাজারের কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট যাহাকে জয় মিত্রের গলি বলে, সেই রাস্তায় জয় মিত্রের বাড়ী, আমরা তাঁহার দুর্গোৎসবে নবমীর দিন অসংখ্য মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি দেখিয়াছি।···কথিত আছে জয় মিত্র, সপ্তমীর দিন হইতে যত বলিদান হইত, নিজ গৃহের ব্যবহার্য ভিন্ন অপর ছেদিত ছাগগুলি গুদামজাত করিয়া রাখিতেন, একাদশীর খাতা দেখিয়া পৈত্রিক আসল হইতে যে যে ব্রাহ্মনের বার্ষিক ছিল তাঁহাদের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।" এই হলেন জয় মিত্র। তিনি যে বরানগরের মত একটি স্থানে একটি কালীমন্দির নির্মাণ করাবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। শোভাবাজারের এই দানশীল ব্যক্তি তাঁর পিতা রামচন্দ্র মিত্র কর্তৃক ত্যাজ্য পুত্র হন। জনৈক জেমস সাহেবের কাছ থেকে জমি কেনার পর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় বাংলা ১২৫৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে। মন্দিরের ভেতর ১২টি শিবমন্দির আছে। জমির পরিমাণ প্রায় ৩ বিঘার মত। এই মন্দিরের সামনে যে রাস্তাটি এখন হরকুমার ঠাকুর স্ট্রীট নামে পরিচিত আগে এই রাস্তাটি ছিল না। তখন মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সামনের গঙ্গার ঘাটটির অবস্থান ছিল। এই জয় মিত্র কালীবাড়িকে ঘিরে বহু কিংবদন্তী জন্ম

নিয়েছে। শোনা যায় সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আগমনের পর থেকেই এখানে বলি নিষিদ্ধ হয়। এই মন্দিরে বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃপাময়ী মাতার। মন্দির সংলগ্ন গম্বুজের মাথায় শতাধিক বছরের প্রাচীন একটি হাওয়া-নিশান আজও অবিকল ভাবে হাওয়ার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরে চলেছে। এই প্রাচীন মন্দিরটির কথা, দুঃখের বিষয়, বরানগরের অনেক মানুষই জানেন না।

বরানগর জুট ফ্যাক্টরী কোম্পানি লিমিটেড

১৮৫৫ সালে রিষড়ায় বাংলাদেশের প্রথম পাটকল স্থাপনের পর ১৮৫৯ সালে জর্জ হেণ্ডারসন কোম্পানির প্রচেষ্টায় বোর্ণিও কোম্পানি লিমিটেড বরানগরে একটি পাটকল প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশে বাষ্প-শক্তি চালিত তাঁত প্রবর্তনই বোর্ণিও কোম্পানির প্রধান কৃতিত্ব। এই কোম্পানি তৎকালীন বাংলাদেশে বাণিজ্যিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। এরই ফলস্বরূপ, ১৮৬৪ সালে তৃতীয় পাটকলটি স্থাপিত হয়। এবং বোর্ণিও কোম্পানির জুট-মিল দুটি বর্তমানের বরানগর জুট ফ্যাক্টরি কোম্পানি লিমিটেড ক্রয় করেন। এখন যে জুট-মিলটি আমরা দেখতে পাই, একসময় বরানগরের সামাজিক জীবনে তার প্রভাব ছিল অসামান্য। বিশেষ ক'রে বরানগরের প্রশাসনিক কাজকর্মে এই জুট মিলের উচ্চপদস্থ বিদেশী অফিসারদের প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। বরানগরের অর্থনীতিকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে এই জুট-মিল। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এই জুট-মিল কর্তৃপক্ষ বরানগরে একটি কাগজকলও স্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত ঐ কল স্থাপিত হয় বালিতে ১৮৮৫ সালে। জর্জ হেণ্ডারসন কোম্পানি, লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় ১৯২৫ সালে। শোনা যায়, বর্তমান জুট-মিলের এলাকাটি একসময় স্থানীয় জমিদার দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ছিল। বরানগর জুট-মিলের ইতিহাস বহু বিবর্তনের ইতিহাস। বরানগরের একটি অন্যতম উৎপাদনকারী সংস্থা ছাড়াও বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে অন্যান্য জুট-মিলগুলির শ্রমিকদের সঙ্গে এই জুট-মিলের শ্রমিকগণ আজও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত কোঠারির Industrial Handbook-এ এই জুটমিলের একটি

পরিসংখ্যানে লেখা আছে "The Company's MIll is situated at Baranagorc, about 8 miles north of Calcutta on the left Bank of the River Hooghly. Sackinng 690 ; Hersian : 1, I99, Carpet Backing : 40. Total Loom : 1929. Cloth Width : 22-60 inches. (Ordinary) and Carpet Backing upto 152." The Mill is driven by Electricity. এই প্রতিষ্ঠানের কলকাতার এজেন্ট হলেন ৪নং ক্লাইভ রো, কলি-১-এ অবস্থিত জার্ডিন হেণ্ডারসন লিমিটেড।

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড

বরানগরের বুকে একটি অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি। অবস্থান বরানগরে হলেও বেঙ্গল ইমিউনিটি ওষুধ-শিল্পে বাংলা তথা ভারতের একটি অগ্রণী সংস্থা হিসাবে স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসের খোঁজে আমাদের প্রথমেই ফিরে যেতে হবে ১৯১৯ সালে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দের উদ্যমী তৎপরতার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। প্রথমে হ্যারিসন রোড ও পরে মাণিকতলায় ছিল এই সংস্থার অফিস। মাণিকতলায় তৈরী হলো আস্তাবল। প্রধানত সিরাম, ভ্যাকসিন ও জৈব ভেষজ প্রস্তুতের লক্ষ্য নিয়েই উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। নানা কারণে ও বহু উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে বেঙ্গল ইমিউনিটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো উন্নতির লক্ষ্যে। পরবর্তীকালে আস্তাবল উঠে এল যাদবপুরে এবং অফিস আবার স্থানান্তরিত হলো প্রিন্সেপ স্ট্রীটে। এরপর ধর্মতলায় (বর্তমানে যেখানে হেড-অফিস) অফিস, আস্তাবল ও ল্যাবোরেটারী স্থাপিত হলো। এরপর শুধুমাত্র আস্তাবল ও ল্যাবোরেটরী অংশটুকু বরানগরে নিয়ে আসা হয়। বেঙ্গল ইমিউনিটির সাফল্যের পেছনে যাঁর অবদান সর্বাধিক তাঁর নাম ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (এঁর নামেই নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির)। তিনি ১৯২৫ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস থেকে এই সংস্থায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। এরপর নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে তিনি বেঙ্গল ইনিউনিটির অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার দুরূহ কাজটি

সম্পাদন করেছিলেন। এক সময় এই সংস্থার প্রচার-সচিব ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই সংস্থাটির বরানগরে অবস্থিত কারখানাটি ছাড়াও দেরাহুনে আর একটি কারখানা ও আস্তাবল আছে। বরানগরের অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোডের আস্তাবলটি ছাড়াও বেলঘরিয়ার ফীডার রোডে রয়েছে আর একটি আস্তাবল। ওষুধ-নির্মাণ ছাড়াও বেঙ্গল ইমিউনিটির আর একটি কৃতিত্ব ওষুধের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও নানা পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণাকর্ম। এই উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র বসু রোডে রয়েছে সর্বাধুনিক গবেষণাকেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন একটি বিশাল গ্রন্থাগার। এই সংস্থার বরানগর কেন্দ্রে কর্মরত রয়েছেন দু'হাজারেরও বেশী শ্রমিক। সত্তরের দশকে যখন এই সংস্থাটি নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তখন রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৭৮ সালে সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে আসে। একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবে বেঙ্গল ইমিউনিটির শ্রমিকবৃন্দ বরানগরের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শারদোৎসবের সময় এই সংস্থার নিজস্ব প্রাঙ্গণে আয়োজিত পূজা উপলক্ষ্যে বহু দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে ও সংস্থাটিকে বহু আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(ক) বরানগরে বিদেশী

অতীত থেকে আজও নানা সময়ে বহু প্রখ্যাত বিদেশীর আগমন ঘটেছে এই বরানগরে। সেই কোন্ এক যুগে এসেছিলেন স্ট্রেনশ্যাম মাষ্টার ও টি্রফেনটেলার। শোনা যায়, লর্ড ক্লাইবও কিছুকাল এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। পরবর্তী-কালে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে এসেছিলেন মেরী কার্পেণ্টার (১৮৬৭ ও ১৮৭৫)। এসব বহুকাল আগের কথা। নিকট অতীতেও বরানগর বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, চিন্তাবিধ ও রাষ্ট্রনায়কদের সান্নিধ্য লাভ করেছে। এঁরা অবশ্য সকলেই এসেছেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে। অনেকে একাধিকবার এসেছেন। গর্বের কথা, এঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজন, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞান-তপস্বী জে. বি. এস. হলডেন এই বরানগবে বেশ কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। বরানগরের পথেঘাটে হলডেনের স্মৃতি হয়ত অনেকের মনেই জাগরূক আছে। নীচে, নানা সময়ে বরানগরে উপস্থিত বিদেশীদের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

পরিসংখ্যানবিদ স্যর রোনাল্ড ফিশার (১৯৩৭-৫৮), পরিসংখ্যানবিদ ডঃ হ্যারল্ড হটেলিং (১৯৩৯-৪০), পদার্থবিদ জোলিও কুরী ও মাদাম কুরী, পদার্থবিদ জে. ডি, বার্ণেল (১৯৪৯-৫০), অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেটস (১৯৫০ ৫১), জে. বি. এস. হলডেন, অর্থনীতিবিদ জ্যান টিনবার্জেন (১৯৫১-৫২), অর্থনীতিবিদ র‍্যাগনার ফ্রিশ, অর্থনীতিবিদ অসক্যার ল্যাঞ্জ (১৯৫৪-৫৫), অর্থনীতিবিদ জোয়ান রবিনসন (১৯৬২-৬৫), অর্থনীতিবিদ ডঃ গুণার মিরডাল, অর্থনীতিবিদ ডঃ নিকোলাস ক্যালডর, অর্থনীতিবিদ ডঃ পল ব্যারান (১৯৫৫-৫৬), জৈব রসায়নবিদ এ. এন. নেসমেয়ানভ (১৯৬৫-৫৬), প্রাণিবিজ্ঞানী ডঃ পামেলা রবিনসন (১৯৫৭-৫৮), অর্থনীতিবিদ ভ্যাসিলি লিওনটিয়েফ (১৯৫৭ ৫৮), জীববিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলে (১৯৫৮-৫৯), পদার্থবিদ নীলস্ বোর, অঙ্কবিদ ও পদার্থবিদ আবদুস সালাম (১৯৫৯-৬০),

পরিসংখ্যানবিদ গুনটার মেনজেস (১৯৬০-৬১), অঙ্কবিদ ক্লদ বার্জ (১৯৬২-৬৩) নৃতাত্ত্বিক ডঃ এ. এল. শ্যাপ্রিও (১৯৬২-৬৩), রসায়নবিদ ডঃ আ. এল. এন. সিঙ্গ (১৯৬৫-৬৬), পরিসংখ্যানবিদ মরিস হ্যানসেন, অর্থনীতিবিদ টি, সি. কুপম্যানস্ (১৯৬৭-৬৮), পরিসংখ্যানবিদ কান্তরোভিচ (১৯৭৭), অর্থনীতিবিদ জে. আর. হিকস (১৯৮১), সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের পক্ষে আলেক্সী কোসিগিন (১৯৬০-৬১), রুশ ঔপন্যাসিক ইলিয়া এরেনবুর্গ (১৯৫৪), হো-চি-মিন (১৯৫৮), হেনরী কিসিংগার (১৯৬২), চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই (১৯৫৬)।

(খ) পুর-প্রধানদের তালিকা

বরানগর পুরসভার ১৮৬৯-১৮৮৫, ১৮৮৯-১৮৯৮ এবং ১৯১২-১৯১৭ এই দীর্ঘসময়ের কোন বিবরণী পাওয়া যায় না। ফলে এ-যাবৎ প্রাপ্ত বিবরণী থেকে বরানগর পুরসভার পুর-প্রধানদের একটি তালিকা সংকলিত হলো।

শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৮৮৭), রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (১৮৮৭-১৮৮৯), এস. ম্যাকফারসন (১৮০৮-১৮৯৯), ডব্লু. এস. ম্যালকোলেন (১৮৯৯-১৯০২), এস ম্যাকফারসন (১৯০২-১৯০৩), রবার্ট এস. টমাস, (১৯০৩-১৯০৫), এস. ম্যাকফারসন (১৯০৫) এস. টমাস (১৯০৬-১৯০৭), ডব্লু. এস. ম্যাককোলেন (১৯০৭-১৯০৮), এস. ম্যাকফারসন, জুনিয়র (১৯০৮-১৯১০), ডব্লু. কাথবার্ট (১৯১১), ডব্লু কাথবার্ট (১৯১৮-১৯১৯), জি. টি. জি. মিলনে (১৯২১-১৯২৩), প্রাণকৃষ্ণ সাহা (১৯২৩-১৯২৫), পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী (১৯২৫-১৯৩২)। অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩২-১৯৩৩), পি. এ. ডানকান (১৯৩৪), অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪), পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী (১৯৩৯-১৯৪৮), বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯৫২), কানাইলাল ঢোল (১৯৫২-১৯৬০), কুঞ্জবিহারী দে (১৯৬০-১৯৬১), ইন্দুভূষণ দত্ত (১৯৬১-১৯৬২), তিনকড়ি মৈত্র (১৯৬২-১৯৬৪), সুব্রত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬৪-১৯৬৫), অজিত গাঙ্গুলী (১৯৬৯-১৯৭২), অজিত গাঙ্গুলী (১৯৭৭-১৯৮১),অজিত গাঙ্গুলী (১৯৮১)।

(গ) বরানগরে ব্যক্তিবর্গ

যেকোন স্থানই সেখানে বসবাসকারী প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হ'তে পারে। বরানগর ঠিক কবে থেকে বাসযোগ্য হ'য়ে ওঠে তা সঠিক নিরূপণ করা না গেলেও একথা ঠিক যে আড়াই শো বছর আগেও বরানগর একটি জন-অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন পর্বে, যখন নানাদিক থেকে এই জনপদটির গুরুত্ব বাড়তে লাগলো, ততই স্থানটির লোকবসতিও বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। এভাবে চলতে চলতেই বরানগরের গায়ে একদিন এসে লাগলো শহরের বাতাস। বরানগর হলো আধা শহর বা শহরাঞ্চল। আর নানা জীবিকা-তাড়িত মানুষের দল পাড়ি জমালো বরানগরের উদ্দেশ্যে। গ'ড়ে উঠলো এক একটি পরিবার। কেউ দীর্ঘস্থায়ী, কেউ ক্ষণস্থায়ী। কখনো একটি পরিবার সামগ্রিকভাবে পেল সামাজিক প্রতিপত্তি, কখনো বা একজন ব্যক্তি পেলেন প্রতিষ্ঠা। আবার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণও অন্যস্থান থেকে এসে বাসা বাঁধলেন বরানগরে। 'ব্যক্তি-কেন্দ্রিক' এই অধ্যায়টির অবতারণা ঐসব ব্যক্তিদের ঘিরেই, যাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-নাটক-সঙ্গীত ক্রীড়া-রাজনীতি থেকে বাণিজ্য অঙ্গন, সর্বত্রই খ্যাতিমান হিসাবে কীর্তিত হয়েছিলেন।

নির্দিষ্টভাবে এমন একজন ব্যক্তি কি আছেন, যাঁকে বরানগরের অন্যতম খ্যাতিমান আখ্যা দেওয়া যাবে? এই প্রশ্ন উঠলে, স্বভাবতই এর উত্তরে এসে পড়বে একাধিক ব্যক্তির নাম। আমাদের প্রথম উল্লেখ্য ব্যক্তি শ্রমজীবী আন্দোলনের পথিকৃৎ সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫) ছিলেন এই বরানগরের এক প্রাচীন পরিবারের সন্তান (দ্র. শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারত শ্রমজীবী)। শশিপদর স্ত্রী রাজকুমারী দেবীই ছিলেন প্রথম বাঙালি গৃহবধূ, যিনি বিলাত-যাত্রা করেন। শশিপদর পুত্র স্যার রাজকুমার আলবিয়ন ব্যানার্জীও জীবনে বহু উচ্চপদে আসীন থেকেছেন। তাঁর রচিত 'An Indian Pathfinder' একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। শশিপদ-কন্যা বনলতা দেবী (১৮৮০-১৯০০) 'অন্তঃপুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটি ছিল শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বনজ'। শশিপদর যুগেই শ্রমজীবী-আন্দোলনের সূচনাপর্বের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল হিন্দুধর্মের

একটি স্রোত। ঐ স্রোতের পুরোধা-পুরুষ অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বরানগর সংলগ্ন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য নরেন (পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ) দীর্ঘকাল বরানগর ও আলমবাজার মঠে অতিবাহিত করেন। মূলতঃ আলমবাজার মঠ থেকেই বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রার সূচনা। রামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৬৩-১৮৯৬) ছিলেন কুঠিঘাট-নিবাসী। একসময় বরানগর ছিল যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সদস্যদের অন্যতম কেন্দ্র। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের গোড়া থেকে শুরু করে ৩০-এর দশক পর্যন্ত বহু বিপ্লবী বরানগরে এসে বসবাস করতেন। শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে জাতিকে শক্তিশালী করার কথা যাঁরা বাঙালী সমাজে প্রথম বলেন তাঁদের অন্যতম ব্যারিষ্টার পি. মিত্রও (৮৫৩-১৯০১) বরানগরের বাসিন্দা ছিলেন বলে অনেকের ধারণা। পি. মিত্র ছিলেন বাঙলার বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্রের সভাপতি। এঁরই নামে বর্তমান ব্যারিষ্টার পি. মিত্র রোড-এর নামকরণ (পূর্বের নাম ওয়ালডি ষ্ট্রীট)। পি. মিত্রের বাড়ি কোন্‌টি ছিল তা আমরা জানি না। শ্রদ্ধেয় রাধারমণ মিত্র মহাশয় এক্ষণ (শারদীয় সংখ্যা ১৩৮১) পত্রিকায় 'কলকাতার বাড়ি, বাগান ও বাগানবাড়ি' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন 'বরানগরের উত্তরে আলমবাজারের দিকে গোপাললাল ঠাকুর রোডের উপর ডান হাতে এক খুব উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বিরাট বাগানবাড়ি ছিল। এখন সে বাগানবাড়ি নেই, ভেঙে ফেলা হয়েছে, সে-জায়গায় অনেক বাড়ি-ঘর উঠেছে। এটি ছিল পি. মিত্রের বাগানবাড়ি। অনেকে কিন্তু ভুল ক'রে এই পি. মিত্রকে অনুশীলন সমিতির পি. মিত্র বলে মনে করেন। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্রের নাম প্রমথনাথ মিত্র। তিনি নৈহাটির মিত্র।' নৈহাটির মিত্রপাড়ায় তাঁর বাড়ি আছে।' রাধারমণবাবু কথিত বরানগরের বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন কীর্তি মিত্রের পুত্র ও মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক প্রিয়নাথ মিত্র। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশীযুগ' গ্রন্থেও আমরা দেখতে পাই ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের গুপ্ত সমিতি ছিল কলকাতায়। সুতরাং ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের বরানগরে অবস্থান বিষয়ে আমরা দ্বিধান্বিত। বরানগর-কাশীপুর

অঞ্চলে পাথুরিয়াঘাটার হিন্দু ঠাকুর পরিবারের বহু বাড়ি বাগানবাড়ি ছিল। সুতরাং অনুমান অমূলক নয় যে, ঐ পরিবারের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ প্রায়শই সমভিব্যাহারে বরানগরে এসে বাস করতেন। অমৃতলাল দাঁ রোডে 'তটিনী কুটীর' ছিল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়ি। যতীন্দ্রমোহন (১৮৩১ ১৯০৮) তাঁর কাকা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পত্তি লাভ করেন। এঁরই ভাই বাংলায় সঙ্গীত-আলোচনার পথপ্রদর্শক শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪) বরানগরে তাঁর পিতা হরকুমার ঠাকুরের নামে রাস্তা নির্মাণ করান। সুতরাং বরানগরে এঁদের অবস্থান সংশয়াতীত। এই বরানগরেই ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর মাতুলালয়, একথা ক'জন জানেন? কাশীনাথ দত্ত রোডে নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরের-সংলগ্ন মাঠের পেছনে ও বেঙ্গল ইমিউনিটির লাগোয়া বড় থামঅলা বাড়িটিই কাশীনাথ দত্তের বাড়ি: ১৮৮৫ সালে বরানগর পুরসভার মনোনীত সদস্যদের অন্যতম ছিলেন এই কাশীনাথ দত্ত। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বরানগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের বাড়ি তৈরীর তহবিলে ইনি দেড়শো টাকা প্রদান করেন। এই পরিবারের এক কৃতী পুরুষ ছিলেন রবি দত্ত। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি। রবি দত্তই ছিলেন নেতাজীর মাতুল। বাল্যাবস্থায় সুভাষচন্দ্র বেশ কিছুকাল মাতুলালয়ে অতিবাহিত করেন। বরানগরে সন্ত্রাসবাদীদের প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির কথা উল্লেখ্য। ৩০-এর দশকে বিভিন্ন সময়ে তিনি বরানগরে আত্মগোপন করেছিলেন। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজঃফর আমেদও এস. পি. ব্যানার্জী রোডের একটি বাড়িতে থাকতেন। কথাপ্রসঙ্গে ডঃ অতুল সুর জানিয়েছেন, স্বাধীনতাউত্তর পর্বে, ৫০-এর দশকে বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও বরানগরের একটি বাড়িতে এসে থাকতেন।

সুতরাং বরানগরে ব্যক্তিবর্গের অবস্থান চিহ্নিতকরন নেহাত সামান্য কাজ নয়। অনুসন্ধানকালে বহু খ্যাতনামা পুরুষেরই সন্ধান মেলে। বিখ্যাত 'রেইস এণ্ড রায়ত' পত্রিকার সম্পাদক ও বঙ্কিম-সুহৃদ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৮৯৪) ছিলেন বরানগরের বাসিন্দা। তাঁর সম্পাদিত 'Mukherjee's Magazine'-ও ছিল বিখ্যাত পত্রিকা। বরানগর পুরসভার শতবর্ষপূর্তি স্মারক

গ্রন্থের পৃঃ ৩০-এ তাঁর নাম ছাপা হয়েছিল শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়। এটা ভুল। তাঁর নামে আলমবাজারে একটি বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যালয়। তাঁর জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য F. H. Sirkin প্রণীত Indian Journalist গ্রন্থটি (১৮৯৫)। মাইকেল সুহৃদ গৌরদাস বসাক (১৮২৬-১৮৯৯) বরানগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তবে কি, গৌরদাসও কোন সময়ে বরানগরের বাসিন্দা ছিলেন? এ-ব্যাপারে কোন তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। প্রখ্যাত যাদুকর গনপতি চক্রবর্তী (১৯৩৯-?) ইলিউশন ট্রী এবং ইলিউশন খেলাদুটি যাঁকে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছিল, তিনি শেষজীবনে বরানগরে এসে বসবাস করেছিলেন। কাশীনাথ দত্ত রোডে রামলাল ব্যানার্জী লেন ছাড়িয়ে সিঁথির দিকে এগুবার পথে ডানদিকে দালানদেওয়া যে-বাড়িটি আছে সেটিই ছিল যাদুকর গনপতির বাড়ি। বরানগর সম্পর্কিত গবেষণায় যে গ্রন্থটি অপরিহার্য সেই 'নবযুগের সাধনা'র লেখক কুলদাপ্রসাদ মল্লিক কিন্তু বরানগরের বাসিন্দা ছিলেন না। 'সুবর্ণরেখা' প্রকাশনীর ইন্দ্রনাথ মজুমদার জানিয়েছেন কুলদাপ্রসাদের বাড়ি ছিল হাওড়ায়। তবু, কুলদাপ্রসাদকে (১২৯১-১৩৪৪) বরানগরের একজন আত্মীয় ভেবে নিতে আপত্তি নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত দর্শনে এবং সংস্কৃতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য 'শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ প্রসঙ্গে।'

বরানগরের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্ভবত দু'জন মানুষকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা চলে। এঁরা হলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত পদার্থবিদ প্রশান্তচন্দ্র (১৮৯৩-১৯৭২), পরবর্তীকালে হয়েছিলেন সংখ্যাবিদ বা পরিসংখ্যানবিদ। প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, পদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে নৃতত্ত্ব, আবহাওয়াতত্ত্ব ও পরিসংখ্যান প্রভৃতি নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষনা কর্ম—এই ছিল প্রশান্তচন্দ্রের বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের সোপান। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বরানগরে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা (দ্র. প্রতিষ্ঠান পরিচিতি)। তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো (F.R.S) নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের আর একটি পরিচয় এই যে তিনি

ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতমদের একজন। দশবছর (১৯২১-৩১) তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের কর্মসচিব। তাঁর ও রবীন্দ্রনাথের পরস্পরকে লেখা বহু পত্রাবলী পরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও বিজ্ঞানতপস্বী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন তাঁর অন্যতম সুহৃদ। প্রশান্তচন্দ্র তাঁর কর্মবহুল জীবনের অর্ধেকেরও বেশী সময় অতিবাহিত করেছেন এই বরানগরে—আই. এস. আই.-এর অভ্যন্তরস্থিত 'আম্রপালী' নামের বাড়িতে। এই বাড়িটিতে বিশ্বের বহু গুণিজনের পদার্পণ ঘটেছে। বাড়িটির নামকরণও রবীন্দ্রনাথের। প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী নির্মলকুমারী মহলানবিশের কথাও স্মর্তব্য। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সম্বোধন ছিল 'রাণী'। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের পর যিনি বরানগরের অধিবাসী হয়ে এই স্থানটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তাঁর নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। পিতৃদত্ত নাম ছিল প্রবোধকুমার। .৯২৮ সালে বিচিত্রা পত্রিকায় 'অতসীমামী' গল্প দিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। প্রস্থানের আগে স্বল্পায়ু জীবনে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেলেও, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, প্রভৃতি উপন্যাস ও বহু সার্থক ছোটগল্পের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিল তিল ক'রে যেভাবে নিজেকে নিঃশেষিত হতে দিয়েছিলেন, তা আমাদের মনে রাখা দরকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগরে আসেন ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ এ। আজীবন থেকেছেন .৮৬-এ, গোপাললাল ঠাকুর রোডের বাড়িতে। তাঁর সাহিত্য জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়েই মানিকবাবু এসেছিলেন বরানগরে। নানাভাবে বঞ্চিত এই আপোষহীন মানুষটির মানবদরদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় খুব বেশী ক'রে পাওয়া যায়, যখন দেখি তাঁর ডায়েরীর পাতায় পাতায় প্রতিবেশী মানুষদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে লেখা রয়েছে। (দ্র. যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত অপ্রকাশিত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়) জীবিতকালে বসবাস ক'রে যিনি বরানগরের গৌরবকে উর্দ্ধমুখী করলেন, মৃত্যুর পঁচিশ বছর বাদেও বরানগরে তাঁর নামে একটিও সরণীর নাম রাখা যায়নি দেখে, আমাদের প্রায়শ লজ্জিত হওয়া উচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুধু যে তাঁর ডায়েরীতেই বিবৃত আছে তা নয়, এখনও বরানগরে বহু প্রত্যক্ষদর্শী আছেন যাঁরা মানিকবাবুর যন্ত্রনাময় দিনগুলির কথা মনে রেখেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুক্র

ধ'রে বরানগরে একসময় প্রগতিশীল ও বামপন্থী চিন্তাধারার সামিল বহু প্রখ্যাত মানুষের আসা যাওয়া ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বরানগরের উপকণ্ঠে সংচাষী পাড়ায় বাস করতেন।

বাংলা নাট্যজগতের দু'জন প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ এই বরানগরে তাঁদের দিন অতিবাহিত করেছেন। এঁরা হলেন সতু সেন ও শিশিরকুমার ভাদুড়ি। বাংলায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চরীতির উদ্ভাবক সতু সেন বরানগরের বেহালাপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন দীর্ঘকাল (দ্র. সতু সেন : আত্মস্মৃতি, ও অন্যান্য প্রসঙ্গ; সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত)। বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ির (১৮৮৯-১৯৫৯) পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। জীবনের শেষ পর্বে তিনি বরানগরে বি. টি. রোড—ঘোষপাড়ার সংযোগস্থলে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। এই বাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ভারত সরকারের প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির মরদেহ বরানগর সংলগ্ন রামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে দাহ করা হয়। বর্তমানকালের যাত্রাজগতের প্রখ্যাত অভিনেতা শান্তিগোপালও বরানগরের অধিবাসী। সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের আরও বহু মানুষ নানা সময়ে এই বরানগরে থেকেছেন। এঁদের মধ্যে পরিমল গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। বি. টি. রোড থেকে কবিতা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসস্থানও ছিল বরানগর কুঠিঘাটে। বরানগরের আর এক কৃতী সন্তান কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রাক্তন প্রধান কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় একদা বরানগর-সম্পর্কিত গবেষণার কথা বলেছিলেন (দ্র. আমাদের সহরতলীর সত্বা ও তার ভবিষ্যৎ; পুর-শতবর্ষ স্মারক পুস্তিকা)। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বরানগরের অধিবাসী। তাঁর পুত্র প্রখ্যাত অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়। অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন নিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত আপনজন। এঁদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রখ্যাত শিল্পী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রায়শ বাল্যকালে বরানগরে তাঁদের বন্ধুগলির বাগানবাড়িতে (বর্তমানে লুপ্ত) অতিবাহিত করেছেন।

তাঁর 'ভারত শিল্প ও আমার কথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় তাঁর পিতামহ এই জমি কিনেছিলেন কুখ্যাত রঘু সর্দারের (রঘু ডাকাত) কাছ থেকে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত ডঃ অতুল সুরও দীর্ঘকাল বর্তমান বরানগরের বাসিন্দা। ক্রীড়া-ক্ষেত্রে সুপরিচিত, একদা টেস্ট-অঙ্গনে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত ক্রিকেটার নীরোদ চৌধুরি এবং সুখ্যাত সুরকার অনিল বাগচি এই সেদিনও বরানগরের মানুষ ছিলেন।

কত যে প্রথিতযশা ব্যক্তি ববানগরেব অধিবাসী হ'য়ে স্থানটিকে গৌরবান্বিত ক'রেছেন, তার বিস্তারিত তালিকা সংগ্রহ কবা এক দুঃসাধ্য কাজ। বহু ব্যক্তির কথা, স্বাভাবিকভাবেই অনুল্লেখ্য থেকে গেল। তবু, আমাদের আশা, যে-স্থানে বিভিন্ন সময়ে এত খ্যাতিমান ব্যক্তিব সমাবেশ ঘটেছিল, এবং আজও ঘটে চলেছে, সেই স্থানটির সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে ভবিষ্যতের কোন গবেষণা প্রয়াসকে এই তথ্যগুলি সহায়তা করবে।

(ঘ) বরানগরে সাহিত্যচিন্তা

বরানগরের সাহিত্যের পরিবেশ কিছু নতুন নয়। বহু পত্র-পত্রিকা গত দেড়শো বছরে বরানগর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-শ্রমজীবী' মূলত সাহিত্য-পত্রিকা না-হলেও, ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় তৎকালীন বাংলা গদ্যের একটি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিলো 'শ্রমজীবী' নামে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি কবিতা। শশিপদ কন্যা বনলতা দেবীও 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রটি সম্পাদনা করতেন। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরাহনগর' পত্রিকাটিও এ বিষয়ে স্মর্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ-শতাব্দীর ৩০-এর দশক অবধি বরানগরে সাহিত্য সংক্রান্ত কোন প্রকাশনার কথা জানা যায় না। তবে, হিন্দু মেলার অধিবেশন বা বরানগরের উপকণ্ঠে এমারেল্ড বাওয়ারে কলেজ সম্মেলনে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি সম্পর্কে অবশ্য একাধিক তথ্যপ্রমাণ মেলে। অবশ্য ১৯৭৮ সালে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দু'শ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দু'শ বছরের বাংলা বই' শীর্ষক তালিকায় (পৃঃ ৩৭) 'বটতলার বই' অংশে লেখা

সাপ্তাহিক পরাগ

THE WEEKLY PARAG

সম্পাদক— ডাঃ শ্রীঅজিত শঙ্কর দে

১ম বর্ষ 1st Year	১৫ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪৩ SATURDAY, 27th FEBRUARY, 1937.	২০শ সংখ্যা No 20.



প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা।

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী কর্ত্তৃক পরিচালিত।

১ম বর্ষ আশ্বিন— ১৩৪১
১ম সংখ্যা।

সম্পাদক
শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

পরাগ ও শ্রীবিশ্বরূপ পত্রিকার প্রচ্ছদ

বরাহনগর

নিউ তরুণ সিনেমা

ফোন—বি, বি, ৪৮৭০

শনিবার ২০শে ডিসেম্বর হইতে ৭দিন

মহাকবি কালিদাসের মানসকন্যা

শকুন্তলা

শ্রেষ্ঠাংশে—ধীরাজ, মনোরঞ্জন, জ্যোৎস্না গুপ্তা, সত্য, মনোরমা, সন্ধ্যা, মীরা, অহী, জয়নারাণ।



শনিবার ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ৪দিন

ফিল্ম কর্পোরেশনের শ্রেষ্ঠ হিন্দি চিত্র

কয়েদী

শ্রেষ্ঠাংশে—নজ্রেকার, মেতাব, কমলা, মনিকা দেশাই

বুধবার ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ৪দিন

নিউ থিয়েটার্সের সর্ব্বজনপরিচিত মধুর চিত্র

জীবন মরণ

শ্রেষ্ঠাংশে—লীলা দেশাই ও সায়গল।



জানুয়ারী মাসের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

১। জেসি জেমস

(বহু বর্ণ রঞ্জিত চিত্র)

শ্রেষ্ঠাংশে—হেনরি ফণ্ডা, টাইরোণ পাওয়ার

২। আহুতি

শ্রেষ্ঠাংশে—ধীরাজ, প্রতিমা, ভি, জি

৩। পুনর্ম্মিলন

শ্রেষ্ঠাংশে—কিশোর সাহু, স্নেহপ্রভা



পরাগ পত্রিকায় প্রকাশিত নিউ তরুণ সিনেমার বিজ্ঞাপন

১৯৪০ সাল

আছে 'ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী। শৈলনন্দিনী নাটক। বরাহনগর, ১৮২৯ সং। ৪, ৬০ পৃঃ। সুচারু যন্ত্র, ৩৩৬ চিতপুর রোড, গরাণহাটা।' কে এই ভূপেন চৌধুরী আমরা জানি না। উনিশ শতকের শেষ পর্বে শ্রীকান্ত চৌধুরী লেনে 'হিন্দু সংকর্মমালা প্রেস' (১৮৯২) নামে একটি ছাপাখানা চালু হয়। এই ছাপাখানায় কোন সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছিল কি না জানা যায় না। অবশ্য সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ যথার্থভাবে গড়ে উঠতেও বেশ সময় নিয়েছিল। জমিদার ও বাবু শ্রেণীর পাশাপাশি গুটিকয় বর্ধিষ্ণু পরিবার বাদে বরানগরের এক বিরাট অংশজুড়ে ছিল নানা পেশায় নিযুক্ত একেকটি সম্প্রদায়। ফলে যে সামাজিক পরিবেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি ব্যাপকতা লাভ করে, সেই পরিবেশ থেকে বরানগর দূরে ছিল।

বর্তমান শতকের ৩০-এর দশকের গোড়া থেকে যখন বরানগরে পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রটি ব্যাপকতা লাভ করতে শুরু করল, তখন থেকেই সাহিত্য প্রকাশনা একটি ভূমি তৈরীর সুযোগ পেল। বেনেপাড়ার অধিবাসী কাগজ-ব্যবসায়ী হরিশঙ্কর দে মহাশয় গীতা, চণ্ডী ও ভাগবতের অনুবাদ ক'রে ও 'বাণিজ্য-দর্পণ' পত্রিকা প্রকাশ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৯৩৪ সালে তাঁরই পুত্র ডঃ অজিতশঙ্কর দে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো 'পরাগ' পত্রিকা, প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক কিস্তীতে। পঞ্চাশ দশকের শেষ অবধি 'পরাগ' প্রকাশিত হয়। পরাগ কে ঘিরে কোন বিশেষ সাহিত্য আন্দোলন দানা বাঁধেনি। বাংলা সাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য রচনাও পরাগে প্রকাশিত হয়নি। তবু, দীর্ঘকাল ধরে এই পত্রিকা প্রকাশ ক'রে অজিতশঙ্করবাবু তাঁর অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতির স্বাক্ষর রেখেছেন। পরাগের প্রচার সংখ্যা ছিল চার হাজারের বেশী। আজকের বাংলা সাহিত্যের অনেক রথী-মহারথীর প্রথম জীবনের বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল পরাগে। অজিতশঙ্কর দে সম্পাদিত আরও দুটি পত্রিকার নাম যথাক্রমে 'বরানগর সমাচার' (১৯৪৭ ৪৮) ও 'হোমিওপ্যাথি পরিচারক' (১৯২৬-১৯৩৪)। 'বরানগর সমাচার' এখন দুষ্প্রাপ্য। বা অনেকের কাছে থাকলেও সহজে লোকসমক্ষে বের করেন না।

কোন একটি স্থানে একাধিক সাহিত্যসেবীর অবস্থান সেইস্থানের সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের সততই পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা যোগায়। মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরানগর বাসকালে স্থানীয় কোন পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত রচনা আমরা পাইনি। তবে, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মানিকবাবু দ্বিধাহীনভাবে যোগদান করতেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সৃষ্টিশীল সাহিত্যের আর যে-দুজন বরানগরের বাসিন্দা হিসাবে দীর্ঘকাল বসবাস করছেন, তাঁরা হলেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। কুঠিঘাট নিবাসী সঞ্জীববাবুর পৈতৃক ভিটে এই বরানগরে। যে 'শ্বেতপাথরের টেবিল' তাঁকে বাংলা সাহিত্যে পাকাপাকিভাবে আসন ক'রে দিয়েছে, ভেবে নিতে পারি যে সেই টেবিলের অবস্থান এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির অধিকাংশের ঠিকানা নিঃসন্দেহে বরানগরে। তাঁর 'পায়রা' উপন্যাসেও বরানগরের অনুষঙ্গ ঘুরে-ফিরে এসেছে। স্থানীয় পত্র-পত্রিকাতেও সঞ্জীববাবুর লেখা অহরহ প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকে 'ছোটগল্প, নতুন রীতি' এই সাহিত্য-আন্দোলনের সামিল হয়ে যেকজন গল্পকার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন কর্ম আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। বিখ্যাত কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর একজন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যের একটি ধারা প্রবর্তনে এখনও প্রয়াসী। পেঙ্গুইন প্রকাশিত 'Indian Writing Today' বইতেও তাঁর গল্প 'বিপ্লব ও রাজমোহন' স্থান পেয়েছে। কাশীনাথ দত্ত রোডে তাঁর বাড়ি থেকেই বাংলায় প্রথম 'মিনিবুক' প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, আল মাহমুদের কবিতা, মৃণাল সেনের সাক্ষাৎকার—এইসব বৈচিত্র্যময় বিষয় নিয়ে 'মিনিবুক' একসময় যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া, বরানগর থেকে প্রকাশিত বহু সাহিত্য-পত্রিকার পেছনে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণা ও উৎসাহ অনস্বীকার্য। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত আরও এক নিবিষ্টচিত্ত সাহিত্যপ্রেমী এই বরানগরের বাসিন্দা। তিনি কবি অরুণ ভট্টাচার্য। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে, তাঁর সম্পাদনায় 'উত্তরসূরি' পত্রিকা এই বরানগর থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত বিখ্যাত মনীষীই তাঁদের মননসঞ্জাত রচনাকর্ম এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করেছেন। মূলত একটি কবিতার পত্রিকা হিসাবে উত্তরসূরি'র বিপুল অবদানের কথা আজ স্বীকৃত। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ

দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, মনীশ ঘটক, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আলোক সরকার থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমেত বহু নবীন কবিদের সাম্প্রতিকতম কবিতা ছাড়াও সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, বিনয় ঘোষের মত বুদ্ধিজীবীর রচনাও প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। এমন একটি পত্রিকা সম্পাদনার দুর্লভ কৃতিত্ব অবশ্যই অরুণ ভট্টাচার্যের প্রাপ্য। তবে, আমাদের ইচ্ছা, একটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা হিসাবে কবিতা ও সঙ্গীতের গণ্ডী পেরিয়ে 'উত্তরসূরি' অগ্রসর হোক্ সমাজ-ইতিহাসের আঙ্গিনার দিকে। বরানগর-কাশীপুরের সীমান্তরেখায় দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ। তাঁর নানা রচনাকর্মে বরানগর রসদ হিসাবে কাজ করেছে অবশ্যই।

ভারত শ্রমজীবী, অন্তঃপুর, পরাগ, উত্তরসূরি, মিনিবুক ছাড়াও বরানগর থেকে অজস্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ও হবে। পত্র-পত্রিকা ছাড়াও কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়েও এই স্থানে সাহিত্য-প্রীতির একটি স্রোত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত নিজস্ব পত্র-পত্রিকাগুলিও বেশ আকর্ষণীয়। এর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব পত্রিকা 'লেখন'। বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু দেওয়াল পত্রিকা আজও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বরানগরে আর একটি সংস্থা দীর্ঘদিন ধ'রে সাহিত্যসেবায় ব্রতী রয়েছে। কবিকঙ্কণ হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার নাম বঙ্গীয় কবি পরিষদ (৩৫, ব্যারিষ্টার পি মিত্র রোড, কলি-৩৫)। সাহিত্যের বিচারে এঁরা হয়ত কিঞ্চিৎ প্রাচীনপন্থী, তবু, সাহিত্য সাধনায় এঁদের নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। বাংলার প্রথম বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বরানগরের সিঁথি অঞ্চলে ১৯৪০ সালে। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী আয়োজিত ঐ সম্মেলন উপলক্ষ্যে বহু বিদগ্ধজনের সমাবেশ ঘটেছিল এই স্থানে। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর নিজস্ব পত্রিকা 'বিশ্বরূপে'ও ধর্মীয় চিন্তাধারা সংক্রান্ত বহু উল্লেখযোগ্য রচনা একদা স্থান পেয়েছিল।

আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। কবিতা-গল্প-নাটক সর্বক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু ও কাঠামো নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। এই প্রবাহকে অস্বীকার কববার উপায় নেই। আবার এর প্রভাবে বহু হুজুগ-মত্ত প্রয়াসও চোখে পড়ে। এই ঘটনা থেকে বরানগর, স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়। কোন্‌টি প্রকৃত ও সৎ সাহিত্যপ্রয়াস, কোন্‌টি মেকী তা বিচারের ভার দায়িত্বশীল পাঠক ও সমালোচকদের ওপর ন্যস্ত। আমরা ইত্যবসরে, ববানগর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির একটি তালিকা (প্রথম প্রকাশের আনুমানিক সময়সহ) বিবৃত করলাম।

শ্যামলী (১৯৫৫-৫৬), শিলীন্ধ্র (১৩৭৫-৭৬), প্রস্তুতি (১৩৬৬), সারস (১৩৭৭), ফ্যান্টাসী (১৩৭০), প্রান্তরেখা (১৩৭৯), রূপ-পত্রিকা (১৩৭২), নির্ণয় (১৩৮৩), উপমা (১৩৭৬), গাছ-গাছালি (১৩৭৭), জাগরণ (১৩৮১), আরেক (১৩৭৫), প্রাচীন সাহিত্য, আগামীকাল, তৃতীয় চিন্তা (১৩৬৯), সংশপ্তক, বিজ্ঞানমেলা, লেখনী, (১৩৭৪) কান্তার, নিষাদ (১৩৭৭)।

(৬) সন্ত্রাসবাদে বরানগর

পরাধীন ভারতবর্ষে যখন এই শতকের গোড়া থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন থেকেই 'বরানগর' এমন বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী কর্মীর গোপন কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমি ছিল, ইংরেজদের চোখে যাঁরা ছিলেন হাই-ডাউটস্। পরবর্তীকালে তিরিশের দশকে বরানগরের বেশ কিছু তরুণ সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা বহু চেষ্টা করেও বরানগরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কোন প্রামাণ্য দলিল জোগাড় করতে পারিনি। অবশ্য বরানগরের কাছে আড়িয়াদহে ১৯১৪ সালের বিখ্যাত ডাকাতির কথা জানা যায় সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে। 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের বরানগর-কেন্দ্রিক কার্যকলাপ ছিলো তৎপরতায় ভরা। আমরা এও জেনেছি ২৫ অথবা ৮নং যোগেন্দ্র বসাক রোডে যোগেন্দ্র বসাকের বাসগৃহে নিরালম্ব স্বামী বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আত্মগোপন অবস্থায় ভগৎ সিং এসেছিলেন সাক্ষাৎ করতে। সেটা ১৯২৮

সাল। একদা বরোদা মহারাজের দেহরক্ষী (১৯০২) ও অরবিন্দের সহকর্মী যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলায় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি ঠনের অন্যতম পুরোধা। সন্ত্রাসবাদের স্থানীয় দলিল আমাদের হাতে না থাকায়, এক্ষেত্রে আমরা বরানগরের অধিবাসী কিছু সন্ত্রাসবাদীর নাম প্রকাশ করেই বিরত হলাম। বরানগর হয়ত বুড়িবালাম, চট্টগ্রাম, চন্দননগর হয়ে উঠতে পারেনি, তবু আশা করবো, ভবিষ্যতে এ-সম্পর্কে প্রামাণ্য দলিল প্রকাশিত হবে।

খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১২৯৮-১৩৪৬), যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল (১৮৯৫-১৯৫৮), যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ প্রামাণিক (১৮৯১-১৯৫৬), সুবল মাইতি, সুনীলকৃষ্ণ বিশ্বাস, বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস, হিরণ্ময় বিশ্বাস, প্রফুল্ল দত্ত, অনিল দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

(চ) বাংলা সাহিত্যে বরানগরের উল্লেখ

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে ?"

নিশাকর। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গোবিন্দলাল। নিবাস ?

নিশাকর। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

(কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

আমাদের সেই বরাহনগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নিচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরো বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাধাসিধা ও অত্যন্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র ছিল না। এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত

ল্যাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মর্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

(নিশীথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তাই যখন একে একে আমার দৈত্যগুলির অনেকেই পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলতে, কন্সর্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা-বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম।

(পয়লা-নম্বর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভুলে ভুলে ঘুরে
আছি বেশ রগড়ে
দেখি ইসলাম ভায়াও বাঁধলে বাসা
বরাহনগরে

(কলকাতার ভুল—দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিত)

তৎপরে অন্য ভক্তগণ আসিয়া বাবুর আজ্ঞামত আতর মর্দ্দন করাইলেক, কাঁচাগোল্লা দিয়া মাথা ঘষাইয়া দিলেক, নির্মল পুষ্করিণীর জলে স্নানকালে জল-ক্রীড়াছলে কুতূহলে ভক্তগণের বহুসমাদরে ভক্তগণেরা গোলাপজলে শরীর ধৌত করাইলেক সেই সময়ে খলিপা এক গাঁটি বস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলেন শান্তিপুর অম্বিকা বাদাগাছি ঢাকা চন্দ্রোকোনা খাসবাগান বরাহনগর প্রভৃতি নানাস্থানের শাড়ী শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে নীলপেড়ে অবিজপেড়ে বরানগুরে ডুরে ব্যক্তিবিশেষে ব্যক্তিবিশেষে প্রদান করিলেন।

(নববাবুবিলাস—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(ছ) দৈনিক ও সাময়িক পত্রে বরানগর

বরাহনগরে ডাকাতি

৩০ এ এপ্রিল (১৭৮৯ খ্রী) তারিখের, গেজেটে প্রকাশ হয়—"গত বৃহস্পতিবার রাত্রে একদল অস্ত্রধারী ডাকাত, বরাহনগরের দত্তরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে ডাকাতি করিতে যায়। বাড়ীতে যাহা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল সবই ডাকাতেরা লইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য দশহাজার টাকা। ডাকাতেরা যখন লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন চট্টোপাধ্যায় তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন—"আচ্ছা। এখন তোমরা যাও। পরে আমি তোমাদের দেখিয়া লইব। তোমাদের সনাক্ত করিবার জন্য আমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আদালতে তোমাদের ভাল করিয়া দেখিব" এই কথা শুনিয়া ডাকাতেরা পুনরায় ফিরিয়া আসে—এবং অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার শরীরের চারি পাঁচ স্থানে "রাম দা" দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। এই চট্টোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ তুলা-ব্যবসায়ী। ইহার মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করিবার জন্য আনা হইলে—ইহার স্ত্রীও সেই সময়ে সহমরণে যান।

কলিকাতা গেজেট ৩০. ৪. ১৭৮৯

বিবাহ

মো° জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনারায়ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ সহোদর প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পরস্পর পঞ্চভ্রাতা সংপ্রীতিপূর্ব্বক সুখ্যাত। এঁহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফেব্রুয়ারি বা°লা ২৮ মাঘ শনিবারে মোং বরাহনগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিমপারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব বিছানাতে

মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি প্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মীরি প্রভৃতি প্রধান ২ গায়ক আর ২ অনেক তরফাও আসিয়াছিল এসকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়। এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় ঘটক ও কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহাদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করনে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে। এবং বিবাহের দিবসে মোং কাশীপুরের শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজার বাগানের নিকট হইতে গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটী পর্য্যন্ত এক ক্রোশ পথ বান্ধা রোশনাই হইয়াছিল·· ···

সমাচার দর্পণ ৯ই মার্চ ১৮২২

বরানগরে ইঙ্গলণ্ডীর পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা

কিয়ৎকাল হইল হইল সম্বাদপত্রে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমিদারের দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার আবশ্যক বোধ করিয়া ঐ অঞ্চলস্থ অতি দরিদ্র স্বদেশীয় লোকেরদের বালকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যায় উপকার প্রদানার্থে এক পাঠশালা স্থাপন জন্য স্থির করিলেন এইক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ঐ বিদ্যালয় ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীদের নাম দৃষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি ইহাদের তুল্য পদবী ও ধনি অন্যান্য মান্য মহাশয়েরা তাহায় সাহায্যে করেন তবে এই নূতন বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ইঙলিসম্যান, ২৫শে জুন ১৮৩৯

রাষ্ট্রপতি সম্বর্ধনা বরাহনগরে আয়োজন

রবিবার ১৭ এপ্রিল—সন্ধ্যা ৭টায় বরাহনগর কাশীনাথ দত্ত রোডে রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতিত্বে এক সভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা করা হইবে।

অপরাহ্ন ৫টার সময় বাগবাজার পুলে সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা এবং তৎপরে তাঁহাকে লইয়া কাশীপুর ও বরানগরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রদক্ষিণ করা হইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪৫

New College at Baranagar

Amrita Bazar Patrika

Receieving of congestion in Calcutta Colleges should be the principal factor that should govern the selection of rites for the six additional dispersal colleges to be establihsed by the Union Refugee Rehabilitation Ministry. Another factor is as almost equal importance—relieving of congestion in Calcutta's public vehicles, buses and trams. The students of Baranagor and Dakshineswar have to come to calcutta in terribly over crowded buses. One of the six colleges should certainly be located at Baranagor, which is one of the oldest and most densly populated of the suburban areas. In recent years it has also attracted a large number of refugees. Baranagar should not be without a degree college. A college must start functioning at Baranagar from the commencment of next academic session.

(Amrita Bazar Patrika, 12. 9. 55)

বরানগর-কাশীপুরের হত্যাকাণ্ড

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলে যা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক খুনোখুনি একটা নতুন স্তরে উঠল ("নামল" বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়)। এখানে ওখানে দুয়েকজন খুন জখম নয়, অথবা বারাসাতের ঘটনার মতো গোপনে পাইকারী খুন করে লাশ পাচার করা নয়, একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে ধরে ধরে কোতল করা এবং একটা বড় অঞ্চল জুড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালিয়ে যাওয়া। এটাকে কি বলা হবে? রাজনৈতিক খুনোখুনি? দাঙ্গা, গণহত্যা? পশ্চিমবঙ্গে যেসব বীভৎস হত্যাকাণ্ড গত কয়েকমাস যাবৎ চলছে সেগুলির মধ্যেও এমন ঘটনার নজীর পাওয়া যাবে না। ১৪ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের মানুষ মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ; মোট কতজন যে খুন হয়েছেন তার কোন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসাবই নেই। তবে অনেকগুলি লাশ যে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সংবাদ পুলিশের কাছেও আছে। আহতদের তালিকার মধ্যে নারীরাও আছেন। কিছু দোকানপাটও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ছাড়া আর কখনও একটি মহল্লার ভিতরে এই পরিমাণ রক্তপাত ও অন্যান্য উপদ্রব হয়নি।

যুগান্তর সম্পাদকীয়, ১৫. ৮. ৭১

(এই গণহত্যাটি ঘটেছিল ১২ ও ১৩ই অগষ্ট, ১৯৭১)।

সমীক্ষা

কেন এই সমীক্ষা

সমীক্ষা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ যদি 'Survey' হয়, তাহলে Chambers' Twientieth Century Dictionary অনুসরণ ক'রে দেখা যাচ্ছে যে 'সার্ভে' কথাটির অর্থ 'to view comprehensively and extensively, to examine in detail. অথবা 'a general view, on a statement of its results, an inspection ইত্যাদি। রাজশেখর বসু প্রণীত 'চলন্তিকা'য় 'সমীক্ষা' শব্দের অর্থ লেখা রয়েছে 'পূর্বাপর বিবেচনা। দৃষ্টি, অন্বেষণ।' এইসব অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে সমীক্ষা পরিষদ কৃত 'সমীক্ষা' অংশটি যথোপযুক্ত হয়েছে কিনা, তা বিচারের ভার সচেতন পাঠকের ওপর। কিন্তু এই আভিধানিক অর্থের পাশাপাশি পরিসংখ্যান তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও 'সমীক্ষা' অংশটির বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। যেহেতু পরিসংখ্যান কথাটি সংখ্যাগত পর্যবেক্ষণ এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি, এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আমরা, সমীক্ষা পরিষদের সদস্যরা কেউই সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ নই। তবু, অজস্র পরিসংখ্যানে ভারাক্রান্ত এই সমীক্ষা-প্রকাশের অভীপ্সা কেন, এ-প্রশ্ন স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরে বলার এই যে একটি স্থানের সমকালীন হৃৎস্পন্দনকে ধরে রাখার একটি যৎসামান্য প্রয়াসেরই প্রকাশ ঘটেছে 'সমীক্ষা' অংশে। যেহেতু এই গ্রন্থের অপর অংশ 'ইতিহাস', তাই ওই ইতিহাস পার হয়ে এসে যে সমকাল বা বর্তমানকে আমরা পারিপার্শ্বিক হিসাবে আমাদের মধ্যে পেয়েছি, তার চেহারাটি কেমন—এই প্রশ্নে আলোড়িত হয়েই সমীক্ষা প্রকাশের উদ্যোগ। এবং শুধুমাত্র এই কারণটুকু ছাড়া একটি সম্ভাবনাও আমাদের আলোকিত করেছে, যার স্থান ও কাল ভবিষ্যতে নিহিত। সম্ভাবনাটি এই যে, বর্তমান 'সমীক্ষা' অংশটি ভবিষ্যতে কোনো না কোনভাবে 'ইতিহাস' হয়ে উঠতে পারে। আজ বরানরের ইতিহাস-সন্ধানকালে আমরা তথ্যগত যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, আশা করি ভবিষ্যতের যোগ্যতর গবেষকবৃন্দ এই সমীক্ষার মাধ্যমে কিছু কম অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। সেদিক থেকে এই গ্রন্থের 'ইতিহাস' ও 'সমীক্ষা', দুটি অংশই পরস্পরের পরিপূরক।

আমাদের দেশে এই ধরনের সমীক্ষা গ্রহণ সাধারণত সরকারী উদ্যোগে হ'য়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধ'রে, বহু বিশেষজ্ঞ ও কর্মীর সমবায়ে গৃহীত হয় এক-একটি সমীক্ষা। এসবের জন্য রয়েছে সেণ্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশন

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন, জনগণনা অধিকার, ডিরেক্টোরেট অফ ইকনমিক্স অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকস প্রভৃতি সংস্থা। সরকারী উদ্যোগ মানেই বৃহৎ কর্মকাণ্ড। তার পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে মতামত দেবেন বিশেষজ্ঞরা। তবে, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সরকারী পরিসংখ্যানগুলি গবেষণা-কাজের পক্ষে অবশ্য জরুরী। এগুলির মধ্যে রয়েছে সেনসাস-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, ইণ্ডিয়ান এগরিকালচারাল স্ট্যাটিসটিকস, ইনডেক্স নাম্বার অফ হোলসেল প্রাইসেস ইন ইণ্ডিয়া, অ্যানুয়াল সার্ভে অব ইনসস্ট্রিজ, দি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বুলেটিন, অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দি ন্যাশন্যাল ইনকাম প্রভৃতি। রাজ্য স্তরেও প্রতি বছর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, যার ভেতরে থাকে গত একবছরের পরিসংখ্যান। এছাড়া স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর তরফেও নানা পরিসংখ্যান প্রকাশের ব্যবস্থা আছে। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বলার যে, প্রায়শই এই পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত গ্রন্থ বা বুলেটিনগুলি প্রকাশিত হয় বিলম্বে। ফলে, অনেকক্ষেত্রেই কাজের অসুবিধা হয়। এর পাশাপাশি আরও একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্থানীয় ছোট-খাটো গ্রন্থাগারগুলিতে এই জাতীয় গ্রন্থ চোখেই পড়ে না। সম্ভবত চাহিদার অভাবই এর কারণ। কিন্তু এ-ব্যাপারে সরকারী, বেসরকারী ও গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষের মিলিত উদ্যোগে সমস্যাটির আংশিক সমাধান সম্ভব। সমীক্ষা-গ্রহণের সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আই. এস. আই-এর মতো বহু বেসরকারী উদ্যোগও দেখা যায়। এগুলি অনেকক্ষেত্রেই নানা উন্নয়ন কর্মসূচী বা কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্টের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ কখনোই এইসব পরিসংখ্যানের প্রকাশিত চেহারাটি চাক্ষুষ করতে পারেন না। এমনিতেই সাধারণ মানুষের মনে পরিসংখ্যান-ভীতি সহজাত। কিন্তু পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদি তাদের কিছুমাত্র উৎসাহিত করা যায়, তাহলে এই ধরনের কাজের পক্ষে তা যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। কিঞ্চিৎ এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সমীক্ষা পরিষদের তরফে 'সমীক্ষা' গ্রহণের পর বিশ্লেষণ ছাড়াই তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সমীক্ষা পরিষদের উদ্যোগে যদি কিছুমাত্র স্বকীয়তা থাকে, তবে তা কখনোই উন্নাসিকতা ও আত্মতৃপ্তির কারণ ঘটাবে না।

তথ্যের ধর্মই এই যে, যত রূঢ় ও নির্মমই তা হোক্ না কেন বাস্তবের

প্রয়োজন মেটাতে তাকে হাজির হতে হয় স্বমূর্তিতেই। শব্দার্থতত্ত্বের সুভাষণ (Euphemism) এবং দুর্ভাষণ (Pejoration) রীতি বর্ণনাত্মক ইতিহাসে প্রয়োগ করা যায় অনায়াসেই। বিকৃত না হলে সংখ্যাভিত্তিক তথ্যের সে ক্ষমতা নেই। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বহুরূপী সে হতে পারবে না কখনো। আব বোধহয় একারণেই সে ক্ষমতাশালীও বটে। বিশেষ ক'রে ঘটনার নিখুঁত দিকনির্দেশের কাজে তার ভূমিকা নীরব ও আবেগবর্জিত হলেও ব্যাপক। তাই তথ্য প্রকাশের অন্যতম শর্ত হলো বারবার পর্যবেক্ষণের চালুনি দিয়ে, তার অভ্রান্ততা নিরূপণ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, সমীক্ষা পরিষদের পক্ষে এই কাজটি সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই, তথ্যের একচুল হেবফেরেব জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে, অনেকক্ষেত্রে যে তথ্যের উৎসমুখটিই ছিল ত্রুটিপূর্ণ, সেকথা কুণ্ঠিতচিত্তে হলেও, বলতেই হচ্ছে। প্রধানত এই কারণেই, পবিসংখ্যানেব ভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রাইমারী ডাটা', তার সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু অসঙ্গতিও থেকে গেছে এই 'সমীক্ষা' অংশে। কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আরও নির্দিষ্টভাবে পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলে ধরা যেত। তা সম্ভব হযনি। হযত আরও বিস্তৃত-ভাবেও এই 'সমীক্ষা' প্রণয়ন করা উচিত ছিল, তা-ও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। অনভিজ্ঞতা ও বহুবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার দায় একান্তভাবেই সমীক্ষা পরিষদের।

সরকারী ও বেসরকাবী উদ্যোগে যেসব পরিসংখ্যান প্রকাশ পায়, সেগুলির পরিধি প্রায় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। দেশ, রাজ্য, জেলা ও শহর পযায়ের পরিসংখ্যান-প্রাপ্তির ঘটনাটি অনেকক্ষেত্রেই সহজলভ্য হয়। কিন্তু শহরাঞ্চলে পুরসভা বা গ্রামাঞ্চলে ব্লক পর্যায়ে তথ্য ও পরিসংখ্যান খুঁজে বের করা অতীব দুঃসাধ্য কাজ। পুবসভা বা থানা-গুলিতে পুরনো নথিপত্র থাকে না বললেই চলে। সেক্ষেত্রে তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রকাশে অসুবিধা হয় বিস্তর। এই কারণে, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমীক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে বহুবিষয়ে কোন তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রকাশ সম্ভব হলো না। আশা করি, পাঠকবর্গ এই অসুবিধাটি উপলব্ধি করবেন। প্রাসঙ্গিকভাবেই, সমীক্ষা পরিষদ, সরকারী, বেসরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানাচ্ছে যে—মহকুমা, পুরসভা ও ব্লক পর্যায়ে নথিপত্র সংরক্ষণ ও

পরিসংখ্যান প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক্। এর ফলে তথ্য ও তথ্যের বিকাশ এবং সেগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাকে কার্যকরী করার কাজটি আরও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসম্পন্ন হ'তে পারবে।

সমীক্ষা প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আমরা, পাঠক ও আমাদের সুবিধার্থে চার্ট ও ট্যাবুলার ফর্মটিই বেছে নিয়েছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ইচ্ছা থাকা সত্বেও, আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে, বার ডায়াগ্রাম, পিক্টোরিয়াল ডায়াগ্রাম ও পাই ডায়াগ্রামের সংযোজন সম্ভব হলো না।

এই 'সমীক্ষা' অংশটি সমীক্ষা পরিষদের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। সমীক্ষা পরিষদের সদস্যরা চার-পাঁচ মাস সময়-ব্যাপী বহু পরিশ্রমে তিল তিল ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন এই বিপুল তথ্য সম্ভার। একাধিকবার বিফল মনোরথ হ'য়েও একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার অভিপ্রায়ে অবশেষে সাফল্য এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার বিবর্ণ ফসলও একই সঙ্গে পাওয়া গেছে। বিবর্ণ সুতরাং নিষ্প্রয়োজন। সজীব অভিজ্ঞতাগুলি সহযোগিতা-মূলক, তাই অবশ্যই স্মৃতির প্রকোষ্ঠে সংগৃহীত হলো। সমীক্ষা গ্রহণকালে বরানগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তত দুটির কথা আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হবে। একটি, বরানগর পুরসভা ও অন্যটি বরানগর থানা। দিনের পর দিন, জরুরী কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ সমীক্ষা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে অক্লান্তভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাই, বরানগরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পুরসভা ও থানাকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ।

রঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আয়তন : মোট ৭·১২ বর্গ কিলোমিটার। এই আয়তনের সবটুকুই শহর (Urban) এলাকা হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে গ্রামীণ (Rural) এলাকা বলে কিছু নেই।

সীমানা : দ্র. মানচিত্র

জনসংখ্যা : ১,৬১,৮৯৮

জেলা : ২৪ পরগনা।

মহকুমা

সদর দপ্তর : ব্যারাকপুর। বরানগর থেকে দূরত্ব ৭ কিমি।

রাস্তা : পাকা ও কাঁচা। মোট পাকা রাস্তা ৯৬ কিমি এবং মোট কাঁচা রাস্তা ২৫·৩৯ কিমি।

নর্দমা : পাকা ও কাঁচা মিলিয়ে মোট নর্দমার পরিমাণ ২৬৫ কিমি। নর্দমা-বাহিত আবর্জনা প্রধানত বাগজোলা খাল ও আংশিকভাবে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে।

মুক্ত আবর্জনার দৈনিক পরিমাণ : ১৮০০ কিউবিক ফিট। এই আবর্জনা ন-পাড়া অঞ্চলের নীচু জমিতে ফেলা হয়। সমস্তরকম আবর্জনা বহন করবার জন্য বরানগর পুরসভার লরী ও ট্রাক্টর মিলিয়ে মোট ৮টি গাড়ি রয়েছে।

জল-সরবরাহ কেন্দ্র : বরানগরে জল আসে বরানগর-কামারহাটি যৌথ জল প্রকল্প কেন্দ্র থেকে। এটি কামারহাটিতে অবস্থিত।

পুরসভা কর্তৃক জলসরবরাহের দৈনিক পরিমাণ :

পাইপলাইনের সাহায্যে বাড়িগুলিতে	=	৬৫,৮১,২৫০ লিটার
রাস্তায় কলের মাধ্যমে	=	৬,২৪,৬০০ লিটার
অগভীর নলকূপের সাহায্যে	=	১,৪৪,৪০০ লিটার

মোট গভীর নলকূপ : ১২টি।

মোট হস্তচালিত নলকূপ : ২১১টি।

রাস্তায় সাধারণের
ব্যবহার্য মোট কলের সংখ্যা : ৩৬৭টি।

জলের ব্যবস্থা আছে
এমন হোল্ডিং-এর সংখ্যা : ৪৬০৫টি।

বরানগরের জনসংখ্যা ও করদাতা : একটি পরিসংখ্যান

সাল	মোট লোকসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	পরিবর্তন সূচক	মোট করদাতা
১৮৭২	২৪২১৫	১২৫০০	১১৭১৫	—	৭০১৫
১৮৮১	২৯৯৮২	১৫৯২০	১৪০৬২	+ ৫৭৬৭	৭২৪৮
১৮৯১	৩৪২৭৮	১৮৭৯৭	১৫৪৮১	+ ৪২৯৬	৭৬৮০
১৯০১	২৫৪৩২	১৪৭৪৮	১০৬৮৪	— ৮৮৪৬	৩৯৩৩
১৯১১	২৫৮৯৫	১৪৯৮২	১০৯১৩	+ ৪৬৩	৩৯৪৩
১৯২১	৩২০৮৪	১৯৯৮৯	১২০৯৫	+ ৬১৮৯	৪০৭৯
১৯৩১	৩৭০৫৩	২৩১১৬	১৩৯৩৪	+ ৪৯৬৯	৪৫৬২
১৯৪১	৫৪৪৫১	৩৩৭১৭	২০৭৩৪	+১৭৩৯৮	৫৯০৫
১৯৫১	৭৭১২৬	৪৪৯২৫	৩২২০১	+২২৬৭৫	৮৯২৩
১৯৬১	১০৭১৩৭	৬১২০৬	৪৫৯৩১	+৩০০১১	১২২৬০
১৯৭১	১৩৬৮৭২	৭৬০১০	৬০৮৬২	+২৯০০৫	১৫৯৯৩
১৯৮১	১৬৭৮৪৮	৮৯৮৮৩	৭৭৯৬৫	+৩১০০৬	২০০০০

বরানগরে শিক্ষিতের হার

সাল	মোট শিক্ষিত	পুরুষ	নারী
১৯৭১	৮৬২৯০	৫২০৮৬	৩৪২০৪
১৯৮১	১২৭৩৬৭	৭২২৬১	৫৫১০৬

এ বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনগণনা আধিকারিক-কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮১ সালের Provisional Population Table থেকে দেখা যায়, **বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বরানগরেই শিক্ষিতের হার সব থেকে বেশি। এই হার হলো ৭৫·৮৮।**

হিন্দু ছাড়া বরানগরে অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বী জনসংখ্যার হিসাব

	১৯৭১
মুসলমান	২৮০৯
খ্রীষ্টান	১৯১
বৌদ্ধ	৭
জৈন	৫২
শিখ	২১৬
অন্যান্য	৩

এ বিষয়ে ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি।

বরানগরে আমদানিকৃত দ্রব্য

(ক) পাট

(খ) ওষুধ প্রস্তুতের কাঁচামাল

(গ) সিলিকা

বরানগর থেকে রফতানিকৃত দ্রব্য

(ক) পাটজাত দ্রব্য

(খ) ওষুধ

(গ) কাঁচ

বরানগরে উৎপাদিত প্রধান প্রধান দ্রব্য

(ক) পাটজাত দ্রব্য

(খ) ওষুধ

(গ) কাঁচ

(ঘ) ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য

একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান

১.

বিষয়	১৯৭১ মোট সংখ্যা	১৯৭১ পুরুষ	১৯৭১ নারী	১৯৮১ মোট সংখ্যা	১৯৮১ পুরুষ	১৯৮১ নারী
তফশীলি জাতি	১৫৯৩	৯৫০	৬৪৩	৫৬৬২	৩০৩৫	২৬২৭
তফশীলি উপজাতি	৬৮	৪১	২৭	৩৫৬	৬২	২০৪
মোট কর্মী	৩৮৪৭৬	৩৬৮০৯	১৬৬৭	৪৬৮২৪	৪৩৫২৪	৩১০০১
মোট অকর্মী	৯৮২৬৬	৩৯২০১	৫৯০৬৫	১২১০২৪	৪৬৩২০	৭৪৭০৪
কৃষক	১৫	১৫	—	৩৬	৩১	৫
কৃষি শ্রমিক	৬৭	৬৫	২	৬৫	৬৪	১
গৃহের অন্তর্গত শিল্পেনিযুক্তকর্মী	৪১৮	৩৮৫	৩	৩৫৯৫	২৪৫১	১৪৪
অন্যান্য কর্মচারী	১৬৪৯১	১৬২৪৪	২৪৭	৪৩১২৮	৩৯৯৭৮	৩১৫০

২.

বিষয়	মোট সংখ্যা	
	১৯৭১	১৯৮১
গৃহ	২৪৪,৯	৩৩৭৩০
অধিকৃত গৃহ	২২:৭৭	৩৩২৭

বরানগরের তাপমাত্রা (সেন্টিগ্রেড)

বৎসর	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
১৯৭৬	৩৯.১	১০.০
১৯৭৮	৩৯.০	১১.০
১৯৭৯	৪৪.০	৯.০

বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিলিলিটার)

স্বাভাবিক	প্রকৃত চিত্র	
	সাল	পরিমাণ
	১৯৭৬	১, ১৯৮
	১৯৭৭	১, ৯৩৪
১,৫৭৯	১৯৭৮	২, ০০৮
	১৯৭৯	১, ১৬৫

বস্তী : মোট বস্তীর সংখ্যা ২৫টি।

এক লক্ষ বা তারও বেশি জনসংখ্যা-সমৃদ্ধ নিকটবর্তী শহর : কামারহাটি।

রাজ্য সদর দফতর : কলকাতা।

নিকটবর্তী জেলা : হাওড়া, হুগলী

নৌ-চলাচলের উপযোগী নিকটবর্তী নদী/খাল : হুগলী নদী।

নিকটবর্তী বন্দর : কলকাতা।

রেলওয়ে স্টেশন : বরানগরের নিকটবর্তী দুটি রেলওয়ে স্টেশন হলো—বরানগর রোড (স্থাপিত : ১৯৩৭) ও দক্ষিণেশ্বর (স্থাপিত : ১৯৩৭)। এই দুটির কোনটিই বরানগর পুর-এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরানগর রোড থেকে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের দূরত্ব = ২ কিমি। পরিসংখ্যানে প্রকাশ, প্রতিদিন গড়ে ২২১৬ ও ১৩০১ জন যাত্রী যথাক্রমে দক্ষিণেশ্বর ও বরানগর রোড স্টেশন ত্যাগ করেন। (দ্র. বরানগরের পরিবহণ-ব্যবস্থা)।

বরানগরের অন্তর্গত রেল লাইনের মোট দৈর্ঘ্য = ৫·৬৪ কিমি

নীচু জমি : আমরা যাকে নীচু জমি বা লো ল্যাণ্ড বলে থাকি, সেইরকম সংজ্ঞাভুক্ত জমি বরানগরে নেই। তবে বরানগরের বেশ কিছু অঞ্চলে জল জমে। আপাতত সেগুলিকেই নীচু জমি হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যে-সমস্ত অঞ্চলে এই সমস্ত জমি রয়েছে, সেগুলি হল ২৯নং ওয়ার্ড এবং আংশিক ভাবে ২৮, ২৭, ২৬, ২৫, ১৮ নং ওয়ার্ড।

কৃষি জমি : বরানগরে প্রকৃত অর্থে কৃষি-জমি কিছু নেই। অবশ্য ন-পাড়া অঞ্চলে রেল লাইনের ধার ঘেঁষে সামান্য কিছু অংশকে কৃষি জমি বলা যায়। এখানে শস্যের চাষ হয়।

জন্ম-হার : ১৯৮০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বরানগরে জন্ম-হার ১০·৯।

মৃত্যু-হার : ১৯৮০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বরানগরে মৃত্যু-হার ৪·৭১।

রাজনৈতিক দলের

কার্যালয় : (ক) ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
৩১/১/৪বি/৩ রামচাঁদ মুখার্জী লেন, কলি-৩৬

(খ) বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আর. এস. পি.)
৭/১ বাবা যতীন রোড, কলি-৩৬

(গ) ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই.)
৪ অক্ষয় কুমার মুখার্জী রোড, কলি-৯০

(ঘ) ইন্দিরা কংগ্রেস (কং-আই)
২৬৫/১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬

(ঙ) সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার (এস. ইউ. সি.)
৮৮/১ দেশবন্ধু রোড, কলি-৩৫

(চ) সর্বভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (এ. আই. সি. পি.)
২৪৬ বি. টি. রোড, কলি-৯০

পাবলিক কল অফিস বা পাবলিক টেলিফোন

আলমবাজার পোস্ট অফিস (৫২-৯৩৮৯)
অশোকগড় পোস্ট অফিস (৫২-৮৩০১)
বরানগর পোস্ট অফিস (৫২-৪৪০০)
বনহুগলী পোস্ট অফিস (৫২-৭৩৩১)
দেশবন্ধু রোড (ইস্ট)
পোস্ট অফিস (৫২-২০৭৪)
বেঙ্গল ইম্যুনিটি পোস্ট অফিস (৫২-৮১৩২)
ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল
ইনস্টিট্যুট পোস্ট অফিস (৫২-৩৪০৯)
(৫২-৬২৩০)
ন-পাড়া পোস্ট অফিস (৫২-৮৫৬৫)

সিঁথি পোস্ট অফিস (৫২-৪৪৮২)
(৫২-৫৩৫০)
৪৬/১ আর. বি. টি. রোড (৫২-২৫০০)
৬৩/২ বি. টি. রোড (৫২-৭৩৩২)
৪৭ বি. টি. রোড (৫২-৬৩০২)
ওঙ্কার অটো সেলস
২৫০ বি. টি. রোড, কলি-৩৬ (৫২-৩৩৮২)
পালপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি
৩১/এ বাঘাযতীন রোড, কলি-৩৬ (৫২-৪৩৮২)
সিঁথি আগত সম্মিলনী বিপণি লিমিটেড
৩ রামকালী মুখার্জী লেন, কলি-৫০ (৫২-৭৩০২)
ভ্যাবাইটি রবিন প্রোডাক্টস
১০৪/২ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬ (৫২-৩২৪৮)
১০৮/ডি গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫
কলিকাতা টেলিফোনের ৫২-নং এক্সচেঞ্জ অফিসটি বি. টি. রোডে চিড়িয়ামোড়ের কাছে অবস্থিত। ফোন: ৫২-৫৩৮২ / ৫২ ৬৩৮২

বরানগর থানা

ঠিকানা: ১৪ হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাণ্ড, কলিকাতা-৩৬
ফোন: ৫২-৮৩০০ (পি. অ্যাণ্ড টি.)
৫৭-২৪২৭ (পুলিশ ফোন; এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে কাশীপুর এক্সচেঞ্জ)

পুলিশ বাহিনী		গাড়ি	
অফিসার-ইন-চার্জ	১ (ইনস্পেক্টর)	রেডিও টেলিফোন	
সাব-ইনস্পেক্টর	৮	সমন্বিত জীপ	২
অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর	৬	ভাড়া-করা গাড়ি	১
কনস্টেবল	২১	থানায় রেডিও-টেলিফোন সেট	১

বরানগর থানার এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার আয়তন : ২·৭৫ বর্গ মাইল।

মোট হোম গার্ড : ১৫ [পুরুষ = ১২ + মহিলা = ৩]

রেডি হোম গার্ড : ৪

ও. সি র জন্য কোয়ার্টার : ১

এস. আইদের জন্য কোয়ার্টার : ৫

এ. এস. আইদের জন্য কোয়ার্টার : ২

কনস্টেবলদের জন্য : ব্যারাক

পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল বা পি. আর. বি. অনুসারে স্থানীয় থানার অধীনে যে আর. জি. পার্টি গঠন করা হয় (চলতি কথায় ডিফেন্স পার্টি বলা হয়), বরানগরে এমন পার্টির সংখ্যা ৩১টি।

বরানগরে পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে দুটি। একটি, বি. টি. রোডের ওপর পালপাড়ায় ও অপরটি বিদ্যায়তন সরণিতে। পালপাড়া ফাঁড়িতে রয়েছেন ১ জন হেড কনস্টেবল এবং ১৬ জন কনস্টেবল। অপরপক্ষে বিদ্যায়তন সরণির ফাঁড়িতে রয়েছেন ৮ জন হেড কনস্টেবল এবং ১৫ জন কনস্টেবল।

হা স পা তা ল

(ক) নর্থ সুবার্বন হসপিট্যাল

৮২ কাশীপুর রোড, কলি-২

ফোন : ’৫২-৪২০০

মোট শয্যা : ১৩৭

ফ্রী : ১২১

পেয়িং : ১৬

বিভাগ : মেডিক্যাল, গাইনোকোলজি, ডেন্টাল, সার্জিক্যাল, প্যাথোলজি।

অ্যাম্বুলেন্স : ১টি।

আউটডোর : প্রতিদিন সকাল ৮-৩০ মি. খোলা হয়। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ।

এমার্জেন্সি : ২৪ ঘণ্টা খোলা।

কোন বিভাগ কবে খোলা থাকে

ই. এন. টি (বুধ/শুক্র), ডেণ্টাল (সোম/বুধ/শুক্র), সার্জিক্যাল, গাইনোকোলজি, প্যাথোলজি, এক্স-রে (প্রতিদিন), চেস্ট (সোম/বুধ/শুক্র)। হাসপাতালটিতে রয়েছে একটি আধুনিক অপারেশন থিয়েটার।

মোট কর্মচারীর সংখ্যা : ১৮৭ জন।

এই হাসপাতাল ১৯৮১ সালের ১লা এপ্রিল সরকার অধিগ্রহণ করেন।

হাসপাতালটির জমির মোট আয়তন : ১৭ বিঘা।

প্রকৃতপক্ষে হাসপাতালটি স্থাপিত হয় আনুমানিক ১২৫ বছর আগে।

যদিও এই হাসপাতালটি বরানগর পুর-সভা এলাকার বাইরে, তবু অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্মের অন্তর্গত বলেই এটিকে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হল।

(খ) বরানগর স্টেট জেনারেল হসপিট্যাল

১০৪ অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড, কলি ৯০

ফোন : ৫২-৩৬৩৬ (সুপারিণ্টেনডেণ্ট)

৫২-৩৫৩৬ (হাসপাতাল)

স্থাপিত : ১৯১৮ (নভেম্বর)

মোট শয্যা :	১০০	মোট কর্মী :	১০০ জন
ফ্রী :	৬৮	ডাক্তার :	১১
পেয়িং :	৩২	নার্স :	২৫
অ্যাম্বুলেন্স :	১টি।	ঝাড়ুদার :	৬৪

বিভাগ : জেনারেল সার্জারি, জেনারেল মেডিক্যাল, অপথ্যালমোলজি, প্যাথোলজি, রেডিওলজি, লেপ্রসি, মেটারনিটি, গাইনো-কলজি, পরিবার পরিকল্পনা।

ই. এন. টি ও ডেণ্টাল খুলবার অপেক্ষায় রয়েছে।

এমার্জেন্সি : প্রতিদিন খোলা।

আউটডোর : সকাল ৮টায় খোলে।

(গ) বরানগর চেস্ট ক্লিনিক কাম হসপিট্যাল

১৮/২ মসজিদবাড়ি লেন, কলি-৩৫

ফোন : ৫২-২১৭৫

স্থাপিত : ১.৫৯

উদ্বোধন : ২৮.৮.৬০ (বিধানচন্দ্র রায়-কর্তৃক)

মোট শয্যা . ৬০

ফ্রী : ৬০ (এই শয্যাসংখ্যার ভেতরেই কেবিন ও পেয়িং বেডের ব্যবস্থা আছে)

অ্যাম্বুলেন্স : নেই।

বিভাগ ; সার্জিকাল, অর্থোপেডিক্স, মেডিক্যাল (প্যাথোলজি, এক্সরে, ই. সি. জি.)

কবে খোলা . সার্জিক্যাল (সোম/মঙ্গল/বৃহঃ/শুক্র/শনি), মেডিক্যাল (মঙ্গল/শনি) চক্ষু (বুধ/শুক্র), ই এন টি. (সোম/বুধ/বৃহঃ/শুক্র), ডেণ্টাল (সোম/মঙ্গল/বৃহ/শনি), চর্ম (বুধবার), চাইল্ড হেলথ (সোম/শুক্র), গাইনোকোলজি (সোম/শুক্র/বৃহঃ/শনি)

মোট কর্মী : ২৭

চিকিৎসক : ১৭ জন

আউটডোর সাধারণতঃ সকাল ন'টা থেকে খোলা হয়।

(ঘ) ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ হসপিট্যাল ফর মেটারনিটি অ্যাণ্ড চাইল্ড হেলথ

১০/১ কেদারনাথ ব্যানার্জী লেন, কলি-৩৬

মোট শয্যা : ১৬ (কিছু পেয়িং বেড আছে)

অ্যাম্বুলেন্স : নেই।

স্থাপিত : ১৯১৯ (২২শে ডিসেম্বর)

আউটডোর : প্রতিদিন সকাল ১০ টায় খোলা হয়।

(ঙ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অর্থোপেডিক্যালি হ্যানডিক্যাপড

বি. টি. রোড, বনহুগলী, কলি-৫০

ফোন : ৫২-৮২৩৯

বিভাগ : ফায়োথেরাপি, বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং, ভোকেশন্যাল গাইডেন্স ইউনিট, হাইড্রোথেরাপি, অ্যাম্পু.টশন হোস্টেল

ব্যবস্থা : মোট ৫০ জনের ব্যবস্থা আছে।

মোট কর্মী : ৫৫ জন।

বিভিন্ন ক্লিনিকের সময়সূচী : রিউম্যাটোলজি (সোমবাব ১২—১) অ্যামপিউট (সোমবার ২—৩) হ্যাণ্ড সার্জে (মঙ্গল ২—৩) স্কোলিওসিস অ্যাণ্ড স্পাইন্যাল (মঙ্গল ৩—৪) পোলিও, সেরিব্রাল, পালসি, মায়োপ্যালি, সি ডি. ডি. (বৃহ, শুক্র ৩—৪)

সম্প্রতি প্রিন্স চার্লস তাঁর কলকাতা সফরকালে এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে কুড়ি হাজার পাউণ্ড অর্থ (তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা) প্রদান করেন। এটি ভারত সরকারের সমাজ কল্যাণ দফতরের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র : ৪৮/৭২ বি. টি. রোড, কলি ৩৬। এছাড়াও বরানগর জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন একটি পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র রয়েছে। [দ্র. বরানগরের হাসপাতাল।]

স্বাস্থ্য-কেন্দ্র : সচরাচর স্বাস্থ্য-কেন্দ্র বলতে আমরা যা বুঝি, বরানগরে তা নেই। তবে আদ্যাপীঠ থেকে আগত একটি গাড়ি বরানগরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র বিতরণের কাজ করে থাকে। অবশ্য এটি অনিয়মিতভাবে কাজ চালায়।

সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স : ৫৭ দেশবন্ধু রোড (ওয়েস্ট), কলি-৩৫

স্থাপিত—১৭৪৪

(চ) বরানগর মিউনিসিপ্যাল মেটারনিটি হসপিট্যাল

৮৭ দেশবন্ধু রোড, ইস্ট, কলি-৩৫

ফোন : ৫২-৬৫৩৫

মোট শয্যা : ৪০টি।

মোট কর্মচারী : ৪০ জন।

স্থাপিত : ১৯৪৮

আউটডোর : প্রতিদিন ১০টায় খোলে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

বরানগর কাশীপুর শাখার ঠিকানা : ৪৮ ময়রাডাঙ্গা রোড। (স্থাপিত : ১৯৬৯)। কাশীপুর এলাকা বাদে বরানগরের প্রায় ৩০ জন ডাক্তার এই সমিতির সভ্য। এঁরা সকলেই অ্যালোপ্যাথ। বিভিন্ন সময়ে এই অ্যাসোসিয়েশন বরানগর অঞ্চলে নানা সমাজসেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। প্রতি বছর এঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদগণের সমাবেশ ঘটে।

মোট ডাক্তার

অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, আকুপাংচারিস্ট-আয়ুর্বেদিক মিলিয়ে বরানগরে মোট ডাক্তারের সংখ্যা (যাঁরা বরানগরে প্র্যাকটিস করেন) ২৩ বা তার কিছু বেশি।

নার্সিং হোম

(ক) সেণ্ট্রাল নার্সিং হোম
৩ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬

(খ) সেবাসদন নার্সিং হোম
১২৩/৬এ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬
ফোন : ৫২-৬৬৫১

(গ) বরানগর নার্সিং হোম
১১৮ বি. টি. রোড, কলি-৩৫
ফোন : ৫২-২৫৮৪

(ঘ) নিবেদিতা শিশুসদন
২০/১ টি. এন. চ্যাটার্জী রোড, কলি-৯

(ঙ) সারদা মাতৃসদন
৭৭ নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রীট, কলি-৩৫

কর্মচারী রাজ্যবীমা

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারী এবং কৃষি-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা ক'রে ১৯৪৮ সালে, কেন্দ্রীয় সরকার 'কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন' অনুমোদন করেন। এই আইন রূপায়িত করার জন্য 'কর্মচারী রাজ্যবীমা সংস্থা'র সূচনা করা হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে শিল্পসংস্থাগুলি (Units) এই আইনের আওতায় আসে।

বরানগরে কর্মচারী রাজ্যবীমা সংস্থার অফিস ২০২/১ বি. টি. রোড, ডানলপ ব্রীজ, কলি-৩৫-এ অবস্থিত। এই অঞ্চলের ১৮০টি শিল্পসংস্থার প্রায় ৩০,০০০ কর্মচারী এই সংস্থার মাধ্যমে উপকৃত হন। শ্রমিক কর্মচারীদের উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য এই সংস্থা বরানগরে ৩২ জন চিকিৎসক নিযুক্ত করেছেন।

প্রস্রাবাগার : মোট সংখ্যা=৫৫

দমকল : বরানগরে দমকল বাহিনীর কোন অফিস নেই। বরানগরের নিকটবর্তী দমকল বাহিনীর অফিস একটি কাশীপুরে ও অপরটি কামারহাটিতে অবস্থিত। ফোন : কাশীপুর (৩৪-৫৫৪৫), কামারহাটি (৫৮-১০৯২)।

কর্মসংস্থান-কেন্দ্র : বরানগরে কোন কর্মসংস্থান কেন্দ্র (Employment Exchange) নেই। বরানগরের নিকটতম কর্ম-সংস্থান-কেন্দ্রটি দমদম মতিঝিলে অবস্থিত।

রেশনিং অফিস : বরানগর রেশনিং অফিস
৭৬ রাইমোহন ব্যানার্জী রোড
কলি-৩৫, ফোন : ৫৮-১৭৮৭।
মোট কার্ড
[illegible]—১,৫১,৭৮২

শিশু— ৩০,৪৪৪
এ. আর. শপ—৫৬
মাদার শপ— ২
জেড শপ— ৩

বি দ্যু ৎ

বরানগরে বিদ্যুতায়ন হয ১৯০৮ সালে।

দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বা সি. ই. এস. সি.-র বরানগরস্থিত অফিস:

সারভিস স্টেশন

(ক) বরানগব ডিপো
১১ দেশবন্ধু বোড, ইস্ট, কলি-৩৫ (ফোন: ৫২-২৫৭৩)

(খ) টবিন রোড ডিপো
১০৭ এ অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড, কলি-৯০

(গ) সিঁথি ডিপো
৫/১ রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড, কলি-৫০

ক্যাশ অফিস

৪৪/৫৭ বি. টি. রোড, কলি-৫০

সাইট অফিস

নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট সাইট অফিস
৪৪/৫৭ বি. টি. রোড, কলি-৫০

রেক্টিফায়ার স্টেশন : ১টি
মোট ট্রান্সফর্মার : ২৯টি

বরানগরে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা

গৃহস্থের জন্য : ৪ মেগাওয়াট
শিল্পের জন্য : ২০ মেগাওয়াট
বাণিজ্যের জন্য : ২ মেগাওয়াট

মোট লাইটপোস্ট

বরানগরে মোট লাইটপোস্ট রয়েছে ২৫৭৩ টি। ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা ছিলো ২৫১০ টি।

বরানগরের শিল্প

বরানগর মূলত শিল্প শহর। অসংখ্য ছোট, বড়, মাঝারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলের অর্থনীতির এক বিরাট দিক। এইসব শিল্প যেমন গড়ে উঠেছে রাজ্য ও জেলার চাহিদাকে ভিত্তি ক'রে, তেমনই, স্থানীয় চাহিদাকে মেটাতেও এগুলির অবদান অপরিসীম। কার্যত, কর্মসংস্থান ও স্থানীয় বৃহৎ শিল্পের চাহিদা পূরণের জন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদকে ভিত্তি ক'রেই এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একই সঙ্গে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিপুল অবদান, অনেকক্ষেত্রেই যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে বরানগরের অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। এবং পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে বরানগরে শিল্প বিকাশকে এখনও নানা পথে প্রবাহিত করা যেতে পারে।

বর্তমান সমীক্ষায় বরানগরের বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আনুমানিক সংখ্যা মিলিতভাবে দেওয়া হল।

(১)	রাসায়নিক শিল্প	—	৪
(২)	কারিগরী শিল্প	—	৪০০০
(৩)	বেকারী	—	২০
(৪)	বরফজাত দ্রব্য	—	৫
(৫)	চর্মজাত দ্রব্য	—	৪
(৬)	কাঠের আসবাবপত্র	—	২০০
(৭)	কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	—	৫
(৮)	মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প	—	৫০
(৯)	রবারজাত দ্রব্য	—	২
(১০)	খাদ্য ও পানীয়	—	৪
(১১)	হোশিয়ারী	—	৫০
(১২)	ঔষধ প্রস্তুতকারক শিল্প	—	২৫
(১৩)	সিমেণ্টজাত দ্রব্য	—	১
(১৪)	ক্রীড়া সরঞ্জাম	—	১
(১৫)	মুরগী হাঁস প্রতিপালন	—	৫
(১৬)	তেলকল	—	২
(১৭)	বাদ্যযন্ত্র শিল্প	—	১৬

বা জা র

নাম	স্থাপিত	ঠিকানা	মোট আয়তন	বর্তমান মালিক	মালিকের ঠিকানা
বরানগর বাজার	১৮৫১	১ কাশীপুর রোড, কলি-২	১ বিঘা ১৬ কাঠা	শ্রীমতী কৌশল্যা বালা চৌধুরাণী, জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং অন্যান্য	৪ রায় মথুরানাথ চৌধুরী স্ট্রীট, কলি-৩৬
গোকুল বাবুর বাজার	১৯৫৩	২০৩ মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ) কলি-৩৬	৫ কাঠা ৮ ছটাক	কমলাপ্রসন্ন সাহা	৩সি বিনোদ সাহা লেন, কলি-৬
বনহুগলী বাজার	১৯৫৫	১৭৯ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫	তথ্য অপ্রাপ্ত	সুধীরকুমার ঘোষ	৯ ফকির ঘোষ লেন, কলি-৩৫
আলম বাজার	১৮৭১	৮ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রোড, কলি-৩৬	১ বিঘা ৮ কাঠা ১০ ছটাক	মানিকলাল প্রামাণিক ও অন্যান্য	২৭৭ মহারাজা নন্দকুমাররোড, (নর্থ) কাল-৩৫
নেতাজী কলোনী	১৯৫০	২০ নেতাজী কলোনি হাই ল্যাণ্ড কলি-৩৫	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত
সিঁথি বাজার	তথ্য অপ্রাপ্ত	১৭ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলি-৫০	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত
সুপার বাজার	তথ্য অপ্রাপ্ত	১৪০ বি. টি. রোড, কলি-৩৫	তথ্য অপ্রাপ্ত	বিক্রমজিৎ রায় চৌধুরী	১৫১/১ বি. টি. রোড' কলি-৩৫

উপরের প্রতিটি বাজার পুরসভা কর্তৃক অনুমোদিত এবং এর প্রত্যেকটিরই পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়েছে স্থানীয় বাজার কমিটির ওপর। এছাড়াও বরানগরের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু অননুমোদিত বাজার রয়েছে। সেগুলিকে সমীক্ষার বাইরে রাখা হয়েছে। কোথাও কোথাও বাজার ও সংলগ্ন জমির আয়তন একসঙ্গে গণ্য হওয়ার ফলে নির্দিষ্টভাবে বাজারের আয়তন উল্লেখ করা গেল না। ছ'একটি ক্ষেত্রে মালিকের নাম ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য অপ্রাপ্ত থেকে যাওয়ার ফলে অনুল্লেখিত রয়ে গেল।

সমবায় সমিতি

(ক) বনহুগলী সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড

১/১৬ ফকির ঘোষ লেন, কলি-৩৫

স্থাপিত : ১৯৬৪

বিভাগ : এ. আর. শপ, জেড-আই. শপ, কেরোসিন, টেক্সটাইল, কাগজ ও অন্যান্য।

বিক্রয়কেন্দ্র : ২০ নিমচাঁদ মৈত্র ষ্ট্রীট, কলি-৩৫

সদস্য : ৫৯৫ জন।

১৯৭৯-৮০ সালের মোট বিক্রয় : টা. ৫, ০৯, ৯২৪·০০ প.

ঐ বছরে মোট লাভ : টা. ৮৩৪·৬১ প.

১৯৮০-৮১ সালের চলতি মূলধন : টা. ১৯, ৯৩৫·০০ প.

(খ) সিঁথি আগত সম্মিলনী সমবায় বিপণি লিমিটেড

৩ রামকালী মুখার্জী লেন, কলি-৫০

স্থাপিত : ১৯৬৩

বিভাগ : এ. আর শপ, জেড শপ, টেক্সটাইল।

সদস্য : ৩০১ জন।

১৯৭৮-৭৯ সালের মোট বিক্রয় : টা. ৬, ২৩, ৬৬৪·২১ প.
ঐ বছরে মোট লাভ : টা. ৯, ২৬৫·৪৬ প.
ঐ বছরে চলতি মূলধন : টা. ৭০, ২১৯.৬৭ প.

(গ) উত্তর শহরতলী সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড কলি-৩৬

স্থাপিত : ১৯৬৩
বিভাগ : মুদি ও মনিহারী এবং হোসিয়ারী ও টেক্সটাইল।
মুদি ও মনিহারী দ্রব্য বিক্রয়ের ঠিকানা ২ মহারাজা নন্দ কুমার রোড (সাউথ), কলি-৩৬
সদস্য : ৫৫৩ জন।
১৯৭৯-৮০ সালের চলতি মূলধন : টা. ৬৭, ১৩৫·৪৭ প.

(ঘ) মধ্য বরানগর সমবায় বিপণি লিমিটেড

৮৯ নিয়োগী পাড়া রোড, কলি-৩৬
স্থাপিত : ১৯৬৪
বিভাগ : এ. আর. শপ।
সদস্য : ৮৫ জন।
১৯৭৯-৮০ সালের মোট লাভ : টা. ১২, ০০·০০
ঐ বছরে চলতি মূলধন : টা. ১০,০০·০০

(ঙ) পশ্চিম বরানগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড

২৭ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলি-৩৬
স্থাপিত : ১৯৭৮
সদস্য : ৫২
বিক্রয়কেন্দ্র : গোকুলবাবুর বাজার, ঝুলনতলা সমিতির কার্যালয়, কুটিঘাট রোড ও বরদা বসাক রোডের সংযোগস্থল।
সময় : সকাল ৬টা থেকে ৭টা।

(চ) বনহুগলী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি

১০৫ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

স্থাপিত : ১৯৭৪

বিক্রয়কেন্দ্র : সমিতির সামনে।

সভ্য : ৭৫

(ছ) সুবার্বন কো-অপারেটিভ সোসাইটি

৩৯/৬ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬

স্থাপিত : ১৯৬৯

সদস্য : ২০০

চলতি মূলধন : টা. ৫০,২২০·৬৫ প.

১৯৮০ সালের জুন মাস অবধি পাওয়া হিসেব মতো

ঐ বছরের মোট বিক্রয় : টা. ২,২৮০২৫·২৭ প.

ঐ বছরে মোট লাভ : ০

ঐ বছরে মোট ক্ষতি : টা. ৪৯৮·৭৬ প.

(জ) বরানগর পিপলস্ কনস্যুমার কো-অপারটিভ স্টোর্স

১৩ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬

(ঝ) নর্থ সুবার্বন হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড

৫/১/বি দেশবন্ধু রোড (ইষ্ট), কলি-৩৫

একটি বিশেষ সমীক্ষা

সংবাদপত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও জনমানসে তার বিপুল প্রভাবের কথা মনে রেখে সমীক্ষা পরিষদ বরানগরবাসীর সংবাদপত্র-পাঠ-প্রবণতা সম্পর্কে একটি নমুনা সমীক্ষার আয়োজন করে। এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে বরানগরের শতকরা পঞ্চাশ জন মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠক। নীচে তাঁদের পছন্দ-অপছন্দের শতকরা হার উল্লেখ করা হ'ল।

আনন্দবাজার (৩৫%), যুগান্তর (২৫%), দৈনিক বসুমতী (১৮%), আজকাল (৭%), সত্যযুগ (৩%), দি স্টেটসম্যান (১০%), অমৃতবাজার পত্রিকা (২%)।

এছাড়াও রাজনৈতিক মতাবলম্বী সান্ধ্য দৈনিক গুলির মধ্যে **গণশক্তি** ও **কালান্তরের** পাঠক সংখ্যাই বেশী। সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক পত্রিকাগুলি চাহিদা অনুযায়ী যথাক্রমে নিম্নরূপ—

দেশ, পরিবর্তন, খেলার আসর, সানডে, নবকল্লোল, স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড।

ব্যাংক

বরানগরে বেশ কয়েকটি ব্যাংক রয়েছে। যেহেতু ব্যাংক মাত্রেই জনস্বার্থের সঙ্গে ভীষণরকমভাবে সংশ্লিষ্ট, আমরা বরানগরের ঠিক উপকণ্ঠে কাশীপুর এলাকাসংলগ্ন কয়েকটি নিকটবর্তী ব্যাংকের কথাও উল্লেখ করলাম। বরানগর অঞ্চলে এতগুলি ব্যাংকের অবস্থান থেকে স্থানীয় মানুষদের সঞ্চয়-প্রবণতা এবং এই অঞ্চলে শিল্পসমেত নানাবিধ কাজে ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ লগ্নীর পরিমাণ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

নাম	ঠিকানা	ফোন	চরিত্র	কলিকাতাস্থ হেড অফিস	সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা রাখবার ন্যূনতম পরিমাণ	স্থাপিত
স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া	৫২/২ সূর্য সেন রোড, কলি-৩৫	৫২-৯৩৯২	রাষ্ট্রায়ত্ত	মার্টিন বার্ণ বিল্ডিং	২০·০০	১৯৭০
স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া	বনহুগলী ইনডাসট্রিয়াল এস্টেট	৫২-২৫৯৩	ঐ	ঐ	৫·০০	১৯৬৯
স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া	৬২/১/১ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬	৫২-৮১০০	ঐ	ঐ	২০·০০	
ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া	৫৭ কাশীপুর রোড, কলি-৩৬	৫২-৫১৩২	ঐ	১৬ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট কলি-১	৫·০০	১৯৪৮
ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া	২০২/১ বি. টি. রোড কলি-৩৫	৫২-৮১৭৪	ঐ	ঐ	৫·০০	

ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া	৬০ দেশবন্ধু রোড (ওয়েস্ট), কলি-৩৫	৫৮-১১৬৩	ঐ	ঐ	৫·০০	১৯৭১
সেন্ট্রাল ব্যাংক	৩৭ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬	৫২-৭৪৯৫	ঐ	৩ ডেকার্স লেন, কলি-১	৫·০০	১৯৭৪
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক	৪১/৫১ বি. টি. রোড কলি-৫০	৫২-৩৫৮৪	ঐ	১০ ব্রেবোর্ণ রোড, কলি-১	৫·০০	১৯৭৩
ব্যাংক অফ বরোদা	৫/২ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬	৫২-২৫৩৪	ঐ	৩বি ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলি-১৬	৫·০০	১৯৭০
ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া	৩৯ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬		ঐ	২৩ এ. বি. নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-১	৫·০০	১৯৮০
এলাহাবাদ ব্যাংক	১৪৯ বি. টি. রোড কলি-৩৫	৫২-৩৩৮১	ঐ	১৪ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১	৫·০০	১৯৭৭

নাম	ঠিকানা	ফোন	চরিত্র	কলিকাতাস্থ হেড অফিস	সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউণ্টে অর্থ জমা রাখবার ন্যূনতম পরিমাণ	স্থাপিত
ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক	১২৩/৪/১ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫	৪২-৪১৯২	অরাষ্ট্রায়ত্ত	১৭ আর.এন. মুখার্জী রোড, কলি-১	৫'০০	১৯১৯
চার্টার্ড ব্যাংক	৬৭ কাশীপুর রোড কলি-৩৬	৫২-১০৮৫	অরাষ্ট্রায়ত্ত	৪ নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৩৬	১০০'০০	১৯৬৮
ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাংক	১৩৭ বি. টি. রোড কলি-৩		রাষ্ট্রায়ত্ত	৩৬ শেক্সপীয়র সরণি, কলি-১৭	৫'০০	১৯৭৬
বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড	১৩, বি. কে. মৈত্র রোড, কলি-৩৬		কো-অপারেটিভ	১৩ বি. কে. মৈত্র রোড কলি-৩৬	৫'০০	১৯৩১

সি নে মা হ ল

নাম	স্থাপিত	ঠিকানা	ফোন	মোট সীট	মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম বই	প্রদর্শনের সময় দুপুর	বিকেল	রাত	কাউণ্টার খোলা	বন্ধ
নিউ তরুণ	১৯৪১	২ যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলি-৩৬	৯১১৮-২৬ ৬৩৯৩-২৬	৯২৫	নিমাই-সন্ন্যাস	২টা	৫টা	৮টা	সকাল ১২/৩০	রাত ৮/৩০
জয়শ্রী	১৯৪৮	২৯০ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬	৪৩৩৪-২৬	৮১৭	ভুলি নাই	২টা	৫টা	৮টা	সকাল ১০/৩০	রাত ৮/৩০
নারায়ণী	১৯৫০	১৫ সূর্য সেন রোড, কলি-৩৫	৮৯৩২-২৬	১১৭০	মীরাবাঈ	২/৩০	৫/৩০	৪/৩০	সকাল ১১/৩০	রাত ৯/০০
আনন্দম	১৯৬৮	৭৬এ রাইমোহন ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলি-৩৫		৯০৪	ব্রহ্মচারী	১/৩০	৪/৩০	৭/৩০	সকাল ১১/০০	রাত ৮/০০
অলকা	১৯৭১	২০৮ বি. টি. রোড, কলি-৩৬	২৮০৫-২৬ ১৮৪৬-২৬	১০২২	ছোটী বহু	১টা	৪টা	৭টা	সকাল ১১/৩০ — ২/৪৫	দুপুর ২/৪৫ — ৭/৩০

নিউ তরুণই বরানগরের সব থেকে পুরনো হল। ১৯৪১-এর আগে ১৯:৯ সালে এই হলের নাম ছিল তরুণ সিনেমা। এবং তারও আগে ১৯৩৭ সালে এর নাম ছিল তরুণ টকী। ঐ সময়ে তরুণী, মণিকাঞ্চন প্রভৃতি চলচ্চিত্র ওই হলে মুক্তি পেয়েছিল।

বরানগরে পাঁচটি হলের মধ্যে নিয়মিতভাবে দুটিতে হিন্দী, দুটিতে বাংলা ও একটিতে অনিয়মিতভাবে দুটি ভাষার চলচ্চিত্রই মুক্তি পায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বরানগরে আনুমানিক ৬০% মানুষ হিন্দী ও ৪০% মানুষ বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক।

মোট ভোটার :

(ক) বিধান সভা : ১,৪৪,০০০ (১৯৭৭ সালের ভোটার তালিকা অনুসারে)
(খ) পুর সভা : ১,৬০,০০০ (১৯৮১ সালের ভোটার তালিক অনুসারে)
বরানগর বিধানসভার কিয়দংশ ১৯৭৭ সাল থেকে দক্ষিণ দমদম বিধান সভার অন্তর্গত। লোকসভার ক্ষেত্রে বরানগর, দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত

বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল :

১৯৫২

জ্যোতি বসু (সি. পি. আই)	১৩,৯৬৮
হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (কং)	৮,৫৩৯
ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (নি)	১,৫২৪
মণিভূষণ চ্যাটার্জী (এস. ইউ. সি.)	২৮১
হরিভূষণ চ্যাটার্জী (নি)	২৫৭
নিখিল দাস (আর. এস. পি.)	৬৬
অশোক দাশগুপ্ত (কে. এম. পি. পি.)	১৫৭
শৈলেন মুখার্জী (নি)	৬৪

১৯৫৭

জ্যোতি বসু (সি. পি. আই)	২৮,২৬৯

কানাইলাল ঢোল (কং)	১৮,৮৫২
রমেন্দ্রনাথ দে (নি)	৪০৫
ধ্রুবজ্যোতি মজুমদাব (নি)	১৯৫
১৯৬২	
জ্যোতি বসু (সি. পি. আই)	৪০,৮৩০
ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কং)	২৭,৭১৮
শঙ্কর ঘোষ (হিন্দু মহাসভা)	৪৯০
কামাখ্যা গুহ (জনসঙ্ঘ)	১,৪৮৫
সন্ন্যাসী নাথ (নি)	৩০৭
মোহিনী ব্যানার্জী (নি)	১৬৭
বিজয়রত্ন সেনশর্মা	৯৭৪
১৯৬৭	
জ্যোতি বসু (সি. পি. আই. এম)	৩১,৩৫৪
অমর ভট্টাচার্য (কং)	২৭,৮৭৫
বল্লু হনুমন্তরাও (নি)	৪৭৪
১৯৬৯	
জ্যোতি বসু (সি. পি. আই. এম)	৪৩,৩৪০
অজয় মুখার্জি (বাংলা কং)	৩২,২৮৭
১৯৭২	
শিবপদ ভট্টাচার্য (সি. পি. আই)	৬৯,১৪৫
জ্যোতি বসু (সি. পি. আই. এম)	৩০,১৫৮
১৯৭৭	
মতীশ রায় (আর. এস. পি)	৩৩,৩৩৮
কুমুদ ভট্টাচার্য (কং)	১৬,৭২৮
দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার (জনতা)	৯,৯২৯
বিকাশ মজুমদার (নি)	২৬৮
শিবপদ ভট্টাচার্য (সি. পি. আই)	১,৪০৪
অমর মজুমদার (নি)	১৩৯

বরানগরের পার্ক

(ক) বিধান উদ্যান
দেশবন্ধু রোড, কলি-৩৫

(খ) ইম্ফল বাগ
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রোড, কলি-৩৫

(গ) শরৎ কানন
যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলি-৩৬

(ঘ) তপন দাস স্মৃতি শিশু উদ্যান
৮৬ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬
রামমোহন পার্ক

(ঙ) মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ), কলি-৩৬

দুধের ডিপো : বরানগরে মোট ১০টি দুধের ডিপো আছে। এগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র। কোথায় কোথায় এই কেন্দ্রগুলি রয়েছে, তার একটি তালিকা দেওয়া হল। (ক) ১০৫ কাশীনাথ দত্ত রোড কলি-৩৬ (খ) ২৬৮, গোপাললাল ঠাকুর রোড কলি-৩৫ (গ) ৬৩ দেশবন্ধু রোড (ওয়েস্ট) কলি-৩৫ (ঘ) ১১০/১ অশোক গড় (ইস্ট), কলি-৩৫ (ঙ) ১৭৫ গোপাললাল ঠাকুর রোড কলি-৩৬ (চ) ২৪০ সি গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫ (ছ) ২ বি. কে. মৈত্র রোড, কলি-৩৬ (জ) ৬২ রাইমোহন ব্যানার্জী রোড, কলি-৩৫ (ঝ) ৯২ অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড, কলি-৯০।

ফিল্ম সোসাইটি : নর্থ পয়েন্ট সিনে সোসাইটি
১৬ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬
স্থাপিত : ১৯৬৯

মটর ট্রেনিং সেণ্টার : কাছাকাছির ভেতরে উল্লেখ করার মত হিন্দুস্থান মটর ট্রেনিং অ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল। ৫৮/বি কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬। স্থাপিত : ১৯৪৬।

অফিস অফ দি সাব-রেজিস্ট্রার : বরানগরে নেই। এই এলাকার অফিসটি দমদমে অবস্থিত।

সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি : ১৯৮০ সাল অবধি বরানগরে ৬০টি সবজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

কম্যুনিটি হল : সচরাচর যে অর্থে আমরা কম্যুনিটি হল কথাটি ব্যবহার করে থাকি, সেই অর্থে বরানগরে একটিও কম্যানিটি হল নেই। তবে ইনস্টিট্যুট লেনের শশীপদ ইনস্টিট্যুটকে এর মধ্যে ধরা যেতে পারে। এছাড়া বেঙ্গল ইমিউনিটির ভেতর একটি হল আছে, নাম—বিশ্রাস্তিকা। অবশ্য বরানগর পুরসভা-সংলগ্ন রবীন্দ্র ভবনের নির্মাণ বার্য শেষে এই অভাব মিটতে পারে।

যোগ ব্যায়াম কেন্দ্র : (ক) শিবানন্দ যোগাশ্রম ও যৌগিক হাসপাতাল
৪৭১ নেতাজী কলোনি, কলি-৯০
ফোন : ৫২-১১১৭

(খ) যৌগিক কালচার ইন্‌স্টিট্যুট
শ্রীশ্রী জয়ন্তী মাতা ঠাকুরবাড়ী,
৮৭ রাইমোহন ব্যানার্জী রোড, কলি-৩৫

বয়স্কাউট : (ক) সানফ্লাওয়ার ট্রেনিং সেণ্টার
ফার্স্ট বেঙ্গল বয়স্কাউট অ্যাসোসিয়েশন
(জেলা কেন্দ্র)
২৮ অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড, কলি-৯০

(খ) নর্থ সুবার্বন বয়স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েশন
১৪০ বি. কে. মৈত্র রোড, কলি-৩৬

ব্রতচারী : উত্তর শহরতলী আঞ্চলিক ব্রতচারী সমিতি।
১১৯, নিয়োগী পাড়া রোড, কলি—৩৬

বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্ট্যাচু : (ক) সুভাষচন্দ্র বসু (২-এর পল্লী, মল্লিক কলোনি, ডি. এন, চ্যাটার্জী রোড, বি. টি. রোড বনহুগলী ও বি. টি. রোড-টবিন রোডের সংযোগস্থল)

(খ) রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনগর)

(গ) শরৎচন্দ্র (শরৎ কানন)

(ঘ) বিধানচন্দ্র রায় (বিধান উদ্যান)

(ঙ) রামমোহন (মহারাজানন্দকুমার রোড সাউথ) কলি-৩৬

(চ) কেদারনাথ মণ্ডল (বেহালাপাড়া)

শহিদ বেদী : বরানগরের পথ পরিক্রমাকালে প্রায় ৩০টি শহিদ বেদীর সন্ধান মিলেছে। এগুলির মধ্যে ২/৩টি বাদ দিলে বাকী সমস্ত শহিদ বেদীর গায়ে সময়কাল হিসেবে ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২ সালই বেশীরকমভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

মহিলাদের সেলাই শিক্ষার কেন্দ্র

১। উষা সেলাই স্কুল
২৪৫ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি ৩৬
স্থাপিত : ১৯৬২
এই স্কুলটি জয় ইঞ্জিনীয়ারিং কর্তৃক অনুমোদিত।
এক বছরের কোর্স। ফি : কুড়ি টাকা।
বর্তমান ছাত্রী-সংখ্যা : ১৫০

২। বেঙ্গল টেলারিং অ্যাণ্ড এমব্রয়ডারী স্কুল।
৫৬/১০ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬।
স্থাপিত : ১৯৬৬

ছুটি কোর্স চালু আছে। একটি লেডি ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা, অন্যটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। প্রথমটি তিন বছরের, দ্বিতীয়টি দু'বছরের।

ফি : ১ম টির জন্য টা. ১৯·৫০ প.।

২য় টির জন্য টা. ১৪·০০ প।

নর্থ সুবার্বন বাস প্যাসেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন

কেন্দ্রীয় অফিস : ২৮৪/১ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি—৩৬

শাখা অফিস : (ক) ২ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলি—৩৬

(খ) ৭/৫সি এন. কে. চ্যাটার্জী লেন, কলি—৩৫

বনহুগলী আদিবাসী তফশীলী সমাজ ফেডারেশন

১৭৫ বনহুগলি গভর্ণমেণ্ট কলোনি,

কলি—৩৫

স্থাপিত : ১৯৪৩

মন্দির পরিক্রমা

বরানগরকে এক অর্থে মন্দির-নগরীও বলা চলে। কত যে অসংখ্য মন্দির ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এইসব মন্দিরের অধিকাংশই প্রাচীন, কোনোটি বা নতুন। এর মধ্যে কিছু কিছু মন্দির অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় কোন রকমে টিঁকে আছে। মন্দিরের যে তালিকাটি নীচে দেওয়া হল, তার বাইরেও কিছু মন্দির যে থেকে গেল, সে-ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। যেসব ক্ষেত্রে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মানকাল সম্পর্কে কোনো ফলক চোখে পড়েনি, সেসব ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের মুখের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক জায়গায় মন্দিরের ইঁটের গঠন দেখেও নির্মানকাল সম্পর্কে ধারণা করতে হয়েছে। মন্দিরের বিগ্রহের মধ্যেও রয়েছে নানা ধরনের দেবতা তবে নিঃসন্দেহে শিব মন্দিরের সংখ্যাই বেশী। দু-একটি মন্দিরে লৌকিক দেবতাও রয়েছে। এই মন্দির-পরিক্রমা থেকে গত দেড়শো বছরে বরানগরের ধর্মীয় প্রবণতা ও তার

প্রভাব সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে, এই পরিক্রমা থেকে বাড়ির ভেতরকার মন্দির ও বেআইনীভাবে রাস্তার ফুটপাথ দখল ক'রে থাকা মন্দিরগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

১। জয়মিত্র কালীবাড়ি ও তৎসংলগ্ন ১২টি শিবমন্দির।

হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাণ্ড, কলি—৩৬
স্থাপিত: ১২৫৭ চৈত্র সংক্রান্তি
প্রতিষ্ঠাতা: জয় মিত্র
[দ্র. বরানগরের প্রতিষ্ঠান]

২। শিবমন্দির।

হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাণ্ডের গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন।
স্থাপিত: ১৯০৫ খ্রী:
প্রতিষ্ঠাতা: রাজা দেবেন মল্লিকের জনৈক বংশধর।

৩। ২টি শিব মন্দির (গজেশ্বর ও শঙ্করেশ্বর)

কুঠিঘাট সংলগ্ন।
স্থাপিত: ১০০ বছরের বেশী (আনুমানিক)
প্রতিষ্ঠাতা: গোলকনাথ মুখোপাধ্যায়

(৪) শিবমন্দির (বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গাধর)

মথুরানাথ চৌধুরী স্ট্রীট।
স্থাপিত: ১০০ বছর (আনুমানিক)
প্রতিষ্ঠাতা: যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫) শ্রীশ্রী অমৃতেশ্বর বুড়াশিব

শ্রীকান্ত চৌধুরী লেন।
স্থাপিত: ১২৮৩ (মন্দির-গাত্রে লেখা; কিন্তু ঐ মন্দিরের পূজারী

শ্রীশঙ্কর-কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রচারিত একটি মুদ্রিত আবেদনপত্রে স্থাপনার সময়-হিসাবে ১২৬৩-র উল্লেখ আছে।)

প্রতিষ্ঠাতা : কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

(৬) কালীমন্দির (দক্ষিণাকালী কৃপাময়ী) ও চারটি শিবমন্দির

প্রামাণিক ঘাট রোড।

স্থাপিত : ১২৫৯

প্রতিষ্ঠাতা : শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ও রামগোপাল (দে) প্রামাণিক।

(৭) কালীমন্দির

বরানগর বাজার মোড।

স্থাপিত : ২০০ বছর আগে (আনুমানিক)

প্রতিষ্ঠাতা : নাম পাওয়া যায় নি।

(৮) শীতলা মন্দির

বি. কে. মৈত্র রোড।

স্থাপিত : ১৩৬০

প্রতিষ্ঠাতা : গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

(৯) দুটি শিবমন্দির (যজ্ঞেশ্বর ও গঙ্গাধর)

ভিক্টোরিয়া স্কুলের বিপরীতে বি. কে. মৈত্র রোডের ওপর।

স্থাপিত : ১২৬৮ (৩২ আষাঢ়)

প্রতিষ্ঠাতা : লক্ষ্মীমণি দত্ত ও তস্য বণিতা দুর্গামণি।

(১০) সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির।

বি. কে. মৈত্র রোড।

স্থাপিত : ১২৫০

প্রতিষ্ঠাতা : জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১১) কাঁথাধারী মঠ

মথুরানাথ চৌধুরী ষ্ট্রীট।

স্থাপিত : আনুমানিক ৪০০ বছর আগে

বিগ্রহ : শ্রীকৃষ্ণ।

প্রতিষ্ঠাতা : অজ্ঞাতনামা এক অপুত্রক দম্পতি।

(১২) শীতলা মন্দির

কাশীনাথ দত্ত রোড।

স্থাপিত : ১৯৫৯-৬০

প্রতিষ্ঠাতা : স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ।

(১৩) শিবমন্দির

গোপাললাল ঠাকুর রোড (রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল সংলগ্ন)

স্থাপিত : ১৯৪৪

প্রতিষ্ঠাতা : সহায়রাম সাহু।

(১৪) শীতলা মন্দির

গোপাললাল ঠাকুর রোড (ষষ্ঠীতলা)

স্থাপিত : ১৩৩২

প্রতিষ্ঠাতা : কাদম্বিনী, গিরিবালা দাসী।

(১৫) লাল মন্দির

গোপাললাল ঠাকুর রোড (শরৎ কাননসংলগ্ন)

স্থাপিত : আনুমানিক ৭০ বছর আগে

বিগ্রহ : রাধাকৃষ্ণ

প্রতিষ্ঠাতা : হজুরিমল দুধওয়ালা।

(১৬) শিব মন্দির

বাঘা যতীন রোড

(১৭) কামাখ্যা দেবীর মন্দির

প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
স্থাপিত : ১৯১০ (আনুমানিক)

(১৮) মন্দির

প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
স্থাপিত : আনুমানিক ১৫০ বছর আগে
বিগ্রহ : পঞ্চানন ঠাকুর।

(১৯) শিব মন্দির

পাঠবাড়ী লেন,
বিগ্রহ : শিব ও মঙ্গলচণ্ডী।

(২০) শীতলা মন্দির

পাঠবাড়ী লেন,
স্থাপিত : আনুমানিক ১০০ বছর আগে
সেবাইত : গঙ্গাধর দত্ত, ক্ষেমতামণি দত্ত, ভবতারিণী দেবী, মাধবচন্দ্র দাস, শম্ভুনাথ দত্ত, সরোজিনী দত্ত, শিবদুর্গা দত্ত, নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২১) পাঠবাড়ী

পাঠবাড়ী লেন.
স্থাপিত : আনুমানিক ৩০০ বছর আগে
বিগ্রহ : গৌর-নিতাই

(২২) শিব মন্দির

কাঁচের মন্দির সংলগ্ন।

(২৩) কালী মন্দির

ইন্সটিটিউট লেন,

স্থাপিত : ১৯৫০
প্রতিষ্ঠাতা : নিতাই ভট্টাচার্য্য।

(২৪) রাস বাড়ী

ইন্সটিউট লেন,
বিগ্রহ : গৌর-নিতাই।

(২৫) শ্রীশ্রীআনন্দময়ীর মন্দির

ইন্সটিউট লেন,
স্থাপিত : ১৩৬৯

(২৬) শিব মন্দির

রাজকুমাব মুখার্জী রোড।

(২৭) শীতলা মন্দির

রাজকুমাব মুখার্জী বোড।

(২৮) মনসা মন্দির

ডি. এন. চ্যাটার্জী রোড,
স্থাপিত : আনুমানিক ১০০ বছর আগে।
প্রতিষ্ঠাতা : অক্ষয় চক্রবর্ত্তী।

(২৯) দুটি মন্দির (শিব ও দক্ষিণাকালী নিত্যানন্দময়ী)

দেশবন্ধু রোড, ওয়েষ্ট (আলমবাজার মোড়)
স্থাপিত : আনুমানিক ১৫০ বছর আগে।
প্রতিষ্ঠাতা : হরচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন।

(৩০) শিব মন্দির

রামচন্দ্র বাগচী লেন (আলমবাজার মঠের কাছে)
স্থাপিত : ১০০ বছর আগে।

(৩১) সত্যনারায়ণ মন্দির

এস. পি. ব্যানার্জী রোড।

প্রতিষ্ঠাতা : মজঃফরপুর নিবাসী রামরূপ সিং।

(৩২) জোড়া শিব মন্দির

এস. পি. ব্যানার্জী রোড,

স্থাপিত : আনুমানিক ১০০ বছর আগে।

(৩৩) ১২টি শিব মন্দির

আলমবাজার ঘাটসংলগ্ন

স্থাপিত : ১৭৩৪ শকাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা : পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রামলোচন দাস ঘোষ।

(৩৪) শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

পি. ডবলিউ. ডি. রোড (শ্রীশ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন)।

স্থাপিত : ১৯৭৮

(৩৫) রাধাকৃষ্ণ মন্দির

মহামিলন মঠ।

স্থাপিত : ১৩৮২

বিগ্রহ : অষ্টসখী সমন্বিত শ্যামসুন্দর ও শ্যামরাণী।

(৩৬) শিব মন্দির

অশোকগড় (রেল লাইনের ধারে)

স্থাপিত : ১৯৬৫ (আনুমানিক)

(৩৭) শিব মন্দির

ভট্টাচার্য্য পাড়া

বিগ্রহ : শ্রীশ্রী ৺জীবনেশ্বর শিব।

স্থাপিত : ১৩৪২

(৩৮) কালী মন্দির

নেতাজী কলোনীর ভেতর
স্থাপিত : ১৯৪৯
প্রতিষ্ঠাতা : স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ।

(৩৯) শিব মন্দির

অক্ষয় কুমার মুখার্জী রোড (শাশ্বতী হাউসিং এস্টেটের বিপরীতে)
প্রতিষ্ঠা : আনুমানিক ৩০ বছর আগে।

(৪০) শ্রী শীতলা মন্দির

বনহুগলী (বারুই পাড়া)
স্থাপিত : ১৩৬৭ (নবকলেবরে)
প্রতিষ্ঠাতা : ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও স্বুবর্ণবালা দত্ত

(৪১) কালী মন্দির

পি. ডবলিউ. ডি. রোড ও আর. এম. চ্যাটার্জী রোড সংযোগস্থলে।
স্থাপিত : ১৯৭১ (সংস্কার)
প্রতিষ্ঠাতা : দুলাল সামন্ত।

(৪২) শিব মন্দির

মহারাজা নন্দকুমার রোড, সাউথ (রামমোহন পার্ক সংলগ্ন)
বিগ্রহ : শ্রী শ্রী ভৈরবেশ্বর।
স্থাপিত : ১২২৫

(৪৩) শ্রীশ্রী দয়াময়ীর মন্দির
কালীচরণ ঘোষ রোড।

(৪৪) মা ভবানী মন্দির
রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড (৩০ এ বাস টার্মিনাসের কাছে)
প্রতিষ্ঠা : ১৩৬৫

(৪৫) **শীতলা মন্দির**

কালীচরন ঘোষ রোড।
সংস্কার : অতুলকৃষ্ণ সুর।

(৪৬) **শীতলা মন্দির**

নবীন দাস রোড।

(৪৭) **শিব মন্দির**

৪৮ বি. কে. মৈত্র রোড।
প্রতিষ্ঠাতা : রতন শ্রীমানি।

(৪৮) **শীতলা মন্দির**

ন্যায়রত্ন লেন ও বি. কে. মৈত্র রোডের সংযোগস্থলে।
স্থাপিত : ১৯২০ (আনুমানিক)

(৪৯) **আটাপাড়া শিব মন্দির**

আটাপাড়া লেন।
স্থাপিত : ১৩৭৮ (আশ্বিন)

(৫০) **শিবমন্দির**

তেঁতুলতলা
স্থাপিত : আনুমানিক ১৫০ বছর আগে।

বরানগরের ধর্মীয় সংস্থা

বরানগরের বর্তমান জীবনস্রোতের সঙ্গে বেশ কিছু সংস্থার উপস্থিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নামে 'ধর্মীয়' হলেও তথাকথিত ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে এইসব সংস্থা নানা জনসেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত। যদিও এই গ্রন্থের 'ইতিহাস' পর্বে 'ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ও প্রবাহ' অধ্যায়ে এমন কয়েকটি ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানের আদি পর্বের কথা বলা হয়েছে, যাদের রয়েছে ঐতিহ্যাশ্রয়ী এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু এইগুলি ব্যতিরেকে কিছু সংস্থা সাম্প্রতিক অতীতে জন্মলাভ করেছে। সুতরাং প্রাচীন ও নবীন সমস্ত ধর্মীয় সংস্থার সমসাময়িক অবস্থা/কার্যকলাপের সঙ্গে কিছু পরিসংখ্যানগত তথ্য থেকে যাওয়ার ফলে এগুলিকে সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হ'লো।

(ক) পাঠবাড়ি

১২, ১৩ পাঠবাড়ি লেন,
কলি-৩৫

জমির আয়তন	:	৪ বিঘা।
স্থাপিত	:	আনুমানিক ৩০০ বছর আগে
শাখা	:	নবদ্বীপ, ভগবানগোলা, বারুইপুর, হাওড়া, পুরী, কটক, বৃন্দাবন, কাশী।
কার্যাবলী	:	দাতব্য চিকিৎসালয়, সংস্কৃত টোল, সমাজসেবা, হরিনাম সংকীর্তন।
গ্রন্থাগার	:	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির।
প্রকাশিত গ্রন্থ	:	২০টি।
নিজস্ব পত্রিকা	:	শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর (দ্বিমাসিক)

সংগ্রহশালা : পাঠবাড়ির এই সংগ্রহশালাটি পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলির অন্যতম। এই সংগ্রহশালার অমূল্য সম্পদ এর বিশাল পুঁথির সমাহার। বহু প্রাচীন, মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এই সংগ্রহশালার মর্য্যাদাবৃদ্ধি করেছে। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠি, হিন্দী, ব্রজভাষা মিলিয়ে এই সব পুঁথির সংখ্যা প্রায় চার হাজার। পুঁথির তালিকার জন্য শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস পঞ্চতীর্থ সম্পাদিত ১৩৭৪-এ প্রকাশিত বরাহনগর শ্রীশ্রীপাঠবাড়ি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ও তালিকা দ্রষ্টব্য। পুঁথি ছাড়াও ঐ সংগ্রহশালায় রয়েছে বিভিন্ন এলাকার টেরাকোটা কাজের নমুনা। বহু প্রাচীন ধর্মীয় স্মারক চিহ্ন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, ইতালিয় পণ্ডিত ডি তুচ্চি, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখের হস্তাক্ষরযুক্ত চিঠি ইত্যাদি।

(খ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন

২ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলি ৩৬

স্থাপিত : ১৯৪৬

স্থাপনা : শ্রীশ্রীমদ্ স্বামী সত্যানন্দ দেব

জমির আয়তন : ৪ বিঘা।

শাখা : সিউড়ি. দুবরাজপুর, বাতিকার, নরসিংপুর, রামপুরহাট, জয়দেব-কেন্দুবিল্ব, দুমকা, মধুপুর, কান্দী।

কার্যাবলী : উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, দুগ্ধ বিতরণ ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজ, ধর্মসংক্রান্ত সভা ও ধর্মীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার : পুস্তক সংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার।

নিজস্ব পত্রিকা : ভাবমুখে (মাসিক)

বিশেষ আকর্ষণ : ৪২ ফুট উঁচু একটি কাঁচের মন্দির। মন্দিরে মা ত্রিনয়নী বিগ্রহ। এছাড়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মাতা সারদা দেবী ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মূর্তি আছে। মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯৬৭ শ্যামা পূজার দিন।

(গ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ

৬০/১ রামচন্দ্র বাগচি লেন।

পূর্বতন নাম : আলমবাজার মঠ।

পরবর্তীকালে নাম : শ্রীরামকৃষ্ণ আলমবাজার মঠ।

বর্তমান নামকরণ : ১৯৮০ সাল থেকে নাম হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ। কেননা 'রামকৃষ্ণ মঠ' রামকৃষ্ণ মিশনের রেজিষ্টার্ড নাম। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেলুড় মঠের কোন সম্পর্ক নেই।

স্থাপিত : ১৮৯২

কার্যাবলী : কিণ্ডার গার্টেন স্কুল পরিচালনা, দুগ্ধ বিতরণ, বালক ও বালিকাদের জন্য নন্ ফরমাল এডুকেশন, অনাথ আশ্রম পরিচালনা, বালিকাদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র, টেক্সট-বুক ও পাবলিক লাইব্রেরী। প্রতিদিনের ধর্মীয় পাঠচক্রের আয়োজন করা।

দেওয়াল পত্রিকা : ব্রতধী

(ঘ) বামদেব সংঘ

৪ প্রামানিক ঘাট রোড, কলি-৩৬

প্রতিষ্ঠা : ১৯৬০

প্রতিষ্ঠাতা : সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাখা : তারাপীঠ।

কার্যাবলী : তারাপীঠে অতিথিশালা পরিচালনা। নিজস্ব হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী, পোষাক বিতরণ ইত্যাদি।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ৭টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রেমের ঠাকুর রামকৃষ্ণ, তারাপীঠ ভৈরব ইত্যাদি।

(ঙ) সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী

৬৬ মণ্ডলপাড়া লেন,

কলি-৯০

প্রতিষ্ঠা : ১৯৩০

কার্যাবলী : বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রচার ও গবেষণা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ১৫টি।

নিজস্ব পত্রিকা : বিশ্বরূপ (বর্তমানে প্রকাশ বন্ধ)

(চ) মহামিলন মঠ

৭/৭ পি. ডবলিউ. ডি. রোড, কলি-৩৫

প্রতিষ্ঠা : ১৩৭২

প্রতিষ্ঠাতা : শ্রী শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ

জমির আয়তন : সাড়ে আট বিঘা।

কার্যাবলী : অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিচালনা, নিজস্ব ছাপাখানা—শাস্ত্র ভগবান প্রেস, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র—হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপাথি ইত্যাদি।

নিজস্ব পত্রিকা : আর্য্যশাস্ত্র (মাসিক), পথের আলো (সাপ্তাহিক)।

(ছ) শ্রীশ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭/২ পি. ডবলিউ. ডি. রোড, কলি-৩৫

প্রতিষ্ঠা : ১৩৫৬

প্রতিষ্ঠাতা : শ্রীমধুসূদন বেদতীর্থ।

কার্যাবলী : সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র, আবাসিক ছাত্রাবাস পরিচালনা।

নিজস্ব পত্রিকা : আর্য্যশাস্ত্র (মাসিক)
পথের আলো (সাপ্তাহিক)

প্রকাশিত গ্রন্থ : ৪০টি।

গ্রন্থ সংগ্রহ : ৪০০০ (অধিকাংশ শাস্ত্রসম্পর্কিত ও দুষ্প্রাপ্য)

(জ) সিঁথি হরিসভা

৩৪ আটাপাড়া লেন, কলি-৩৫

প্রতিষ্ঠা : ১৮৭৮

প্রতিষ্ঠাতাগণ : রসময় মণ্ডল, বিপিনবিহারী দাস, কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, হরিচরণ সরকার, হীরালাল দাস, নকুলচন্দ্র দাস, মন্মথনাথ দাস, সুরেন্দ্রনাথ আটা।

কার্যাবলী : হরিসংকীর্তন, নামযজ্ঞ।

বরানগরের মসজিদ

বরানগরে মোট চারটি মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরমধ্যে বরানগর বাজার, আলমবাজার ও মসজিদবাড়ী লেনের মসজিদগুলি বেশ ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। নৈনানপাড়া লেনে (বর্তমান ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের পাশে) একটি প্রাচীন মসজিদ জরাজীর্ন অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া দর্জিপাড়া অঞ্চলেও একটি পরিত্যক্ত মসজিদের সন্ধান মেলে।

(১) বরানগর বাজারের মসজিদ

গোপাল লাল ঠাকুর রোড ·
স্থাপিত : আনুমানিক ১৫০ বছর আগে।

(২) খইরুদ্দিন শা-এর মসজিদ

মসজিদ বাড়ী লেন,
স্থাপিত : আনুমানিক ১০০ বছর আগে
প্রতিষ্ঠাতা : মুন্সী খইরুদ্দিন সাহেব।
বর্ত্তমান ফকির : মহম্মদ করিম শাহ।

(৩) আলমবাজার মসজিদ

১৫৫ মহারাজা নন্দকুমার রোড (নর্থ), কলিকাতা-৩৫
স্থাপিত : ১৭০১
প্রতিষ্ঠাতা : জনাব আলি সর্দার, হবিবুল্লাহ এবং অন্যান্য।

বরানগরের গীর্জা

(১) সেণ্ট জেমস্ চার্চ

১৩ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬

স্থাপিত : ১৯০৫

প্রতিষ্ঠাতা : স্বর্গীয় অমৃতলাল মল্লিক। এ-ব্যাপারে মিস্ জে. ইভান্স নামে এক মহিলার কথাও জানা যায়।

গুরুদ্বারা

১৩১/৩ বি. টি. রোড, কলিকাতা-৩৫ (ডানলপ ব্রীজের কাছে)

স্থাপিত : ১৯৬৯

কবরখানা

বরানগরে বেশকিছু কবরখানা রয়েছে। এরমধ্যে পুরসভার অধীনে রয়েছে দুটি কবরখানা। একটি হিন্দুদের জন্য ও অপরটি মুসলমানদের জন্য। হিন্দুদের মধ্যে এই রীতি অবশ্য সাধারণতঃ চালু আছে বোষ্টম ও যুগী সম্প্রদায়ের মধ্যে। এছাড়া ভূমিষ্ঠ মৃত শিশু বা ১।২ বছরের শিশু মারা গেলেও কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। সেকারণেই হিন্দু কবরখানার উৎপত্তি।

বরানগরে খ্রীষ্টানদের জন্য কোন কবরখানা নেই। সাধারণত তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় আগরপাড়ায়। পুরসভার অধীনে ছাড়াও কিছু কবরখানা আছে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে। হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট কবরখানাটির অবস্থান ১১ বিহারীলাল পাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩৬। এর মোট আয়তন ২ বিঘা ৭ কাঠা। মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট কবরখানাটির ঠিকানা ১৪ মসজিদবাড়ী লেন, কলিকাতা-৩৫, এর মোট আয়তন হল ২ বিঘা ১০ কাঠা। এছাড়াও নবীন দাস রোডে একটি বেসরকারী কবরখানা আছে। একসময় মতিলাল মল্লিক লেনেও একটি কবরখানা ছিল। যে-কারণে এখনও অনেকে এই অঞ্চলকে কবরডাঙা নামে অভিহিত করেন। ১৩ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬-এ অবস্থিত সেণ্ট জেমস্ চার্চ সংলগ্ন জমিতে অবশ্য খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের জন্য একটি কবরখানা আছে বলে শোনা যায়।

শ্মশান ঘাট

বরানগরের মধ্যে শ্মশানঘাট বলতে একটি। সেটি হল কলভিন ঘাট-সংলগ্ন শ্মশান। এটি বরানগর জুট মিলের পাশেই। এই ঘাটে যে সমস্ত ব্যক্তিকে দাহ করা হয়, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করবার মত। এই ঘাটটির নির্মাণকাল সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বরানগরের গরিষ্ঠ-সংখ্যক মানুষই অবশ্য মৃতদেহ সৎকারের জন্য বরানগর-কাশীপুরের সীমানাসংলগ্ন কলিকাতা পুরসভার অধীন কাশীপুর শ্মশানঘাটটি ব্যবহার করে থাকেন। ১৮৭৪ সনে নির্মিত এই ঘাটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী অভেদানন্দ, গৌরী মাতা, শ্রীম, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রমুখ ব্যক্তিকে দাহ করা হয়েছে।

গঙ্গার ঘাট

গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে ঘাট থাকবেই। সেইহেতু বরানগরও এর ব্যতিক্রম নয়। বাড়ির নিজস্ব ঘাটগুলি বাদ দিলে, বরানগর পুরসভা এলাকায় মোট দশটি ঘাটের সন্ধান মেলে (দ্র. বরানগর পুরসভার মানচিত্র)। এই ঘাটগুলির অধিকাংশই প্রাচীন। কয়েকটি ঘাট বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগী মানুষজন কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছে। আবার কিছু ঘাট সংস্কারের অভাবে গঙ্গাবক্ষে বিলীয়মান। প্রাচীনকাল থেকে আজও এই ঘাটগুলি জলপথে পরিবহন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে। নীচে, উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখী, গঙ্গার ঘাটগুলির একটি তালিকা দেওয়া হলো।

(১) ফেরী ঘাট
(২) রামলোচন ঘোষের ঘাট
(৩) কলভিন ঘাট
(৪) শিবু ঘোষের ঘাট
(৫) জয় মিত্র ঘাট
(৬) কাশী সুরের ঘাট
(৭) ভিজু বাবুর ঘাট
(৮) কুটি ঘাট
(৯) জয়নারায়ণ ব্যানার্জীর ঘাট
(১০) প্রামাণিক ঘাট

ডা ক ঘ র

বরানগরের ডাকঘরগুলি প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হলো—লোয়ার সিলেক্শন গ্রেড ডেলিভারি সাব অফিস ও অন্যটি, টাইম স্কেল রিসিভিং অফিস। প্রথম ভাগের অন্তর্গত ডাকঘরগুলি হলো—বরানগর, আলমবাজার, ন-পাড়া ও সিঁথি। এর মধ্যে সিঁথি ডাকঘরটির কিছুটা বরানগর এলাকার অন্তর্ভুক্ত। বাকী অংশ কলকাতা পুরসভার মধ্যে। আবার কলি-৩৬-এর কিছু অংশ কলকাতা পুরসভা নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যে থাকলেও এর বেশীর ভাগ অঞ্চলই বরানগর সীমানার মধ্যে। দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে রয়েছে এই ডাকঘরগুলি—অশোকগড়, বনহুগলি, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, দেশবন্ধু রোড, বেঙ্গল ইমিউনিটি ও নেতাজী কলোনী ডাকঘর। নীচে 'খ' অংশে প্রথম বিভাগের অন্তর্গত ডাকঘরগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হলো। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত ডাকঘরগুলি সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হলো 'ক' অংশে।

(ক)

(১) **অশোকগড় ডাকঘর**
পি. ডবলিউ. ডি. রোড
স্থাপিত : ১৯৫৩

(২) **বনহুগলী ডাকঘর**
স্থাপিত : ১৯৬৮

(৩) **আই. এস. আই ডাকঘর**
বি. টি. রোড

(৪) **দেশবন্ধু রোড ডাকঘর**
১৮/২, দেশবন্ধু রোড (ইষ্ট), কলি-৩৫
স্থাপিত : ১৯৬৭

(৫) **বেঙ্গল ইমিউনিটি ডাকঘর**
স্থাপিত : ১৯৩৫

(৬) **নেতাজী কলোনী ডাকঘর**
স্থাপিত : ১৯৮১

(খ)

নাম	কলিকাতা	অবস্থান	ফোন নং	চিঠি আসে (দৈনিক)	চিঠি যায় (দৈনিক)	স্থাপিত	মোট লেটার বক্স
বরানগর ডাকঘর	৩৬	২০৫, বি. কে. মৈত্র রোড।	৫২-৪১৪২	৪০০০	২০০০	—	১৮
আলমবাজার ডাকঘর	৩৫	সূর্য্য সেন রোড।		১২,০০০	৬০০০	—	১৯
সিঁথি ডাকঘর	৫০	২৭, ডি. গুপ্ত লেন।	৫২-৪৪৮২	—	—	—	১১
ন-পাড়া ডাকঘর	৯০	২৮, অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড।	৫২-৮৫৬৫	—	—	১৯৮১	—

বরানগরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারী/আধা সরকারী/পরিচালনাধীন সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা

(১) ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেসন (এন এস. এস. ও)
২০২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

(২) ডাইরেক্টোরেট অফ সেন্সাস
৩১২ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫

(৩) লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন (এল. আই. সি.)
৯৬/১জি বি. টি. রোড, কলি-২

(৪) রিজিওনাল টেস্টিং সেণ্টার
১১১, ১১২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

(৫) ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট ফর অর্থোপেডিক্যালি হ্যানডিক্যাপড
বি. টি. রোড, বনহুগলী কলি-৯০

(৬) স্মল ইনডাসটিজ সারভিস ইনস্টিট্যুট
১১১, ১১২ বি. টি রোড, কলি-৩৫

(৭) সেণ্ট্রাল ওয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন
বনহুগলী ইনডাসট্রিয়াল এরিয়া, কলি-৩৫

(৮) বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বি. এস. এফ)
টেগোর ভিলা, কলি-৩৫

(৯) ইষ্টার্ন কম্যাণ্ড স্টেশনারী ডিপো
৪৬ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

(১০) কার্টার পুলার কোম্পানি লিমিটেড
১ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬

(১১) বেঙ্গল ইমিউনিটি
৪৪ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬

(১২) সেণ্ট্রাল টুল-রুম এ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার,
বনহুগলী ইনডাসট্রিয়াল এরিয়া, কলি-৩৫

(১৩) রিহ্যাবিলিটেশন ইনডাসট্রিজ কর্পোরেশন,
বনহুগলী, কলি-৩৫

(১৪) এমপ্লয়ীজ স্টেট ইনস্যুরেন্স
২০২/১ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

(১৫) ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট
২০২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

রা জ্য স র কা রী সং স্থা

(১) বরানগর রেশনিং অফিস
৭৬ রাইমোহন ব্যানার্জী রোড, কলি-৩৫

(২) নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন
৩৫ এ যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলি-৩৬

(৩) ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভঃ স্পোর্টস গুডস অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার
৪৫ বি. টি. রোড, কলি-৫০

(৪) সি. আই. ডি. অফিস
৩২/১৪ মতিলাল মল্লিক লেন, কলি-৩৫

(৫) অফিস অফ দি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার
পি. ডবলিউ. ডি.
১৬৬/১০ পি. ডবলিউ. ডি. রোড কলি-৩৫

(৬) ডাইরেক্টোরেট অফ ভেটারেনারী
বরানগর পুরসভা

ক লে জ

(ক) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ
১১১/২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫
স্থাপিত : ২৭ শে জুলাই, ১৯৭৬
কোর্স : বি. এ. / বি. এস. সি.
মোট ছাত্র : ৭৫০

(খ) বনহুগলী কলেজ অফ কমার্স
১১১/২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫
সান্ধ্য বিভাগ।
স্থাপিত : তথ্য অপ্রাপ্ত
মোট ছাত্র : তথ্য অপ্রাপ্ত

বি দ্যা ল য়

বরানগরের বিদ্যায়তনগুলির যে তালিকাটি নীচে দেওয়া হ'ল তার অন্তর্গত বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে কয়েকটিতে মাধ্যমিক এবং কয়েকটিতে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা দান করা হয়। এর মধ্যে রামেশ্বর হাই স্কুল, ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল এবং রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের বয়স একশো বছরের অধিক। বরানগরের বিদ্যায়তনগুলি বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর জন্ম দিয়েছে। এবং শিক্ষামূলক বহুমুখী কাজ-কর্মে এই বিদ্যায়তনগুলির ভূমিকা অসামান্য।

বালকদের জন্য :

১। নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির
২। রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল
৩। ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল
৪। রামেশ্বর হাই স্কুল
৫। সিঁথি আর. বি. টি. বিদ্যাপীঠ
৬। বরানগর বিদ্যামন্দিব
৭। বরানগব নেতাজী হাই স্কুল
৮। সিঁথি শিক্ষায়তন হাই স্কুল
৯। অশোকগড় আদর্শ বিদ্যালয়
১০। আলমবাজার মহেন্দ্রনাথ হাই স্কুল
১১। শ্রীশ্রী বামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ

বালিকাদের জন্য :

১। রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল
২। অশোকগড় সারদা বিদ্যাপীঠ
৩। সিঁথি কস্তুরবা কন্যা বিদ্যাপীঠ
৪। ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল ফর গার্লস
৫। রামেশ্বর গার্লস হাই স্কুল

৬। বরানগর বিদ্যামন্দির ফর গার্লস
৭। বরানগর নেতাজী কলোনী ভারতী গার্লস ইনস্টিটিউশন
৮। বরানগর মায়াপীঠ নারীশিক্ষা আশ্রম
৯। মোহন গার্লস হাই স্কুল
১০। বনহুগলী গার্লস হাই স্কুল
১১। শরৎচন্দ্র ধর বালিকা বিদ্যালয়
১২। মহাকালী পাঠশালা

প্রাথমিক বিদ্যালয়: বরানগরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বসমেত ৮০টি। সরকার অনুমোদিত/অননুমোদিত দুই ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আছে। এর মধ্যে বরানগর পুরসভা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭টি। বরানগরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হলেও হিন্দী, উর্দু এবং পাঞ্জাবী ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও কয়েকটি বিদ্যালয় রয়েছে।

সরকারী/বেসরকারী শিক্ষাদানকেন্দ্র

(১) ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অন্তর্গত রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার, বি. টি. রোড, কলি-৩৫

(২) সেণ্ট্রাল টুল-রুম অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার, বনহুগলি ইনডাসট্রিয়াল এরিয়া, কলি-৩৫

(৩) ন্যাশন্যাল ইনস্টিট্যুট ফর অর্থোপেডিক্যালী হ্যানডিক্যাপড-এর অন্তর্গত রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং উয়িং, বনহুগলী, কলি-৯০

(৪) ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ স্পোর্টস গুডস অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার, বি. টি. রোড, কলি-৫০

(৫) অ্যাসোসিয়েটেড এসবি ইনডাস্ট্রিজ (প্রাঃ লিঃ)-এর অন্তর্গত ইনডাসস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট। ৮১ অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড কলি-৯০

(৬) স্মল ইনডাসট্রিজ সার্ভিস ইনষ্টিট্যুটের অন্তর্গত ট্রেনিং সেণ্টার, ১১১, ১১২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫।

ক মা র্শি য়া ল ক লে জ

বরানগরে মোট ১৭টি কমার্শিয়াল কলেজ আছে। এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শেখানো হয়। বরানগরের এতগুলি কমার্শিয়াল কলেজের মধ্যে মাত্র একটি সরকার অনুমোদিত, সেটির নাম দি নর্থ স্নুবার্বন কলেজ অফ কমার্স, ৩১২/১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬, এবং এই কলেজটি বরানগরের সবথেকে পুরনো কমার্শিয়াল কলেজ। এটি স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালে এবং অনুমোদন পায় ১৯৩৭ সালে।

ব রা ন গ রে ক্লা ব

We are the generation without ties, without any horizon. Our horizon is an abyss. We are the generation without happiness,...without farewells. Our sun is meagre, our loves are cruel and our youth has no youth.

—তরুণ জার্মান নাট্যকার বোরশার্ট (অ্যাট দি ফ্রণ্ট ডোর)

সচরাচর ক্লাব বলতে আজ আমরা যা বুঝি, পরাধীনতার যুগে তার চেহারা ছিল অন্য রকম। তখনকার দিনে ক্লাবের সংখ্যা ছিল বর্তমানের তুলনায় নগণ্য। অথচ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ক'রে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় বাংলার ক্লাবগুলি গ্রহণ করেছিলো এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। দেহচর্চা থেকে শুরু ক'রে স্বদেশী ক্রীড়ার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগরিত করাই ছিল ক্লাবগুলির প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই ক্রমাগত অস্থির পটভূমিকায় ক্লাবগুলির চরিত্র অনেকাংশে বদলে গেল। বৃদ্ধি পেল খেলাধূলার নামে দলাদলি, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি, ধর্মীয় পূজার নামে অর্থের অপচয় ও উদ্দেশ্যহীন উন্মাদনা। আজও, ক্রমশই, কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদে বেশীর ভাগ ক্লাবই হারাতে বসেছে তাদের যুবধর্ম অক্ষুন্ন রাখার ঐতিহ্য। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, সম্মিলিত যুবশক্তির প্রতীক হিসাবে ক্লাবগুলি এখনও গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

বরানগরেও ক্লাবের সংখ্যা কিছু কম নয়। এদের মধ্যে অনেকগুলিই ঐতিহ্যপূর্ণ ও প্রাচীন। অল্প সময়ের মধ্যে বরানগরের বিভিন্ন অঞ্চলে পদব্রজে ঘুরে যে-কয়েকটি ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থা ও নাট্যগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলিকে একত্রিত করা হলো। আমরা নিঃসন্দেহ যে, এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়।

১। **জাগৃতি**
২৭ মসজিদ বাড়ি লেন, কলি-৩৫

২। **মহাজাতি সংঘ**
৩৫ ভোলানাথ নাথ স্ট্রীট্, কলি-৩৬

৩। **অরোরা ক্লাব**
৬ বেনিয়াপাড়া লেন, কলি-৩৬

৪। **ত্রয়ী**
১৬/২ জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন, কলি-৩৬

৫। **পূর্বাচল সংঘ**
১৮৫ বনহুগলী গভর্ণমেণ্ট কলোনি, কলি-৩৫

৬। **আলমবাজার ব্যায়াম সমিতি**
৫৭ বিদ্যায়তন সরণী, কলি-৩৬

৭। **সাঁঝের তারা সব পেয়েছির আসর**
২২/১৮ যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলি-৩৬

৮। **সম্মিলনী**
৪ শশীভূষণ বসাক লেন, কলি-৩৬

৯। **বনহুগলী নবীন সংঘ**
৬ নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রীট্, কলি-৩৫

১০। **বীণাপাণি ক্লাব**
৯ কার্তিক চন্দ্র নিয়োগী লেন, কলি-৩৫

১১। **ময়রাডাঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাব**
৫০/৫ ময়রাডাঙ্গা রোড, কলি-৩৬

১২। **ভোলানাথ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব**
৮ ভোলানাথ নাথ স্ট্রীট্, কলি-৩৬

১৩। **দেশবন্ধু এ্যাথলেটিক ক্লাব**
১০৮ দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম), কলি-৩৫

১৪। **রাজা রামমোহন স্মৃতি সংঘ**
১০৪ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

১৫। **উত্তরায়ণ শিশুমেলা**
১০২ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

১৬। **নবীন সংঘ**
১৯০ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫

১৭। **ফ্রেণ্ডস্ অ্যাসোসিয়েশন**
৫১/১ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬

১৮। **নবজীবন যুবক সংঘ**
১৫৭ এ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলি-৫০

১৯। **বেঙ্গল জিমন্যাসিয়াম**
১৭ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬

২০। **মাণিক মেমোরিয়াল ক্লাব**
১৪ মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ), কলি-৩৬

২১। **বন্ধুমহল রিক্রিয়েশন ক্লাব**
১০৪ বি. টি. রোড, কলি-৩৫

২২। **নিয়োগী পাড়া লোটাস ক্লাব**
৩৩ নিয়োগী পাড়া রোড, কলি-৩৫

২৮। **জীবন সংঘ স্পোর্টিং ক্লাব**
রাজকুমার মুখার্জী রোড, কলি-৩৫

২৯। **কর্মী সংঘ**
৯৮ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬

৩০। **নববর্ত্তিকা সংঘ**
গঙ্গাধর সেন লেন, কলি-৩৬

৩১। **প্রফুল্লচাকী কর্মী সংঘ**
প্রফুল্ল চাকী রোড

৩২। **নবমুক্তি সংঘ**
২৮/বি, টি. এন. চ্যাটার্জী রোড, কলি-৯০

৩৩। **মিলনগড় সম্মিলনী**
৭৩/১৩ বারুই পাড়া লেন, কলি-৩৫

৩৪। ষষ্ঠীতলা স্পোর্টিং ক্লাব
২৬ জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন, কলি-৩৬

৩৫। বেঙ্গল টাইগার
২৬৫ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন. কলি ৩৬

৩৬। নারায়ণী স্পোর্টিং ক্লাব
১৭ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬

৩৭। ছুটির বৈঠক
২৮ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬

৩৮। সম্মিলিত জাতীয় সংঘ
৬৭ কালীনাথ মুন্সী লেন, কলি-৩৬

৩৯। বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব
৯৭, ১০৬ নিয়োগী পাড়া রোড, কলি-৩৬

৪০। বরানগর ব্যায়াম সমিতি
৫৬/১ অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন, কলি ৩৬

৪১। তাঁতিপাড়া উন্নয়ন সমিতি
২৫ কালীনাথ মুন্সী লেন, কলি-৩৬

৪২। সূর্য তরুণ
অতুলকৃষ্ণ বসু লেন, কলি-৩৬

৪৩। সিঁথি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন
১১ আটাপাড়া লেন, কলি-৫০

৪৪। সিঁথি আগত সম্মিলনী
রামকালী মুখার্জী লেন, কলি-৫০

৪৫। লোক শিক্ষা সংসদ
অতুলকৃষ্ণ বসু লেন, কলি-৩৬

৪৬। মিলন সংঘ
২৭ জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন, কলি-৩৬

৪৭। নবযুবক সংঘ
১০১ সূর্য সেন রোড, কলি-৩৫

৪৮। **মুক্তি সংঘ**
১৬ সূর্য সেন রোড, কলি-৩৫

৪৯। **মহাবীর সংঘ**
১১ প্রভাতচন্দ্র দে লেন, কলি-৩৬

৫০। **নর্থ ক্যালকাটা রিক্রিয়েশন ক্লাব**
৫৫/ই বিদ্যায়তন সরণী, কলি-৩৫

৫১। **বান্ধব**
পাঠবাড়ি লেন, কলি-৩৬

৫২। **সেণ্টোফোসিয়া** (নাট্য গোষ্ঠী)
৩/১৮ নিয়োগী পাড়া রোড, কলি-৩৬

৫৩। **নবোদয়**
৭ মতিলাল মল্লিক লেন, কলি-৩৫

৫৪। **শান্তি সংঘ পাঠাগার**
২৭ রামলাল ব্যানার্জী রোড, কলি-৩৬

৫৫। **অভেদানন্দ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান**
৭১, ৭২ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলি-৩৬

৫৬। **শরৎচন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাব**
৪ দয়ালকৃষ্ণ মুখার্জী রোড, কলি-৩৫

৫৭। **জেলেপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব**
প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলি-৩৬

৫৮। **ইউনাইটেড ক্লাব**
১৬ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলি-৩৬

৫৯। **সত্তম সাংস্কৃতিক সংস্থা**
১০৯ নেতাজী কলোনী, কলি-৯০

৬০। **কৃষ্টিচক্র**
৪৮ দেশবন্ধু রোড, কলি-৩৫

৬১। **দর্পণ সাংস্কৃতিক সংস্থা**
৪ শরৎ ধর রোড, কলি-৯০

৬২। **জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ**
৩ অম্বিকা চরণ মুখার্জী লেন, কলি-৩৬

৬৩। **স্টাডি ক্লাব**
১১১/১ মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ) কলি-৩৬

৬৪। **বালার্ক**
১৮৪ বারুইপাড়া লেন, কলি-৩৫

৬৫। **প্রগতি উদয়ণ সংঘ**
১ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলি-৫০

৬৬। **প্রগতি কিশোর শক্তি সংঘ**
৪০৫ নেতাজী কলোনী, কলি-৯০

৬৭। **উত্তরাঞ্চল যুব সংঘ**
নেতাজী কলোনী, কলি-৯০

৬৮। **কল্যাণ সংঘ**
৩৫ বরদা বসাক স্ট্রীট, কলি-৩৭

৬৯। **নতুন মুখ (নাট্য গোষ্ঠী)**
শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলি-৩৬

৭০। **বাঘাযতীন স্পোর্টিং ক্লাব**
নেতাজী কলোনী (ওয়েষ্ট ব্লক), কলি-৩৬

৭১। **পালপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব**
১০২/৬ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬

৭২। **নিউ ইউথ রিক্রিয়েশন ক্লাব**
৩১/১/বি৩ রামচাঁদ মুখার্জী লেন, কলি-৩৬

৭৩। **সেবা সংঘ**
বি. টি. রোড, কলি-৯০

৭৪। **মিলন সংঘ**
গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫

৭৫। **প্রতীক (নাট্য গোষ্ঠী)**
নবীন দাস রোড, কলি-৯০

৭৬। **সঞ্চারী**
কুঠিঘাট রোড, কলি-৩৬

বরানগরে আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও নাট্য-গোষ্ঠী আছে যেগুলির ঠিকানা ও অবস্থান সংগ্রহ করা যায়নি। এক্ষেত্রে সেগুলির নাম উল্লেখ করা হলো—**চলন্তিকা, সাগ্নিক, নান্দী শিল্পী, নাট্যরঙ্গ, ক্যালকাটা মিনি থিয়েটার, ঝঙ্কার, হিন্দোলী, কালকূট।** বরানগরে নাট্য-গোষ্ঠীগুলির প্রযোজিত নাটক ও আয়োজিত নাট্যোৎসবও আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

স ঙ্গী ত শি ক্ষা কে ন্দ্র

১। **শ্রাবণী সঙ্গীত-শিক্ষা কেন্দ্র**
৮১ যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলি-৩৬

২। **সুরমহল**
১৩/১ রামলাল আগরওয়ালা লেন, কলি-৫০

৩। **রাগরূপ**
২৪/২৪ অক্ষয় কুমার মুখার্জী রোড, কলি-৯০

৪। **রবিবীণা**
৭/২/এ, চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী লেন, কলি-৩৫

৫। **গীতলেখা সঙ্গীত বিদ্যালয়**
৫৩/২৬ বিদ্যায়তন সরণী, কলি-৩৫

৬। **সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র**
৪/২ চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী লেন, কলি-৩৫

৭। **বরানগর মহিলা মহল**
৮৪/১ নিয়োগী পাড়া রোড, কলি-৩৬

৮। **সঙ্গীতা**
১৭ নৈনান পাড়া লেন, কলি-৩৬

৯। **ইউফোনিক মেলোডি**
১৯ রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড, কলি-৫০

১০। **দি নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক কলেজ**
১৪৬ অশোকগড়, কলি-৩৫

১১। **সুরধুনী** (সরকার অনুমোদিত)
বি. টি. রোড, কলি-৩৬

১২। **সঙ্গীতম**
২১২ বি. টি. রোড, কলি-৩৬

১৩। **গীতালি**
৫২/২ যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলি-৩৬

১৪। **ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউজিক সার্কেল**
বেহালা পাড়া

১৫। **গীতায়ন**
১০এ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬

১৬। **ইফকা**
২/১২ টি এন, চ্যাটার্জী রোড, কলি-৯০

১৭। **তানসেন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়**
১ পি. ডবলিউ. ডি রোড, কলি-৩৫

১৮। **সুরনির্ঝর**
১৪৬/১ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫

১৯। **স্বর ও সুর**
১৬৭।১/ডি গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৫

২০। **সুর ও শ্রুতি**
৬৭ শরৎ কানন, কলি-৩৬

২১। **রাগেশ্রী**
১৮১ প্রামাণিক ঘাট রোড, কলি-৩৬

২২। **সপ্তক সুর**
৩৮ অতুল কৃষ্ণ বোস লেন, কলি-৩৬

২৩। **দেবেন্দ্র স্মৃতি সঙ্গীত বিদ্যালয়**
১৫৯ রামলাল ব্যানার্জী রোড, কলি-৩৬

২৪। গ্রীন অর্কেষ্ট্রা
৩৬/১ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬

২৫। সিমফনি
৭৯/১ কাশীনাথ দত্ত রোড, কলি-৩৬

২৬। শ্রীমা সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র
শ্যামাচরণ চক্রবর্তী লেন, কলি-৩৬

২৭। সুর পঞ্চম মিউজিক সার্কেল
মতিলাল মল্লিক লেন, কলি-৩৫

২৮। গীত বীথি
৯১ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৮

গ্র ন্থা গা র

"লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে।··· এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত বাস করে।"

—রবীন্দ্রনাথ

অত্যন্ত সুখের কথা, বরানগরে একই সঙ্গে সতেরোটি গ্রন্থাগারের অবস্থান। এগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিধন্য শশিপদ ইনস্টিট্যুট ও বহু মনীষীর আশীর্বাদপুষ্ট বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরী, তেমনই রয়েছে ঐতিহ্যপূর্ণ বনমালি বিপিন পাবলিক, দেশবন্ধু ও বনহুগলি লাইব্রেরীর মত ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রন্থাগার। পাশাপাশি আছে আই. এস. আই-এর মত বিশাল ও আধুনিক গ্রন্থাগার। সব মিলিয়ে বরানগরের গ্রন্থাগার-চিত্রটি বেশ উজ্জ্বল, যা একটি বিদ্যোৎসাহী পরিবেশ গঠনের সহায়ক হতে পারে।

নাম	ঠিকানা	স্থাপিত	মোট পুস্তকের সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা।
পালপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী	৩১/এ বাঘা যতীন রোড, কলি-৩৬	১৯৩৩	৫৫০০	৪০০
নবপল্লী সাধারণ পাঠাগার	২৬৫/এম গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬	১৯৫৫	২৫০০	২৫৫
শান্তি সংঘ পাঠাগার	২৭ রামলাল ব্যানার্জী রোড, কলি-৩৬	১৯৫৪	৯০০	৬২
পল্লী সংঘ পাঠাগার	১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলি-৯০	১৯৪০	১২০০	৬০
শশিপদ ইনস্‌টিটিউট	২৩ ইনস্‌টিট্যুট লেন, কলি-৩৫	১৮৭৬	৭০০০	২৫০
অশোকগড় সাধারণ পাঠাগার	৪৯ অশোকগড় কলি-৩৫	১৯৫৬	৪০০৭	২৫১
আই. এস. আই. লাইব্রেরী	২০২ বি. টি. রোড কলি-৩৫	১৯৩১	১৯৫৫৪১	৩৬৯০
দেশবন্ধু লাইব্রেরী	৮৯ ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী রোড, কলি-৩৫	১৯২৫	৬৫০০	১৫০

নাম	ঠিকানা	স্থাপিত	মোট পুস্তকের সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা
বনহুগলী লাইব্রেরী	২০ নিমচাঁদ মৈত্র ষ্ট্রীট, কলি-৩৫	১৯২০	১৫০০০	১৬০
বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরী	১১৩ বি. কে. মৈত্র রোড, কলি-৩৬	১৮৭৬	৪০২৫	১৬৮
কিশোর পাঠচক্র	৪ নিয়োগীপাড়া রোড, কলি-৩৬	১৯৮১	৪০০	১০
রামকৃষ্ণ মিশন এরিয়া লাইব্রেরী	গোপাল লাল ঠাকুর রোড কলি-৩৬	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত
ভবানী সেন পাঠাগার	৪ অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড, কলি-৯০	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত
ভিবজিওর	১৮৪ মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ) কলি-৩৬	১৯৭২	১১০০	১১১
সিঁথি বনমালী বিপিন পাবলিক লাইব্রেরী	১৩ আটাপাড়া লেন, কলি-৫০	১৯৩০	৫১০৭	তথ্য অপ্রাপ্ত
শক্তিসংঘ পাঠাগার	রামলাল আগরওয়ালা লেন, কলি	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত	তথ্য অপ্রাপ্ত
আলমবাজার উর্দু লাইব্রেরী	১৫৫ মহারাজা নন্দকুমার রোড, (নর্থ) কলি-৩৫	১৯৭৪	১০৫০	২৫০

বরানগরে পরিবহন

(ক) বাস :

রুট নং	সূত্রপাত (খ্রীষ্টাব্দ)	মোট বাস	যাত্রাস্থল গন্তব্য	যাত্রাপথ	ভাড়া সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন টাঃ পঃ	মালিকানা
৩৪ বি	১৯৬৬	২২	ডানলপ ব্রীজ ধর্মতলা	গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরানগর বাজার, সিঁথি, শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রীট্, ওয়েলিংটন।	·৪০ ·৩০	বেসরকারী
৩২	১৯৩৬	২৪	দক্ষিণেশ্বর ধর্মতলা	সূর্য সেন রোড, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কাশীপুর রোড, শ্যামবাজার, বি. কে. পাল এ্যাভেনিউ, বড়বাজার, বি-বা-দি বাগ।	·৪০ ·৩০	বেসরকারী
[illegible]৩	১৯৬৭	১৮	বনহুগলী ধর্মতলা	গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কাশীপুর রোড, রবীন্দ্র সরণী, বেন্টিক স্ট্রীট্।	·৪০ ·৩০	বেসরকারী

৩৪	১৯৫৭	১২	আড়িয়াদহ ধর্মতলা	দক্ষিণেশ্বর, সূর্য সেন রোড, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরানগর বাজার, সিঁথি, শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন।	·৪০ ·৩০	বেসরকারী
এস ১৭	১৯৭৮	১০	আড়িয়াদহ চেতলা	দক্ষিণেশ্বর, সূর্য সেন রোড, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরানগর বাজার, সিঁথি, শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রীট, চৌরঙ্গী, হাজরা রোড, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ।	২·২০ ·৫০	সরকারী
৩৪সি	১৯৬৮	৭	ন-পাড়া ধর্মতলা	অক্ষয় মুখার্জী রোড, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরানগর বাজার, সিঁথি, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, মৌলালী।	·৪০ ·৩০	বেসরকারী

রুট নং	সূত্রপাত (খ্রীষ্টাব্দ)	মোট বাস	যাত্রাস্থল গন্তব্য	যাত্রাপথ	ভাড়া সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন টাঃ পঃ	মালিকানা
১৫৮ (মিনিবাস)	১৯৭৪	১১	দক্ষিণেশ্বর বাবুঘাট	সূর্য সেন রোড, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরানগর বাজার, সিঁথি, শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রীট, বৌবাজার, বিবাদী বাগ।	১·৭০ ·৬৫	বেসরকারী
মিনিবাস	১৯৭৬	৭	শ্রীরামপুর শ্যামবাজার	জি. টি. রোড, দক্ষিণেশ্বর, ডানলপ ব্রীজ, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কাশীপুর রোড, শ্যামবাজার।	২·৫০ ·৫০	বেসরকারী
এল ২০	১৯৭৩	১১	ব্যারাকপুর কোর্ট ধর্মতলা	বি. টি. রোড, শ্যামবাজার, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ।	·৯০ ·৪০	সরকারী

এস ২০এ	১৯৭৮	১২	শ্যামবাজার (আর জি কর) বারাসত	শ্যামবাজার, বি. টি, রোড, ব্যারাকপুর ষ্টেশন, মোহনপুর, নীলগঞ্জ বাজার, আক্রামপুর।	১·০০ .৪০	সরকারী
৭৮	১৯৪৬	৪২	শ্যামবাজার ব্যারাকপুর	শ্যামবাজার, বি. টি. রোড।	·৫০ ·৩০	বেসরকারী
৭৮এ	১৯৪৮	৩০	শ্যামবাজার বনগ্রাম	বি, টি. রোড, সোদপুর, বারাসত রোড, মধ্যমগ্রাম যশোহর রোড।	১·৬৫ ·৩০	বেসরকারী
৭৮বি	১৯৭০	১৭	সোদপুর ঘোলা শ্যামবাজার	এইচ বি টাউন, সোদপুর ষ্টেশন, বি. টি. রোড, শ্যামবাজার	·৫০ ·৩১	বেসরকারী
৭৮সি	১৯৭১	২০	বেলঘরিয়া ষ্টেশন বাবুঘাট	ফীডার রোড, বি. টি. রোড, শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন।	·৪০ ·৩০	বেসরকারী

রুট নং	সূত্রপাত (খ্রীষ্টাব্দ)	মোট বাস	যাত্রাস্থল গন্তব্য	যাত্রাপথ	ভাড়া সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন টাঃ পঃ	মালিকানা
৭৮সি/১	১৯৭৬	৮	দক্ষিণেশ্বর যশোর রোড	ফীডার রোড, ডানলপ, পি. ডবলিউ. ডি রোড।	·৫০ ·৩০	বেসরকারী
৭৮/১	১৯৭০	৪	রহড়া বাবুঘাট	নীলগঞ্জ রোড, সোদপুর ষ্টেশন, বি. টি. রোড, শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন।	·৭০ ·৩০	বেসরকারী
২০৩	১৯৮০	৩	বরানগর ধর্মতলা	পি. ডবলিড, ডি রোড, তাঁতি-পাড়া, এম. এন. কে. রোড, বরানগর বাজার, কাশীপুর রোড, চিড়িয়ামোড়, শ্যাম-বাজার, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ।	·৪০ ·৩০	বেসরকারী

এল৯	১৯৭২	১২	ডানলপ ব্রীজ গোলপার্ক	বি. টি. রোড, শ্যামবাজার, চিত্ত-রঞ্জন এ্যাভিনিউ, চৌরঙ্গী, শরৎ বোস রোড, সাদার্ন এ্যাভিনিউ।	·৫০ .৪০	সরকারী
এল৯	১৯৭৬	৮	ডানলপ ব্রীজ পোলপার্ক	বি. টি. রোড, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ, জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, শরৎ বোস রোড, সাদার্ন এ্যাভিনিউ।	২·০০ ·৫০	সরকারী
১১ .	১৯৫৮	১৩	বেলঘরিয়া রথতলা হাওড়া ষ্টেশন	বি, টি. রোড, শ্যামবাজার শিয়ালদহ, হ্যারিসন রোড।	·৫০ ·৩০	সরকারী
১১এস	১৯৭৭	৬	ব্যারাকপুর কোর্ট ধর্মতলা	বি. টি. রোড, শ্যামবাজার, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ।	২·৭৫ ·৫০	সরকারী

রুট নং	সূত্রপাত (খ্রীঃ)	মোট বাস	যাত্রারম্ভ গন্তব্য	যাত্রাপথ	ভাড়া সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন টাঃ পঃ	মালিকানা
৪বি	১৯২৬	১৪	বরানগর ধর্মতলা	কাশীপুর রোড, রবীন্দ্র সরণী, বিবেকানন্দ রোড, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ।	·৪০ ·৩০	সরকারী
১৪৯	১৯৭৩	১৩	ডানলপ ব্রীজ বিবাদী বাগ	বি. টি. রোড, শ্যামবাজার, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ।	১·৬৫ ·৬৫	বেসরকারী
২০১	১৯৮০	৩	লবণ হ্রদ (করুণাময়ী) বেলঘরিয়া	উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, শ্যামবাজার, বি. টি. রোড, ফীডার রোড।	·৫০ ·৩০	বেসরকারী

৩০এ	১৭	বাবুঘাট সিঁথি	চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, বি. টি. রোড, কালীচরণ ঘোষ রোড (সিঁথি)	·৪০ ·৩০	বেসঃকারী
৫১	২০	ডানলপ হাওড়া	অশোকগড়, দক্ষিণেশ্বব, জি. টি. রোড, নস্কর পাড়া, যোগীন মুখার্জী রোড, হরগঞ্জ রোড, অবণী দত্ত রোড, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রোড	·৫০ ·৩০	বেসরকারী
৫৬	২০	ডানলপ হাওড়া	অশোকগড়, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, গিরীশ ঘোষ রোড, ঘুশুড়ি, সালকিয়া স্কুল রোড অবণী দত্ত রোড, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রোড।	২·২৫ ·২৫	বেসরকারী

রুট নং	সূত্রপাত (খ্রীষ্টাব্দ)	মোট বাস	যাত্রাস্থল গন্তব্য	যাত্রাপথ	ভাড়া/সর্বোচ্চ সর্ব্বনিম্ন টাঃ পঃ	মালিকানা
২৫		৭	দক্ষিণেশ্বর বরুপোতাঘাট	তথ্য অপ্রাপ্ত	২·২৫ ·৩০	বেসরকারী
২৬		১৬	দক্ষিণেশ্বর চাপাডাঙ্গা	তথ্য অপ্রাপ্ত	২·৪০ ·২৫	বেসরকারী
৩		৪৩	শ্রীরামপুর শ্যামবাজার (গিরীশ পার্ক)	জি. টি. রোড, দক্ষিণেশ্বর, অশোকগড়, বি. টি. রোড, শ্যামবাজার।	·৮০ ·২০	বেসরকারী

(খ) বরানগরে সাইকেল রিক্সা

মোট রিক্সা : ১৫০০ (আনুমানিক)

মোট রিক্সা স্ট্যাণ্ড : ৫০

রিক্সা ভাড়া : সর্বনিম্ন ৫০ প; ½ কি. মি. ৬০ প; ১ কি. মি. পর্যন্ত ৬০ প; ১ কি. মি. উর্দ্ধে প্রতি ½ কি. মি. ২৫ প। এই ভাড়ার হার দূরত্ব হিসাবে। এছাড়া সময় হিসাবে ভাড়া এরকম—প্রতি ১০ মি. পর্যন্ত ৬০ প; উর্দ্ধে প্রতি ৫ মি. পর্যন্ত ২৫ প; প্রতি ঘণ্টায় ৪·০০; অপেক্ষাকালীন ভাড়া প্রতি ½ ঘণ্টায ১.০০। ভাড়ার এই হার পুরসভা কর্তৃক নির্দ্ধারিত।

(গ) ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড : বরানগর বাজার, সিঁথি মোড়, বি. টি. রোড-টবিন রোডের মোড, ডানলপ।

(ঘ) ফেরী : কুটিঘাট।

হা উ সিং এ স্টে ট

নাম স্থাপিত	ঠিকানা	মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা	জমির আয়তন	ধরন
তথ্য অপ্রাপ্ত	২, দয়ালকৃষ্ণ মুখার্জী রোড, কলি-৩৫	ব্লক : এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি,	৭ বিঘা ৪ ছটাক	ভাড়া
শান্তনীড় ১৯৭৪	২৫২, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলি-৩৬	৩৮০, এর মধ্যে পুলিশদের জন্য বরাদ্দ ২৫০টি।	১৩ বিঘা ১৭ কাঠা	মালিকানা।
উত্তরায়ণ ১৯৭৯	১০২, বি. টি. রোড, কলি-৯০	৩৩২	১৭ বিঘা ১১ কাঠা	মালিকানা।
শাশ্বতী ১৯৭৬	৮৭/২, অক্ষয় কুমার মুখার্জী রোড, কলি-৯০	২১৩, এর মধ্যে পুলিশদের জন্য বরাদ্দ ১৪৪টি।	৬ বিঘা ১০ কাঠা	

বরানগরে অপরাধ

সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে অপরাধ একটি প্রাচীন ঘটনা। যুগে যুগে মানুষের সৃষ্ট অপরাধ মানুষেরই সংশয় ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এই অপরাধ, কিভাবে তার নিরসন—এসব বিচারের ভার অপরাধতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকের ওপর ন্যস্ত। তবে, ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াই যখন অপরাধীকুলের ধর্ম, আইনের গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে দমনের দায়ও রক্ষক হিসেবে পালন করতে হয় পুলিশ, প্রশাসন ও আদালতকে। আইনকে নিজের হাতে তুলে না নিয়ে সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন জনগনও। সামাজিক জটিলতা ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার কঠিন আবর্তে দাঁড়িয়ে অপরাধের ঘটমান বর্তমান থেকে বরানগরের মত একটি স্থান ব্যতিক্রম হতে পারে না। একথা মনে রেখেই, বরানগরের অপরাধ-তালিকার একটি তুলনামূলক চিত্র প্রকাশিত হলো।

অপরাধ	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০	১৯৮১
বড়ো ডাকাতি	৩	২	১	১
ছোট ডাকাতি	৫	২	৩	৪
দিনে চুরি	৫	২	২	০
রাতে চুরি	১৬	১৭	৭	৫
বাড়ির চুরি	১৩৫	১১৪	১১০	৫২
অন্যান্য চুরি	২৮৫	২৮৪	২০২	২০৮
গৃহ ভৃত্যের দ্বারা চুরি	১০	৫	৫	৩
সাইকেল চুরি	২৫	২১	১২	১৫
পকেটমারি	৩	৫	২	১
ঠগবাজি	১২	৬	৩	০
ইচ্ছাকৃত হত্যা	১	০	৩	২
অনিচ্ছাকৃত হত্যা	৩	৪	৩	১
দাঙ্গাহাঙ্গামা	৪৭	২৬	১৫	২০
ছিনতাই	৩০০	২০০	১৫০	১৮৫

পথের তালিকা

পথের নাম	উৎস
অ	
অতুল কৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন	২২৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
অম্বিকা চরণ মুখার্জী লেন	৩০৭, গোপাল লাল ঠাকুর রোড
অতুল কৃষ্ণ বোস লেন	১৮৫, প্রামাণিক ঘাট রোড
অমৃত লাল দাঁ রোড	২৮৬, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর)
অশোকগড়	পি. ডবলিউ. ডি. রোডের উত্তর অংশ
অক্ষয় কুমার মুখার্জী রোড	৬১/এ, বি. টি. রোড
আ	
আটাপাড়া লেন	৪৭, রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড
আলমবাজার কুমোর পাড়া	৩/১ দয়াল কুমার মুখার্জী রোড
ই	
ইন্‌স্টিটিউট লেন	৮০, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
ঋ	
ঋষি অরবিন্দ সরণী	১০৯, বি. টি. রোড
ক	
কল্‌ভিন ঘাট রোড	২৮৬, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর)
কালিদাস লাহিড়ী লেন	৭, মাস্তসর্দার বি. কে. মৈত্র রোড
কালীপ্রসন্ন ন্যায়রত্ন লেন	১১২ ,, ,, ,, ,, ,,
কামারপাড়া লেন	২৪, বরদা বসাক স্ট্রীট
কালীনাথ মুন্সী লেন	১২৩, প্রামাণিক ঘাট রোড
কালীতলা লেন	৪৩, মাস্তসর্দার বি. কে. মৈত্র রোড
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রোড	আলমবাজার মোড়
কার্তিক নিয়োগী লেন	১৭৩, বারুই পাড়া লেন
কাশীনাথ দত্ত রোড	১, গোপাললাল ঠাকুর রোড
কাশীপুর রোড	৩৪৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)

পথের নাম	উৎস
কালীচরণ ঘোষ রোড	১০, বি. টি. রোড
কেদারনাথ ব্যানার্জী লেন	১৮/১, নিয়োগী পাড়া রোড
কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য লেন	১৭, ইন্‌স্‌টিটিউট লেন
কুমোরপাড়া (বনহুগলী) লেন	১৬, দেশবন্ধু রোড (পুর্ব)
কৃষ্ণদাস পাল লেন	৪, রাজকুমার মুখার্জী রোড
ক্ষেত্রমোহন ব্যানার্জী লেন	১১১/১, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
গ	
গঙ্গাধর সেন লেন	৩৬/২, বাঘা যতীন রোড
গিরীশ চন্দ্র ঘোষ রোড	১২৪, গোপাললাল ঠাকুর রোড
গোপাল লাল ঠাকুর রোড	২০৩, কাশীনাথ দত্ত রোড
গৌরীশংকর পাণ্ডে লেন	৪৭, বি. টি. রোড
ঘ	
ঘোষপাড়া লেন	২৭৩/১, বি. টি. রোড
চ	
চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী লেন	১২৪, রাজকুমার মুখার্জী রোড
জ	
জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন	১৪৫, মাস্তসর্দার বটকৃষ্ণ মৈত্র রোড
ড	
ডাক্তার নীলমণি সরকার স্ট্রীট	৬/১ ত্রৈলোক্য নাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
ডি. এন. চৌধুরী লেন	২৬৫/৩, গোপাললাল ঠাকুর রোড
ত	
তারাপ্রসাদ মৈত্র লেন	৭, শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী লেন
ত্রৈলোক্য নাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট	৮৪, বি. টি. রোড
দ	
দয়াল কুমার মুখার্জী রোড	২৩, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট
দিলীপ গাঙ্গুলী সরণী	১৬১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড

পথের নাম	উৎস
দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)	১৮৩, গোপাল লাল ঠাকুর রোড
,, ,, (পশ্চিম)	৪৫, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
দেশপ্রাণ শাসমল এ্যাভিন্যু	৭/১, পি. ডবলিউ. ডি. রোড
ধ	
ধীরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী রোড	দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
ন	
নবীন চন্দ্র দাস রোড	৯৮, অক্ষয় কুমার মুখার্জী রোড
নন্দলাল দে স্ট্রীট	২১, হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাণ্ড
নরসিংহ প্রসাদ দত্ত রোড	৮৬, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (দক্ষিণ)
নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রীট	১১, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
নিয়োগী পাড়া রোড	২৩৫, গোপাল লাল ঠাকুর রোড
নৈনান মুসলমান পাড়া লেন	১১, কাশীনাথ দত্ত রোড
প	
পাঠবাড়ী লেন	৩৭০, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর)
পি. ডবলিউ. ডি. রোড	১৭৭, বি টি. রোড
প্রভাস চন্দ্র দে লেন	১৩৫, প্রামাণিক ঘাট রোড
প্রফুল্ল চাকী রোড	১০৬, গোপাল লাল ঠাকুর রোড
প্রামাণিক ঘাট রোড	২৭, কাশীপুর রোড
প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন	১৮৪, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
প্রিয়নাথ দে লেন	১৪/১, অতুল কৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন
প্রিয়নাথ চক্রবর্তী লেন	৯২/১, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
ফ	
ফকির ঘোষ লেন	১৭৪, গোপাল লাল ঠাকুর রোড

পথের নাম	উৎস
ব	
বরদা বসাক স্ট্রীট	১৯৯, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
বড়াল পাড়া লেন	৩৯, জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন
বনোয়ারী লাল ঢোল লেন	৫২/ই/বি, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন
বড়বাগান লেন	১৮, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রোড
বঙ্কুবিহারী পাল লেন	৩১, বাঘা যতীন রোড
বাঘা যতীন রোড	২৮/১/এ, গোপাল লাল ঠাকুর রোড
বারুইপাড়া লেন	১০৮, ,, ,, ,, ,,
বিহারীলাল পাল স্ট্রীট	১৩৭, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
বিদ্যায়তন সরণী	৪৫, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
বিনোদ লাল ঘোষ স্ট্রীট	৩১৭, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
বীরেশ্বর ঢোল লেন	৩০/১, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
বীর অনন্তরাম মণ্ডল লেন	৬০/১, মণ্ডল পাড়া লেন
বেহালা পাড়া লেন	১২২/১, গোপাল লাল ঠাকুর রোড
বেনিয়া পাডা লেন	৫১, প্রামাণিক ঘাট রোড
ব্যারিস্টার পি. মিত্র রোড	৬২, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
ভ	
ভট্টাচার্য পাড়া লেন	১০, বাঘা যতীন রোড
ভোলানাথ নাথ স্ট্রীট	৬১, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
ম	
মসজিদ বাড়ী লেন	১, ইন্‌স্টিটিউট লেন
ময়রাডাঙ্গা রোড	২৭৫/১, গোপাললাল ঠাকুর রোড
মণ্ডলপাড়া লেন	৩৪/১, আটাপাড়া লেন
মতিলাল মল্লিক লেন	৮৮/১, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)	১৮০, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর)
মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর)	৭৫, দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম)
মাস্টারদা বটকৃষ্ণ মৈত্র রোড	৩২, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)

পথের নাম	উৎস
মাতৃমন্দির লেন	৩০, বারুইপাড়া লেন
মান্নাপাড়া রোড	৩৫, অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড
মিউনিসিপ্যাল বাই লেন	২৬৩, গোপাললাল ঠাকুর রোড
য	
যোগেন্দ্র বসাক রোড	৯১, গোপাললাল ঠাকুর রোড
যাদবচন্দ্র ঘোষ লেন	২০৮, বি. টি. রোড
র	
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী লেন	৩১৩, মহারাজানন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
রায় মথুরানাথ চৌধুরী লেন	মান্থসর্দার বি. কে. মৈত্র রোড
রাজকুমার মুখার্জী রোড	১৪৫, দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম)
রামচন্দ্র বাগচী লেন	৯৫, ,, ,, ,,
রাজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট	৭/১, পি. ডবলিউ. ডি. রোড
রামচাঁদ মুখার্জী লেন	২০/১, বাঘাযতীন রোড
রামলাল ব্যানার্জী রোড	৩৩, গোপাললাল ঠাকুর রোড
রামলাল আগরওয়ালা লেন	৪৪/১, বি. টি. রোড
রামকালী মুখার্জী লেন	৯৩/৩/৩, কালীচরণ ঘোষ রোড
রামকৃষ্ণ ঘোষ রোড	১২৭, ,, ,, ,,
রাইমোহন ব্যানার্জী রোড	১০৬, বি. টি. রোড
শ	
শম্ভুনাথ দাস লেন	২৪, রামকালী মুখার্জী রোড
শরৎচন্দ্র ধর রোড	১০৩, অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড
শশিভূষণ বসাক লেন	২৭২, বি. টি. রোড
শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন	১২২, নিয়োগী পাড়া রোড
শিশির দাঁ রোড	৫/৩/এ প্রফুল্ল চাকী রোড
শিবচন্দ্র সার্বভৌম লেন	১৮, অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন
শীতলামাতা লেন	৭৭, অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড
শ্রীকান্ত চৌধুরী লেন	রায় মথুরানাথ চৌধুরী ষ্ট্রীট

শ্রীমাণী পাড়া লেন	২৯৩, মহারাজা নন্দকুমার রোড (দক্ষিণ)
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী লেন	৯/১, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী লেন	৪০, বাঘাযতীন রোড
স	
সারদাপ্রসাদ ব্যানার্জী রোড	২৩৪, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উত্তর)
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্ট্রীট	১১৯, প্রামাণিক ঘাট রোড
সূর্য্য সেন রোড	৬৯, দেশবন্ধু (পশ্চিম)
হ	
হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাণ্ড	৮৭, মান্নসর্দার বি. কে. মৈত্র রোড
হাতেম মুন্সী লেন	ডি. এন চ্যাটার্জী রোড
হিমাংশুমোহন চক্রবর্ত্তী লেন	৭১, রাইমোহন ব্যানার্জী রোড

বরানগরে প্রশাসন

বরানগর পুরসভা

৮৭, দেশবন্ধু রোড, কলি-৭০০০৩৫

ফোন নং : ৫২-৬৫২৫-৯৬

স্থাপিত : ১৮৬৯

চেয়ারম্যান : শ্রীঅজিত গাঙ্গুলী

ওয়ার্ড : ২৯

বিভাগ : সেক্রেটারী, স্টোর অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস, লাইসেন্স, অ্যাসেসমেন্ট, কলেকশন, জল, স্বাস্থ্য, পূর্ত, মোটর ভেহিকল, প্রসূতি, বিদ্যালয় (৭টি)।

মোট কর্মচারী : ৯০০

নির্মীয়মান প্রকল্প : রবীন্দ্রভবন, বস্তী-উন্নয়ন, ক্রীড়া-সমাহার (নেতাজী কলোনী), মুক্ত গনমঞ্চ (কালীতলার মাঠ), বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকূপ নির্মাণ।

পুর-সভা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমীক্ষার বিভিন্ন অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সমীক্ষা অংশের সংশোধন

১৩ পৃ : মোট ডাক্তার ৩-এর বদলে হবে ২৩০

২১ পৃ : কালান্তর সান্ধ্য দৈনিক নয়

২৪ পৃ : ইউনাইটেড ইন্‌ডাসট্রিয়াল ব্যাংকের ফোন ৪২ এর জায়গায় হবে ৫২

২৫ পৃ : নিউতরুণের ৫২-৫৬৫৭ ফোন নং বাদ যাবে

২৭ পৃ : ১৯৬৯ এর নির্বাচনে জ্যোতি বসুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অমর ভট্টাচার্য (কং)

৫২ পৃ : সরকারী/বেসরকারী শিক্ষাদান কেন্দ্র (১) ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অন্তর্গত রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুল হবে

৫১ পৃ : বিদ্যালয়—বালিকাদের জন্য : (২) আনন্দ আশ্রম সারদা বিদ্যাপীঠ

সমীক্ষা অংশের সংযোজন

পৃ : ১৬ বরানগরে শিল্পের ১৮নং অংশ হবে কাঁচশিল্প—৪

পৃ : ২০ (ঙ) বাঘাযতীন সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল চাকী রোড, কলি-৩৬ স্থাপিত : ১৯৬৪

পৃ : ২১ বিশেষ সমীক্ষা—বিশ্বামিত্র ও সন্মার্গ

পৃ : ৩৯ মন্দির—(৫১) ত্রিপীঠ আশ্রম, বিগ্রহ : জগদ্ধাত্রী (১৩০)

পৃ : ২৯ বয়স্কাউট—নর্থ সুবার্বন বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েশন,
১৪০ বি. কে. মৈত্র রোড, কলি-৩৬

পৃ : ২৯ কম্যুনিটি হল—নারায়ণ ঘোষ মেমোরিয়াল হল, বারুইপাড়া লেন

পৃ : ৩০ স্ট্যাচু—(ক)গোপাললাল ঠাকুর রোড ও বনহুগলীর মোড়ে

পৃ : ৩০ বরানগর পুরসভা—ওয়ার্ড অফিস—৩টি

গ্রন্থপঞ্জী

মহাভারত, বনপর্ব ও সভাপর্ব—কাশীরাম দাস প্রণীত

মনসামঙ্গল—বিপ্রদাস পিপিলাই

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবৎ—শ্রীবৃন্দাবন দাস

মঙ্গলচণ্ডীর গীত—দ্বিজ মাধবাচার্য

বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব—নীহাররঞ্জন রায়

কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র

কলিকাতা-একালের ও সেকালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

শ্রীভাগবত আচার্য লীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীহরিদাস ঘোষাল

বাংলার স্থান নাম—সুকুমার সেন

বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন

বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রাচীন জরিপের ইতিকথা—অরুণ কুমার মজুমদার

মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের সংস্কৃতি—ক্ষিতিমোহন সেন

বৈষ্ণবপদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

নামাচার্য্য শ্রীরামদাস—সুশীল কুমার সেন

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

বরানগর আলমবাজার মঠ—রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম খণ্ড)

বাংলার বিদ্বৎসমাজ—বিনয় ঘোষ

সাধক শশীভূষণ—সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তাভজা-ইতিহাস ও ধর্মমত—সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত

বাঙলা ও বাঙালী—অতুল সুর

নবযুগের সাধনা—কুলদাপ্রসাদ মল্লিক

ভারত শ্রমজীবী—কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত

তত্ত্বভূষণ জীবনী—জ্যোতির্ময়ী মুখোপাধ্যায়

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

মুক্তির সন্ধানে ভারত : কংগ্রেস পূর্ব যুগ—যোগেশচন্দ্র বাগল
সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ (১ম, ২য় ও ৩য়খণ্ড)
ব্রাহ্মসমাজে শশিপদ ও মনের বল—জনৈক (কলিকাতা-১৯২১)
বাঙলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস—পঞ্চানন সাহা
ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস—গোপাল ঘোষ
মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ—বিনয় ঘোষ
সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি—নরেন্দ্রনাথ লাহা (৩ খণ্ড)
কলকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস—নগেন্দ্র নাথ শেঠ
বাস্তুক অর্থাৎ বসাক উপাধি বিশিষ্ট জাতিব পবিচয়—মদনমোহন হালদার
দেবগণের মর্তে আগমন—দুর্গাচরণ রায়
পুরাতনী—হরিহর শেঠ
প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—হরিহর শেঠ
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—নগেন্দ্র নাথ বসু (আট খণ্ড)
সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার মন্দির—পঞ্চানন রায়
চব্বিশ পরগণার মন্দির—অসীম মুখোপাধ্যায়
ভারত শিল্প ও আমার কথা—অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
দেখা হয় নাই—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা—অশোক মিত্র
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ (৩ খণ্ড)
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস—সুপ্রকাশ রায়
বঙ্গের বাহিরে বাঙালী—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
অগ্নিদিনের কথা—সতীশচন্দ্র পাকড়াশি
অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু
ভারত কোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
জীবনী অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান—সাহিত্য সংসদ
জীবনী কোষ—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
বঙ্গীয় জীবনী কোষ—প্রিয়নাথ জানা
সন্দেশাবলী—স্বরূপচন্দ্র দাস
কোলকাতায় চলাফেরা—ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর
ভারত ভ্রমণ—দুর্গাপ্রসাদ সর্বাধিকারী
শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
চৈতন্য চরিতের উপাদান—বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়
বাঙালীর ইতিহাস—অতুল সুর
আত্মস্মৃতি—স্বামী চিরজানন্দ
জাল প্রতাপচাঁদ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—যুগান্তর চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত
কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
কলকাতা—অতুল সুর
সতু সেন—আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদিত
শরদিন্দু অমনিবাস— আনন্দ পাবলিশার্স
মনোমোহন বসুর ডায়েরী—সুনীল দাস সম্পাদিত
Statistical and Geographical Report of the 24-Pergannahs District—Major Ralph Smith
District Gazetteer, 24-Parganas—L. S. S. O'Malley, 1914
An Advanced History of India—R. C. Mazumdar, H. C. Roychowdhury and Kalikinkar Datta
Jan Company in Coromandel 1605-1690—Tapan Roychowdhury
The Dutch in India—Kalikinkar Datta
Report on the Census of Bengal, 1872—H. Beverley
The Diaries of Streynsham Master—R. C. Temple (ed). Vol. I & II.
Glimpses of Bengal—A. C. Campbell (1907)
Hedge's Diary—Vol. I & II.
Early Records of British India—J. T. Wheeler (1879)
Statistical Account of Bengal—W. W. Hunter
Calcutta and its Hinterland—P. Banerjee

Calcutta and Environs—A. C. Roy
Calcutta : Atlas and Guide—A. C. Roy
The Modern History of the Indian Chiefs, Zamindars etc.
(Vol. I & II) L. N. Ghosh
Calcutta in Urban History—Pradip Sinha.
Indian Gods, Sages, Cities—G. Cesary
District Census Handbook—24-Parganas (1961 & 1967)
Calcutta's Who's who in Business—K. K. Tenneja
Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History
—Pradip Sinha
Calcutta : Myths and History—S. M. Mukherjee
History of the Portuguese—J. J. A. Campos
Development of Calcutta and its Suburbs—H.N. Bhattacharya
Calcutta Keepsake—Alok Roy (ed)
Romance of Jute—D. R. Wallace
Tribes and Castes of Bengal—H. H. Risley (Vol. I & II)
Travels of a Hindu—Bholanath Chander.
Industrial Handbook (1973)—Kothari.
History of the Brahmo Samaj—Sivanath Sastri
(Calcutta-1911-12, reprint 1974)
An Indian Pathfinder—Sir Albion Rajkumar Banerjee (Devalaya)
The Devalaya—Sitanath Tattabhusan (Calcutta n. d.)
Social Reform in Bengal : A Side Sketch—S. Tattabhusan
(Calcutta—1904)
Life and Work of Mary Carpenter—J. E. Carpenter
(London, 1879)
Six Months in India—Mary Carpenter (London, 1868)
Charles Dall as a Backdrop to the Brahmo Samaj of India, 1855-1866—Pamela Gwyne Price in B. Thomas and S. Lavan, ed, West Bengal and Bangladesh : Perspectives from 1972, no.-21.
Urban Leadership in Western India—Christine Dobbin
(London, 1972)
Labour Movement in India—G. K. Sharma (Delhi, 1963)
Communism and Bengal's Freedom Movement—
Gautam Chattopadhyay. (Delhi 1970)

Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908)—Sumit Sarkar. (Delhi 1977)
The Rise and Growth of Economic Nationalism in India (1880-1905)—Bipan Chandra—(Delhi 1966)
Hindu Castes and Sects—J. N. Bhattacharya (Calcutta 1896, reprint 1973)
The Cotton Weavers of Bengal—1757-1833 Debendra Bijoy Mitra (Calcutta-1978)
Civil disturbances during the British Rule in India (1765-1857) —Sashibhusan Chowdhury (Calcutta 1955)
Calcutta : An Artist's Impression—Desmond Doig.

সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র স্মারক পুস্তিকা ইত্যাদি

বরাহনগর পৌর শতবর্ষপূর্তি 'স্মারকগ্রন্থ' (১৮৬৯-১৯৬৯)
শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রবন্ধ : ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Some Old Family Founders in Eighteenth Century Calcutta—B. Ghosh in Bengal Past & Present, Vol.-79, 1969.
Private British Investment in 18th Century Bengal—P. J. Marshall in Bengal Past & Present, Diamond Jubilee Number, 1967
The Problem of Civilization in India—Sir John Budd Phear in The Calcutta Review (1871)
Indian Historical Review Vol. II No. 2
1976—Dipesh Chakraborty's article
Souvenir : I M. A., 1980
সাধারণ পাঠাগার, অশোকগড (রজত জয়ন্তী বর্ষ), ১৯৮১
বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুবর্ণ জয়ন্তী), ১৯৮১
Baranagar Victoria High School, Centenary Souvenir, 1967
ভবনাথ স্মরণী, বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরী, ১৯৬৬
বনহুগলী বঙ্গ বিদ্যালয়, শতবর্ষ স্মারক পুস্তিকা, ১৯৮১
স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব, বরানগর পৌর প্রতিষ্ঠান, ১৯৭২
এক্ষণ, শারদীয়, ১৩৮৭
এক্ষণ, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৮৮
Census of India W. B. paper 1 & II of Director of Census operation, 1981, Supplement

এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন সময়ে Indian Mirror, Hundu Patriot, Indian Daily News, Calcutta Gazette, Amrita Bazar Patrika প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকা এবং সোমপ্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী, ভারত শ্রমজীবী, সংবাদ কৌমুদী, উত্তরসূরি প্রভৃতি পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। স্থানাভাবে বেশ কিছু গ্রন্থের বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হল না। পাঠক এজন্য ক্ষমা করবেন।